এনইউবি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা

NUB Journal of Bangla Litereture Culture and Research

(Peer-Reviewed Journal)

ISSN: 2710-4451

বাংলা বিভাগ

নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

এনইউবি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা

NUB Journal of Bangla Litereture Culture and Research

(Peer-Reviewed Journal)

দ্বিতীয় সংখ্যা

ফেব্রুয়ারি ২০২২

ISSN: 2710-4451

সম্পাদক

প্রফেসর ড. রকিবুল হাসান

ডিন, বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি ও গবেষণা অনুষদ

বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, এনইউবি

সহযোগী সম্পাদক

ইসরাফিল হোসেন

শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, এনইউবি

বাংলা বিভাগ

নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

বাংলা বিভাগ
নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

এনইউবি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা
NUB Journal of Bangla Litereture Culture and Research
(Peer-Reviewed Journal)

ISSN: 2710-4451

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

মুদ্রক
মেহেরিন প্রিন্টার্স, ঢাকা
মূল্য: ২০০ টাকা (৬ মার্কিন ডলার)

যোগাযোগ
প্রফেসর ড. রকিবুল হাসান
ডিন, বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গবেষণা অনুষদ
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ
বনানী, ঢাকা।

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা
প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ মো. আব্দুল্লাহ
চেয়ারম্যান
নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ট্রাস্টি বোর্ড

উপদেষ্টা
প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেন
উপাচার্য
নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

সদস্য
প্রফেসর ড. নজরুল ইসলাম, উপ-উপাচার্য, এনইউবি
প্রফেসর ড. আনোয়ারুল করিম, নির্বাহী পরিচালক, বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র, এনইউবি
প্রফেসর পবিত্র সরকার, সাবেক উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
সেলিনা হোসেন, সভাপতি, বাংলা একাডেমি
ইমদাদুল হক মিলন, কথাসাহিত্যিক
প্রফেসর ড. মো. শাহ আজম, উপাচার্য, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
প্রফেসর ড. রজত কিশোর দে, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সম্পাদক
প্রফেসর ড. রকিবুল হাসান
ডিন, বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গবেষণা অনুষদ
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, এনইউবি

সহযোগী সম্পাদক
ইসরাফিল হোসেন
শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, এনইউবি

সম্পাদকীয়

'এনইউবি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা মূল্যায়ন সাপেক্ষে অনুমোদিত পনেরটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হলো। প্রথম প্রবন্ধটির নাম 'বাঙালি অবক্ষয়ের অতল থেকে উঠে এসে জীবনমুখী হয়ে দাঁড়াবে'। লিখেছেন নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ মো. আব্দুল্লাহ। এই প্রবন্ধে লেখক বাঙালি সমাজের মূল্যবোধের চিত্র তুলে ধরেছেন। একইসঙ্গে অবক্ষয় ও দুর্নীতি থেকে সমাজকে মুক্ত করার পক্ষে কিছু যুক্তি ও পরামর্শ দিয়েছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধটির লেখক ড. রকিবুল হাসান। প্রবন্ধের শিরোনাম 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা: বাঘা যতীনের অবদান'। এই প্রবন্ধে লেখক তুলে ধরেছেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘা যতীনের বিপ্লবী জীবনের বিভিন্ন পর্বের কথা। প্রবল বিক্রমে লড়াই করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার কাহিনি যেমন রয়েছে এই প্রবন্ধে, তেমনি বাঘা যতীনের আত্মদানের ফলে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন কতটা বেগবান হয়েছিল, তার বর্ণনাও। নাড়ুগোপাল দে লিখেছেন, 'সৈকত রক্ষিতের গল্প: পুরুলিয়ার জনজাতি প্রসঙ্গ'। এতে তিনি তুলে ধরেছেন পুরুলিয়ার কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিতের ছোটগল্পের বিষয়-আশয়। সৈকত রক্ষিতের গল্পের আঙ্গিক থেকে শুরু করে প্রকরণ নিয়েও আলোচনা করেছেন তিনি। ড. উৎপল মণ্ডলের প্রবন্ধের শিরোনাম 'প্রবন্ধের স্বরূপ ও সংস্কৃতির সন্ধান'। এই প্রবন্ধে লেখক বাংলা প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য, রূপরেখা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এর সম্পর্ক নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একইসঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে বাংলা প্রবন্ধের ধারাবাহিকতাও।

বাসুদেব মন্ডলের প্রবন্ধের শিরোনাম, 'কবিতা ও চিত্রের নিবিড় সম্পর্ক'। এই প্রবন্ধে কবিতায় ব্যবহৃত অলঙ্কার নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক। এতে অলঙ্কার বলতে বিশেষত উপমা-চিত্রকল্প-উৎপেক্ষা নির্মাণ ও প্রয়োগবিধি আলোচনা করে দেখিয়েছেন। ড. মো. আব্দুল মতিনের প্রবন্ধ 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: বাঙালির বহুমাত্রিক অর্জন'। এই প্রবন্ধে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের বিভিন্ন দিক ও গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে।

ড. নিতাই কুমার ঘোষের প্রবন্ধ 'আবুল হাসানের কবিতা: চোখের পাতায় লেগে থাকা হিরণ্ময় বেদনা'। প্রবন্ধটিতে কবি আবুল হাসানের কাব্যস্বভাব ও তার কবিতার শিল্পগুণ নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। শাফিক আফতাব লিখেছেন কথাসাহিত্যিক শওকত আলী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, মঞ্জু সরকার ও রকিবুল হাসানের উপন্যাসের বিষয়-বস্তু নিয়ে। তার প্রবন্ধের শিরোনাম 'বাংলা উপন্যাসের চার লেখক: সমাজ সমকালের রূপকার'। এটি মূলত তুলনামূলক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ। এতে উল্লিখিত চার লেখকের উপন্যাসের বিষয়, আঙ্গিক, প্রকরণ নিয়ে আলোচক সবিস্তারে বিশ্লেষণ করেছেন।

'পোস্টমাস্টার' ও 'বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ: মিল-অমিলের সন্ধানে' প্রবন্ধটির লেখক মোহাম্মদ

নূরুল হক। এই প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পোস্টমাস্টার' ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ' গল্পের কাহিনি ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের মিল-অমিল কোথায়।

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন লিখেছেন 'নজরুলের কবিতা ও প্রবন্ধ : সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ'। এই প্রবন্ধে ব্রিটিশ উপনিবেশ, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিবাদ বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষত নজরুলের কবিতা ও প্রবন্ধ বিষয়ে বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। 'গীতাঞ্জলি ১৯১০: রবীন্দ্র কাব্যসত্তার মানসভূমি' শিরোনামের লেখক আল মাকসুদ। এই প্রবন্ধে *গীতাঞ্জলি* কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মচেতনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ড. সেতু চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন '*পদ্মানদীর মাঝি*: রূপ-অরূপ অন্বেষণ' শিরোনামের প্রবন্ধ। এতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত '*পদ্মানদীর মাঝি*' উপন্যাসের বিষয়বস্তু, এর বৈশিষ্ট্য, আঙ্গিক ও প্রকরণ নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছ। জান্নাতুল যূথীর প্রবন্ধের নাম 'ফোকলোর : বাংলা ও বাঙালির শেকড়সন্ধানী রূপভেদ'। এই প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন বাঙালি জীবনে ও বাংলা সাহিত্যে ফোকলোরের অবস্থান, এর ব্যবহার ও প্রকারভেদ। 'আধুনিক বাংলা কবিতায় মনসামঙ্গলের নতুন পাঠ' শীর্ষক প্রবন্ধটি লিখেছেন সঞ্জিৎ সরকার। এতে তিনি তুলে ধরেছেন মনসামঙ্গল কাব্যের প্রভাব কিভাবে আধুনিক বাংলা কবিতায় পড়েছে। একইসঙ্গে কিভাবে মনসামঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন বিষয়, ঘটনা ও চরিত্র আধুনিক বাংলা কবিতায় নবরূপায়ণ ঘটেছে। এই সংখ্যার শেষ প্রবন্ধটির নাম 'শহীদ কাদরীর কবিতা : নি:সঙ্গতার অভিজ্ঞান'। লেখক রাহিমা আকতার বিথী। এই প্রবন্ধে লেখক তুলে ধরেছেন শহীদ কাদরীর কবিতায় নিঃসঙ্গ চেতনার বিভিন্ন দিক।

পরিশেষে, কৃতজ্ঞতা জানাই পত্রিকার বিশেষজ্ঞ মূল্যায়নকারীদের, যাঁরা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে প্রবন্ধগুলোর মূল্যায়ন করেছেন। অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ট্রাস্ট-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ মো. আব্দুল্লাহ, উপদেষ্টা নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর উপাচার্য প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেন ও সদস্যবর্গের প্রতি। নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর কর্তৃপক্ষ ও বাংলা বিভাগের প্রিয় সহকর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

প্রফেসর ড. রকিবুল হাসান
সম্পাদক ॥ এনইউবি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা
ডিন, বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি ও গবেষণা অনুষদ
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, এনইউবি

সূচিপত্র

বাঙালি অবক্ষয়ের অতল থেকে উঠে এসে জীবনমুখী হয়ে দাঁড়াবে ১১
ড. আবু ইউসফ মো. আব্দুল্লাহ

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা: বাঘা যতীনের অবদান ৩৬
ড. রকিবুল হাসান

সৈকত রক্ষিতের গল্প: পুরুলিয়ার জনজাতি প্রসঙ্গ ৬৪
নাড়ুগোপাল দে

প্রবন্ধের স্বরূপ ও সংস্কৃতির সন্ধান ৭৪
ড. উৎপল মন্ডল

কবিতা ও চিত্রের নিবিড় সম্পর্ক ৮৩
বাসুদেব মন্ডল

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: বাঙালির বহুমাত্রিক অর্জন ৯৫
ড. মো. আব্দুল মতিন

আবুল হাসানের কবিতা: চোখের পাতায় লেগে থাকা হিরণ্ময় বেদনা ১০৭
ড. নিতাই কুমার ঘোষ

বাংলা উপন্যাসের চার লেখক: সমাজ ও সমকালের রূপকার ১২৫
শাফিক আফতাব

'পোস্টমাস্টার' ও 'বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ': মিল-অমিলের সন্ধানে ১৩৯
মোহাম্মদ নূরুল হক

নজরুলের কবিতা ও প্রবন্ধ : সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ১৫০
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

***গীতাঞ্জলি* ১৯১০: রবীন্দ্র কাব্যসত্তার মানসভূমি** ১৭১
আল মাকসুদ

***পদ্মানদীর মাঝি*: রূপ-অরূপ অন্বেষণ** ১৮৩
ড. সেতু চট্টোপাধ্যায়

ফোকলোর : বাংলা ও বাঙালির শেকড়সন্ধানী রূপভেদ ১৯৮
জান্নাতুল যূথী

আধুনিক বাংলা কবিতায় মনসামঙ্গলের নতুন পাঠ ২১৪
সঞ্জিৎ সরকার

শহীদ কাদরীর কবিতা : নিঃসঙ্গতার অভিজ্ঞান ২৩৪
রাহিমা আকতার বিথী

এনইউবি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা
(Peer-Reviewed Journal)
ISSN : 2710-4451
বাংলা বিভাগ
নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ
দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বাঙালি অবক্ষয়ের অতল থেকে উঠে এসে জীবনমুখী হয়ে দাঁড়াবে

ড. আবু ইউসুফ মো. আব্দুল্লাহ*

সার-সংক্ষেপ: অতীত ইতিহাস থেকে দেখা গেছে, বহু জাতি মেধা ও সম্পদ ধরে না রাখতে পারার ব্যর্থতায় আপন সত্তা হারিয়ে বিলুপ্তির পথে চলে গেছে। নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কার ও সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। দখল করে নিচ্ছে অপসংস্কার ও অপসংস্কৃতি। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে নিজস্ব সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত ভাবসত্যটি অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। বাঙালির যে আচার-আচরণ ও মূল্যবোধ, দ্রুত তার পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রবল হয়ে উঠেছে। মূল্যবোধহীন এক সমাজ তর তর করে বেড়ে উঠছে। যে কারণে মাতৃভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতি, সংগীত, শিল্পকলার প্রতি ঔদাসীন্য ও অশ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটছে। বাংলাদেশ ও বাঙালির জন্য এই আত্মধ্বংসী প্রবণতা রোধ জরুরিভাবে সময়ের দাবি হয়ে পড়েছে।

বাংলা ও বাঙালিকে নিয়ে অনেকেই গর্ব করেন–গৌরব বোধ করেন। আমারও করতে ইচ্ছে করে। কারণ বাংলা আমার ভাষা–বাংলা আমার দেশ–আমি বাঙালি। এ কথাগুলো আমার রক্তে প্রবল প্রমত্ত নদীর মতো ঢেউ তুলে আনন্দ প্রকাশ করুক–এ আমার চিরকালের চাওয়া। কিন্তু সেই আনন্দ আমি কোনোভাবেই অনুভব করতে পারছি না–এক গভীর বেদনাবোধ আমাকে কাতর করে তুলছে। এক অদ্ভুত যন্ত্রণা ও হতাশা আমাকে গ্রাস করছে। বাংলার জন্য ভীষণভাবে আমার মন খারাপ হয়। বাংলা, বাংলাদেশ, বাঙালি ক্রমশ ঠুনকো হয়ে যাচ্ছে। অথবা বাংলাপ্রীতি ও বাংলাপ্রেম শুধু মুখের কথা হয়ে যাচ্ছে। হৃদয়ের গভীরে তা থাকছে না, মন-প্রাণ গ্রহণ করছে না।

* চেয়ারম্যান, নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ট্রাস্টি বোর্ড।

স্বার্থের প্রয়োজনে যতক্ষণ যার প্রয়োজন, দেশপ্রেমের বুলি আওড়িয়ে তা ব্যবহার করছে। দেশে কেউই তার নিজের ভবিষ্যৎ নির্মাণের স্বপ্ন দেখছে না, ভাবছেও না। এই দেশে থেকে–এই দেশে বড় হয়ে–এই দেশের হাওয়া-বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে–এই দেশের মাটিতে বসবাস করে–এই দেশের সুশীতল পানি পান করে, একদিন চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যায়। সেই স্বপ্নের রশি ধরে একদিন বাবা যায়–মা যায়–সন্তানেরাও যায়। অনেক ক্ষেত্রে সন্তান আগে যায়, পরে মা-বাবা যুক্ত হয়। এই দেশে নিজেদের কোনো ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না তারা। সময়ের স্রোতে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বাড়তে থাকে, আর বাংলা, বাঙালি, বাংলাদেশ ক্রমশ তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যায়, একসময় হারিয়ে যায়। যাচ্ছেও। শ্রমজীবী থেকে শুরু করে মেধাবী–সবারই অপ্রতিরোধ্য স্রোত বিদেশের দিকে–সেখানেই তাদের স্থায়ী ভবিষ্যতে মোহনীয় স্বপ্নবুনন–এই স্বপ্নে উড়তে থাকে এবং একসময় উড়ে চলেও যায়। এই যাওয়ার ভেতর আমি কোনো দেশপ্রেম দেখি না। বরং দেশের প্রতি–দেশের মানুষের প্রতি–দেশের মাটির প্রতি অবর্ণনীয় অকৃতজ্ঞতা–অসম্মান এবং প্রচণ্ড রকমের ব্যক্তি স্বার্থপরতা লক্ষ করি।

অদ্ভুত আর এক ব্যাপার, এ দেশের একশ্রেণির শিল্পপতি, রাজনীতিবিদ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী–এই দেশের সম্পদ আহরণ করে, এই দেশের মানুষের ভালোবাসা পেয়েও বিবেকহীনের মতো বিদেশে পাড়ি জমান। এই দেশে সম্মানজনক পেশা ছেড়ে বিদেশে নিম্নশ্রেণির কর্মসাধন করে অচেনা অজানা, অবজ্ঞা, অবহেলিত ও অন্ত্যজ বাঙালি হয়ে জীবন কাটানোর ভেতর কী সম্মান নিহিত থাকে, আমার মাথায় তা ঢোকে না। যারা মেধাবী তারা সেই সব দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন, নিজের দেশকে কাঙাল করে–মেধা শূন্য করে। এতেও কোন ধরনের কৃতিত্ব আছে, তাও আমার অনুভবে আসে না। নিজের দেশের অর্থ নিজের দেশে বিনিয়োগ না করে পরের দেশে গচ্ছিত রাখা বা বিনিয়োগের ভেতর কোনো মহত্ত কাজ করে না কি নিজের দেশের সঙ্গে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা কাজ করে? আমি এ সবের ভেতর গভীর এক বেদনা অনুভব করি। বাংলা ভাষা ও বাঙালির আত্মমর্যাদা বিকাশের পথে সত্যিকারের কোনো আলো ও সম্ভাবনা দেখতে পাই না। বিদেশে চলে যাওয়াটাই সম্মানের–নিজের ভাষা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে বিদেশি ভাষায় দক্ষতা অর্জন গৌরবের–বিদেশে নিজের দেশের অর্থ পাচার করাটা আভিজাত্য– এসব আমাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে। আমি বাংলা ভাষার সম্মান ও বিকাশের স্বপ্ন দেখি, বাঙালির পূর্ণ আত্মমর্যাদার বিকশিত রূপটি দেখার স্বপ্ন দেখি, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও শিল্পসাহিত্যে বিশ্বের বুকে বিস্ময় জাগানো সাফল্য প্রত্যাশিত স্বপ্নবান একজন বাঙালি,

বাঙালিত্বের গৌরবে আমি মাথা উঁচু করে থাকতে চাই দৃঢ়তায়। নৈতিকতা, আদর্শ মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে প্রতিটি বাঙালির বুকে লাল সবুজের চেতনা অনুভব করতে ভালোবাসি। কিন্তু আমি প্রচণ্ড রকম ধাক্কা খাই–আহত হই–বিত্ত-বৈভব ও ক্ষমতাশালী একশ্রেণির মানুষের কাছে বাংলা, বাঙালি, বাংলাদেশ যখন শুধু নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে ব্যবহৃত হয়। চিরকালের খেটে-খাওয়া যে গরিব বাঙালি–রোদ-বৃষ্টিতে পুড়ে কঠিন মাটির বুকে ফসল ফলায়, সবুজের স্বপ্নে বুক ভরে, দেশকে ভালোবাসে, সন্তানকে শিক্ষিত করে দেশের উন্নয়নের জন্য, সেই সন্তানও তার স্বপ্নের ভেতর বন্দি থাকে না। বাংলার ভবিষ্যৎ যে শোচনীয় অবস্থার শিকার হবে, সে আশঙ্কা থেকেই যায়। পৃথিবীর বহু ভাষা–বহু জাতি নিজেদের দেশপ্রেমবর্জিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও দায়িত্বহীনতার কারণে হারিয়ে গেছে। যদি ভাবা হয় এত বড় বাঙালি জাতি–পৃথিবীজুড়ে যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে–কোথাও কোথাও দাপটের সঙ্গেই বসবাস করছে–এদের হারিয়ে যাওয়া সহজ নয় কিংবা এ ধরনের ভাবনার কোনো অর্থবহতা নেই। বিনয়ের সঙ্গে বলি, যারা বিদেশে তিন চার প্রজন্ম আছে–তাদের প্রজন্মরা খাঁটি বাঙালি হিসেবে কি আছে! তারা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বাংলা ও বাঙালি থেকে বহু যোজন দূরে সরে যাচ্ছে–একসময় এদের কাছে বাংলা ও বাঙালি অর্থহীন হয়ে যাবে। অনেকের কাছে তা হয়েও গেছে। এরকম উদাহরণ বহু আছে। আর এই দেশে যারা আছেন–বাংলা ও বাঙালি নিয়ে এখনো গর্ব করছেন, সেখানেও শুভঙ্করের ফাঁকি আছে। সত্যিকারের দেশপ্রেম তাদের মধ্যে নেই বললেই চলে। যে দেশের অর্থ অন্য দেশে পাচার হয়–যে দেশের মেধা পাচারে গর্ববোধ কাজ করে–যে দেশের মানুষের কাছে নিজের দেশ নিজের ভবিষ্যতের ভাবনায় স্থান পায় না–যে দেশের মানুষ নিজের ভাষাকে তুচ্ছজ্ঞান করে, যে দেশের মানুষ নিজের দেশের মানুষকে বিষ দিয়ে বিত্তের মালিক হয়–মৃত মানুষকে আইসিউতে বা লাইফ সাপোর্টে রেখে বাণিজ্য করে–সেই দেশ কিভাবে উন্নত একটি দেশে পরিণত হবে–সেই দেশে কিভাবে দেশপ্রেম তৈরি হবে–সেই দেশ কিভাবে পৃথিবীর বুকে প্রতিভূ হয়ে উঠবে! বাঙালির চরিত্রে এসব এখন অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। আমার ভেতর এসব প্রশ্নের জন্ম দেয়–আমি এর কোনো ইতিবাচক উত্তর দেখি না। অন্তিম অবস্থার দিকেই যেন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশে ধর্মীয়ভাবে অনেক অনুষ্ঠান আছে–যেগুলো সম্পূর্ণভাবে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানের। বাঙালির একক পরিচয়ে সেসব অনুষ্ঠান পরিচয় বহন করে না। যেমন মুসলমানের ঈদ, হিন্দুদের দুর্গাপূজা, খ্রিষ্টানের বড়দিন ও বৌদ্ধদের বুদ্ধ পূর্ণিমা। এসব উৎসব বা অনুষ্ঠান ধর্মীয় বৃত্তে বন্দি। পহেলা বৈশাখ কোনো ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বৃত্তে সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমানে এটা আরো বর্ণিল ও ব্যাপকতা লাভ করেছে। তারপরও ভাবতে অবাক লাগে, বাঙালির প্রাণের চিরায়ত এই

অনুষ্ঠানেও এই দেশে বোমা মেরে মানুষ হত্যা করা হয় এবং পহেলা বৈশাখের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করার অপচেষ্টা চলছে। এই অপচেষ্টা আসলে পহেলা বৈশাখ নয় বাঙালি সত্তাকেই হত্যা করার অপচেষ্টা। ধর্মবহির্ভূত জাতীয় অনুষ্ঠান কত প্রাণবন্ত ও সজীব বাঙালির ভাবনায় ও আচরণে, পহেলা বৈশাখ ব্যতিত অন্য আর কোনো অনুষ্ঠান এরূপ সর্বজনীন ও সজীব নয়। পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান বাঙালির প্রাণের অনুষ্ঠান ও সর্বজনীন হলেও রমনার বটমূলে বোমা হামলার ঘটনার পর থেকে প্রতিবারই একটা অজানা ভয়ের আশঙ্কা থেকে যায়। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটি সেখানে বাধাগ্রস্ত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এসব অনুষ্ঠান শুধুই আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপার এখন–প্রাণের ও হৃদয়ের গভীরতা সেখানে থাকে না, চেতনা তো থাকেই না। এসব অনুষ্ঠানের মূলে নিয়ম রক্ষার বা সরকারি নির্দেশনা পালনই বড় কথা। চেতনা ও দায়িত্ববোধ থেকে হৃদয়ের গভীর বোধ থেকে এসব অনুষ্ঠান আগে যেভাবে উদযাপিত হতো, ক্রমশ তা হারিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এসব চর্চা চেতনাবোধ থেকে ঘটছে না। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির সন্তানেরা এসব অনুষ্ঠানকে যেভাবে চেতনার জায়গা থেকে লালন করতো, বর্তমানে তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মূল্যবোধহীনতায় হারিয়ে যাচ্ছে। দ্রুত অর্থবিত্তের মালিক হওয়া এবং সমাজে প্রভাব বিস্তার করাই প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। আর উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা দেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সন্তুষ্ট নয়–এটাকে তারা ধারণও করে না। তাদের ভবিষ্যৎ ও মন-মানসিকতা বিদেশের উন্নত দেশগুলোর দিকে। এই দেশ–এই দেশের সংস্কৃতি–দলমত নির্বিশেষে যে বাঙালি সত্তা–সেসব তাদের ভাবনায়-চিন্তায়-আচরণে কাজ করে না। যতদিন তারা বিদেশে চলে যেতে না পারে ততদিন তারা ইংরেজি ধ্যানজ্ঞান করে ভিন দেশী সংস্কৃতি ধারণে মরিয়া হয়ে ওঠে। দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি তাদের কাছে অবজ্ঞা ও অবহেলায় আবর্জনার মতো পড়ে থাকে। এখান থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সরে যেতে না পারছে, ততক্ষণ তাদের মধ্যে হতাশা অস্বস্তি কাজ করতে থাকে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বর্তমানে হারিয়ে ফেলেছে তার মূল্যবোধ; আর মূল্যবোধহীন উচ্চবিত্ত শ্রেণি দেশে থেকেও দেশের বাইরে তাদের মন-মানসিকতা স্বপ্ন পড়ে থাকে। ফলে সমাজে সত্যিকার দেশপ্রেমিক যে একটি শ্রেণি অপরিহার্য, তা এখন ভয়াবহ সংকটের মুখে। একসময় যারা বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করেছিলেন, বাংলা ভাষার দাবিতে সোচ্চার ছিলেন– প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, তাদের পরবর্তী প্রজন্মও বাংলা ভাষায় স্বপ্ন দেখে না, বাংলা ভাষা লালন করে না, তাদের অনেকেরই সন্তান বর্তমানে ভিন্ন পথের যাত্রী– এই চেতনা থেকে বহু দূরে চলে গেছে। এরা ইংরেজি পাঠ্যবইয়ের বাইরে বাংলা পড়ে না। অথবা বাংলা পাঠ্যবইয়ের অংশটুকু কোনোভাবে শেষ করে দেশের বাইরে যেতে পারলেই

রক্ষা। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিচর্চার প্রয়োজন বোধ করে না। তারা দেশপ্রেমনির্ভর আদর্শিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। অবক্ষয়ের সীমানা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এদেশের এক ধরনের শিক্ষিত সন্তানেরা দলবদ্ধভাবে চাঁদাবাজি করে, উচ্ছৃঙ্খলতায় ক্ষমতা দেখায়, পড়ালেখার চেয়ে দলবাজিতে নিবেদিত, প্রচুর অর্থ-সম্পদের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, আর এক শ্রেণি বিদেশে যাওয়ার জন্য বিদেশি ভাষা ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের জাতীয় জীবনে এই অব্যবস্থা এবং মূল্যবোধহীনতা ব্যাপকভাবে চলে এসেছে। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেকেই সচেতন থেকেও অসহায় হয়ে পড়ছে–নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এ সবের প্রতিবাদে অপমান-অসম্মান ঘটছে। অপসংস্কৃতি প্রচারে ও হিংসাত্মক আচরণে এ সব বৃদ্ধি ঘটছে। নিরীহ অসহায় এক শ্রেণির মানুষ এসবের শিকার হচ্ছে স্থূলতায় ও নিষ্ঠুরতায়।

শিক্ষাঙ্গনে তরুণ সমাজের মধ্যে নৈরাজ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, এ পরিস্থিতিতে নীতিবাক্য ও মূল্যবোধের কথা অনর্থক কথাতে পরিণত হয়ে গেছে। এই নৈরাশ্য ও নৈরাজ্য শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ধনিক শ্রেণির মধ্যে এটা গভীরতর হচ্ছে–রাজনৈতিক ক্ষমতাহীনতার কারণে ও প্রতিহিংসার শিকারে। যারা কয়েক পুরুষ ধরে এদেশে অর্থবিত্তের মালিক হতে পারেনি, তাদের মধ্যেও শূন্যতা কাজ করে– এই দেশের প্রতি তাদের দায়বোধ ও দেশপ্রেম কাজ করে না। মনে করে, এই দেশ তাদের কিছু দেয়নি। দেশের জন্য কাজ করে তারা দেশের কাছে বঞ্চিত হয়েছে। একসময় যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল–আদর্শ মূল্যবোধ-শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতিচর্চা করতো, পেশাগত দায়িত্ব পালন করে পড়াশোনা করতো, বই লিখতো, মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতো, সমাজ সংস্কারে কল্যাণে কাজ করতো। এখন তারাও এদেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমানোকেই জীবনের মূল ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে। এই যখন অবস্থা তখন বাংলা, বাঙালি এবং বাংলাদেশ নিয়ে শঙ্কিত না হয়ে পারি না।

বাংলা ও বাঙালির অস্তিত্ব বর্তমানে বহুভাবে হুমকির সম্মুখীন। হাজার বছরের প্রবহমান ধারায় বাংলা ও বাঙালির যে সভ্যতা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, এই গড়ে ওঠার ভেতরে বহু কালের দাসত্ব, পরাধীনতা, হীনমন্যতা, কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্র এ সব বাঙালি চরিত্রেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই অপধারার ভেতর দিয়েও বাংলা ও বাঙালির যে শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটেছিল, মহান কিছু বাঙালির আত্মপ্রত্যয়ে ও আদর্শিক রাজনৈতিক-শিল্পসাহিত্য-বিজ্ঞান-সমাজ সংস্কারে, তা ছিল অভাবনীয়। কিন্তু বাংলা ও বাঙালি সেই অভাবনীয়তায় যেভাবে আপন সত্তায় বিকশিত করে শক্ত ভিত্তি রচনা করতে পারতো, তা হয়নি। নিজেদের ভেতর ষড়যন্ত্র, ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা, ক্ষমতার মসনদ, দাসত্ব প্রবৃত্তি, ভিন দেশি শাসকদের পদলেহন–এসব কারণে বাংলা ও বাঙালির ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে, যে

দুর্ভাগ্য ক্রমশ গভীর হয়ে উঠেছে। বাংলার খণ্ডবিখণ্ড রূপ, দেশান্তরিতে ভবিষ্যৎ খোঁজা, বাঙালি সত্তা ভিন্ন সত্তায় একীভূত হওয়া, দেশপ্রেমহীনতা, মেধাবীদের দেশত্যাগ, নিজের দেশের সম্পদ অন্যদেশে পাঠিয়ে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ–ভয়াবহ এক রোগে বাংলা ও বাঙালি আক্রান্ত হয়ে পড়েছে এবং এটা ক্রমশ অপ্রতিরোধ্যভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। এরকম এক অনিশ্চিত অন্ধকারে আমরা নিমজ্জিত, এবং এটা হুট করে যে ঘটেছে, ব্যাপারটি সেরকমও নয়। অনেক আগে থেকেই এই ভয়াবহ রোগের জন্ম, এখন সেটি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠেছে। বাঙালির জীবনে নীতি নৈতিকতা আদর্শ মূল্যবোধ দেশপ্রেম ভাষা প্রেম এসব অর্থহীন অর্থে পর্যবসিত হয়ে যাচ্ছে। বিবেকবর্জিত অর্থ উপার্জন এবং তা বিদেশে পাচার এবং নিজে ও নিজের সন্তান পরিবার-পরিজন বিদেশে স্থায়ীভাবে বাস করাই এখন একমাত্র স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এরকম পরিস্থিতিতে বাংলার ভবিষ্যৎ কী? বাঙালির ভবিষ্যৎ কী? এই প্রশ্ন আমাকে দারুণভাবে দংশিত করে। অথচ বাঙালিরা সংখ্যায় বিপুল, সম্ভাবনায় বিরাট, এই চিন্তা ও উপলব্ধির মধ্যেই আছে সংকট ও নৈরাশ্য কাটিয়ে ওঠার প্রেরণা। কিন্তু সেই চিন্তা ও উপলব্ধি বাঙালির মধ্যে বর্তমানে জাগ্রত হতে দেখি না।

বর্তমানের চরম অবক্ষয়ের অতলে আমরা ডুবে যাচ্ছি, হারিয়ে ফেলছি দেশপ্রেম, নিজেদের স্বকীয়তা ও মূল্যবোধ। বাংলাদেশ থেকে ব্যাপকহারে মেধা পাচার হচ্ছে। এটা এমন একটি পর্যায়ে চলে গেছে যে বাঙালি আগামীতে স্বকীয়তা নিয়ে বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলতে পারবে কি না, সেটা এখন বিরাট প্রশ্ন। যদিও এটার শুরু সেই ব্রিটিশ শাসন বা তারও পূর্ব থেকে। পূর্বে পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকে বাণিজ্য, হজ পালন ও ধর্ম প্রচারের জন্য ভারতীয়রা অন্য দেশে যেতেন, তবে তা কখনো তাদের অন্য দেশে স্থায়ীভাবে বাস করার প্রবৃত্তি তৈরি করেনি। ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, অর্থ-প্রাচুর্য কোনো কিছুর কমতি ছিল না। ভারতের অখণ্ড বাংলা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সাহিত্যে অর্থে সম্পদে বিত্তশালী ছিল, যে কারণে এদেশে বিদেশিরা নিয়মিত এসেছে এবং আক্রমণ করেছে। লুণ্ঠন-লুটতরাজ শাসন শোষণ দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষে মানুষের জন্য নিয়মিত ঘটনা ছিল। নিজের দেশের সম্পদে নিজেদের অধিকার ছিল না, নিজের দেশকে নিজের শাসন করার ক্ষমতা ও সাহস ছিল না, নিজেরা সম্পদ উৎপাদন করেছে, বহিঃদেশীয়রা এদেশে শাসন করে রাজত্ব কায়েম করে তা ভোগ করেছে। নিজের দেশের মানুষ বঞ্চিত হয়েছে নিজেদের উৎপাদিত পণ্য থেকে। এটা এক দুই বছর বা এক দুই যুগের ঘটনা নয়, ভারতবর্ষের জন্ম থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত এটা অনিবার্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলাও সেই নিয়তি একইভাবে বহন করেছে।

বাংলার প্রকৃত ইতিহাস এখনো অনাবিষ্কৃত। যে ইতিহাস ধরে আমরা পথ চলছি, তা তেরো শতকের আগে সবই অনুমান সাপেক্ষ। বাংলার প্রকৃত ইতিহাস রচিত হয়েছে মুসলমানদের হাতে। তুর্কিরা আসার পরে বাংলার ইতিহাস তথ্যনির্ভরভাবে রচিত হয়েছে। এর আগে জ্যোর্তিবিদরা যে ইতিহাস রচনা করেছেন, তাতে সন-তারিখ এসবে উৎসাহ বা গুরুত্ব ছিল না। পৃথিবীর বহু দেশের ইতিহাস পুরাণ-উপাখ্যাননির্ভর। আমাদের বঙ্গ দেশের ইতিহাসও পুরাণের ওপরই নির্ভর করছে। মহাভারত ও রামায়ণের মূল উপাখ্যান তিন হাজার বছরের পুরনো। বাংলার সমাজ, অর্থনীতি, জীবনযাপন এসব জানার জন্যে উপাখ্যান অপরিহার্য। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতক থেকেই যে ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাতে দেখা যায় এদেশে ধন-সম্পদের লোভে মত্ত হয়ে বিভিন্ন বহিঃশক্তি এদেশে এসে নানাভাবে রাজত্ব গড়ার চেষ্টা করেছে–প্রতিভূ প্রতিষ্ঠার অদম্য শক্তি ব্যবহার করেছে। কিন্তু এসব শক্তির বিরুদ্ধে এদেশের মানুষ প্রতিবাদ করেনি–নীরবে তারা শাসিত হতেই ভালোবেসেছে। মনে করেছে, এটা নিয়তি নির্ভর। অথচ তারা নিজেরা দেখেছে এদেশের শাসনভার কায়েম করার জন্য, রাজত্ব দখলের জন্য, নতুন নতুন রাজত্ব তৈরি ও বৃদ্ধির জন্য তারা কতভাবে যুদ্ধ সংঘটিত করেছে, কতভাবে আক্রমণ করেছে, কতোভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে নিজেদের অবস্থান নিরাপদ ও শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছে। সেখানে বাংলার মানুষেরা নিরীহ থেকে, অনুগত দাস থেকে, অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে, পদলেহন করে তাদের নির্দেশ মোতাবেক কর্মপ্রবাহ চালিত হয়ে জীবনজীবিকা নির্বাহ করেছে। অদ্ভুত একটা ব্যাপার, নিজের দেশে অন্যরা এসে শাসন করছে, ফসল উৎপাদন করাচ্ছে, কলকারখানা চালাচ্ছে, অথচ তারা নির্বাক ও নির্বোধের মতো সেসব করে যাচ্ছে এবং সেটাকেই তারা অবধারিতভাবে মেনে নিয়েছে। নিজের শ্রমের মূল্য নেই, নিজেদের মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার অধিকার নেই–অথচ দেশটা কিন্তু নিজেদের। দেশের প্রভূত সম্পদ থেকে শুরু করে সবকিছুর দখলদার বাইরের থেকে আসা অপশক্তি। বড় বড় প্রাসাদ তৈরি করেছে তারা–সেই সব প্রাসাদে নিজেদের ভোগবিলাসের জন্য নান্দনিক কারুকাজ করেছে, এদেশের মানুষকে হত্যা করার জন্য রাজপ্রাসাদের ভেতরেই গোপন ফাঁসিকাষ্ঠ নির্মাণ করেছে। এসব বাংলার বেদনাদায়ক ও ব্যর্থতার ইতিহাস। এদেশের মানুষ একদিকে যেমন ভীরুতার পরিচয় দিয়েছে হাজার বছর, অন্যদিকে নিজেরা নিজেদের মধ্যে কুচক্রী হিসেবে কাজ করেছে, নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত-হানাহানি তৈরি করেছে। নিজেরা নিজেদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়েছে। আমরা কয়েক হাজার বছরের পুরনো এই দেশকে যদি দেখি, সেই ইতিহাসও রক্তাক্ত। তখন এই দেশের মাটি লাল হয়ে উঠেছিল আর্যের হাতে নিপীড়িত অনার্যের রক্তে। ভারতের মাটিতে আর্যদের আদি অভিযাত্রাই ঘটেছে রক্তাক্ত

অধ্যায়ের মাধ্যমে–এদেশে তাদের জীবনপ্রভাত শুরু হয়েছিল নিরীহ শান্তিপ্রিয় অনার্য অর্থাৎ দাস জাতির রক্তসিঞ্চনে। হাজার হাজার বছর বিভিন্ন জাতি এদেশে এসেছে ক্ষমতার অধিকার দখলে–সবার পন্থা একই–রক্তসিঞ্চন। মূল লক্ষ্যও একই নিজেরদের প্রতিষ্ঠা লাভ। এরা সবাই বহিরাগত। এ দেশের মানুষ নিজের দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখার সাহস করেনি। হাজার হাজার বছর শাসিত থেকেছে। ভীরুতা তাদের চরিত্রের প্রধান দিক ছিল। একই সঙ্গে তারা ষড়যন্ত্রকারীও। কিন্তু সেই ষড়যন্ত্র ছিল নিজেদের ব্যক্তিলোভ-লালসা ও স্বার্থনির্ভর। এদেশে সব সময়ই লক্ষ্য করা গেছে রাজাদের অধিনস্ত সামন্তরা রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ বুঝে নিজেরা শক্তি সঞ্চয় করে রাজ্য দখল করে রাজা হয়েছেন অথবা স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করেছেন, রাজাদের ক্ষমতাহীন করে রাখতেন। বাংলার যে অঢেল সম্পদ ছিল, সেই লোভ ও মোহ তাদের নীতি নৈতিকতাকে ধ্বংস করে দিতো। সবাই বাংলার সম্পদের মালিক হয়ে তা লুটতরাজ ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে উঠতো। বাংলার সাধারণ মানুষ কখনো ভাবেনি এ সম্পদ এ ঐশ্বর্য আমাদের–এ দেশকে শাসন করার ক্ষমতা আমাদের–এদেশের সম্পদের প্রকৃত মালিক আমরা। এই চেতনা ও বোধ তাদের মধ্যে কখনো জাগ্রত হয়নি। নিজেরা অন্য প্রভুদের অধীনে থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছে। অথবা তাদের মধ্যে পরাধীনভাবে বেঁচে থাকার মানসিকতা স্থায়ীভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। দেশের স্বার্থ বা দেশপ্রেম বলে সেখানে কিছু ছিল না। এ এক ভয়াবহ বেদনাদায়ক। যে আত্মসচেনতা ইতিহাস রচনার সবচেয়ে বড় শক্তি, তা বাঙালির ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে পরিলক্ষিত হয় উনিশ শতকে। ইতিহাসে সম্ভবত বাঙালিরা নিজেকে নিয়ে তখনি প্রথম ভাবতে চিন্তা করতে গর্ব করতে শেখে। নিজের জাতিসত্তাকে নিয়ে গর্ব করতে শেখে। নতুন শিক্ষাগ্রহণে ও বৈষয়িকভাবে, বাঙালি ভারতের অপরাপর অঞ্চলের তুলনায় ঈর্ষণীয় সফলতা অর্জন করে। নিজেদের বাংলা গদ্য তৈরি করে নেয়, যে গদ্যে নিজের কথা বলতে পারে, নিজের দেশের ইতিহাস লিখতে পারে। প্রকৃত অগ্রযাত্রার শুরুটা সে-সময় থেকেই। স্বাধীনতার জন্য অদম্য হয়ে ওঠা বাঙালির জীবনে তার আগে কখনো পরিলক্ষিত হয়নি। স্বাধীনতার স্বাদও তারা অর্জন করে ফেলে। সাহিত্যসৃষ্টির পরিবেশও তখন থেকেই প্রকৃত অর্থে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তেরো শতকের বিজেতা মুসলমানের হাতে লিখিত বাংলার ইতিহাস নিয়ে গ্রহণযোগ্য-অগ্রহণযোগ্য এসব ব্যাপার আছে, তারপরও সেই ইতিহাস বাঙালির আধুনিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে, তা অস্বীকার করা কঠিন।

বাংলার অর্থ-সম্পদ-ঐশ্বর্য্যর প্রতি লোভ ছিল বহু দূর দেশের ক্ষমতাশালী শাসকদেরও। তারাও এদেশে রাজ্য দখল করেছে, একের পর এক রাজ্যের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। এজন্য

যুদ্ধ-হত্যা-খুন সবই করেছে তারা। নিজের ক্ষমতা নিষ্কণ্টক করার জন্য শত্রু নিধনে বিন্দুমাত্র ছাড় দেয়নি। বাংলার সাম্রাজ্য তাদের মোহময় ও মোহগ্রস্ত করে তুলেছিল, প্রাচুর্যময় রাজসিক জীবন তারা এখানে পূর্ণাঙ্গভাবে ভোগ করেছে। বাংলায় যে এতো বিপুল সম্পদ–প্রাকৃতিক থেকে শুরু করে বহু ধরনের সম্পদে সমৃদ্ধ, বাংলার মানুষেরাও তা অনুমান করতে পারেনি। তাদের বুকের ওপর এসে অন্যরা তাদের শাসন করেছে আর রাজপ্রাসাদ তৈরি করে তা ভোগ করেছে এবং নিজের দেশে চালান করেছে। বাংলার মানুষ শোষণে শাসনে আর বঞ্চনার জীবন পেয়েছে। এখানকার ধনসম্পদ প্রাচুর্য বন্দর-গঞ্জ, জিনিসপত্র, দাস-দাসির সস্তা দাম, নদীতীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য আকর্ষণীয় ছিল।

ধর্মের ভিত্তিতে বাঙালি বিভাজনের যে ইতিহাস রচিত হয়েছিল, তা ছিল নিষ্ঠুর। ব্যক্তিস্বার্থ ও ক্ষমতাকে ব্যবহারের জন্য বাংলা বিভাজনে ধর্মকে যে নিকৃষ্টভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল, তা ছিল অদূরদর্শীতা পূর্ণ ও কদর্য মানসিকতার প্রকাশ। ১৯৪৭ সালে মুসলমানরা বাংলা ভাগ চায়নি, তারা চেয়েছিল অখণ্ড বাংলা বা অবিভক্ত বাংলা। কিন্তু হিন্দুরা চাইলো বাংলা ভাগ। ১৯০৫ সালে কার্জন যা চেয়েছিলেন ১৯৪৭ সালে হিন্দুরা স্বেচ্ছায় সেই প্রস্তাবকে কার্যকরি করে ফেললো। লর্ড কার্জন, এন্ড্রু ফ্রেজার এবং রিজলে বাংলাকে ভয় পেতেন। সে কারণে ইংরেজরা চেয়েছিল বাংলা ভাগ, নিজেদের স্বার্থেই চেয়েছিল। তখনকার সময়ে বাঙালির অর্থনৈতিক উত্থান, শিল্পশক্তি এবং রাজনৈতিক সচেতনতাসহ বিপ্লবীদের স্বাধীনতাকামী অদম্য মনোভাব ও সংগঠিত সশস্ত্র বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য ইংরেজরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তারা ভারতবর্ষে নিজেদের চিরস্থায়ী অদম্য যে শক্তি ভেবেছিল, সে ভাবনাতে বিপ্লবীরা আশ্চর্যরকম ফাটল ধরিয়ে দেয়। তারা এতটাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে নিজেদের নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনা করে বাংলা থেকে রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তর করে। এরকম পরিস্থিতিতে ব্রিটিশের চরম চতুরতায় ভারত দ্বিখণ্ডিত হলেও বাংলাকে অখণ্ড রাখার শেষ চেষ্টা করেছিলেন এই প্রদেশের দুজন শীর্ষস্থানীয় নেতা শরৎ বসু ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। কিন্তু সেদিন সাম্প্রদায়িকতার আবেগে, প্রদেশের বিজ্ঞতম মনীষীরাও বাঙালির স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করে, তার ওপরে জায়গা করে দিয়েছিলেন সাম্প্রদায়িকতাকে। তারা জানতেন এই বিভাজনের ভেতর দিয়ে পরবর্তী সময়ে রক্তাক্ত অধ্যায়ের সূচনা হবে। বাস্তবে হয়েছিলও তাই। কারণ ইতিহাসের অভিপ্রায় তো এই সত্য বহন করেছিল, বৃহত্তর বাঙালি সমাজকে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করে দিলে, কেউই তার নিজস্বতা বিসর্জন দেবে না। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাঙালিত্বের মোচন ঘটাবে না। কারণ ভারত বৃহৎ রাষ্ট্র–বহুজাতিক–বহুভাষিক। সেখানে বহু ভাষার বহু মানুষ সমমর্যাদার সঙ্গে বসবাস

করে। পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পূর্ব বাংলাও তার বাঙালি সত্তাকে বিসর্জন দেবে না। বরং পাকিস্তানে পূর্ববাংলা ও বাঙালি সত্তাকে নতুন করে আবিষ্কার করবে। কোনো মূল্যেই অবাস্তব এক জাতীয়সত্তার কাছে বাঙালি আত্মসমর্পণ করবে না। তখন সংকট থেকে গভীরতর সংকট তৈরি হয়ে রক্তাক্ত পথের সূচনা করবে। বাস্তবে ঘটলোও তাই। সেই রক্তাক্ত পথেই ইতিহাসের প্রথম বাঙালি-অধ্যুষিত স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়–বাংলাদেশ।

ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা লক্ষ করি, একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী হিন্দুরা ইংরেজ শাসনের শুরু থেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে একচেটিয়া সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে, নিজেদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করেছে। পূর্ব বাংলা ও আসামের কিছু অংশে মুসলমানরা প্রধান হওয়া সত্ত্বেও একশ্রেণির সুবিধাবাদী হিন্দু ও ইংরেজ কোম্পানির লোকেরা সেখানে আইন ব্যবসা, ডাক্তারি, চা ও পাটের ব্যবসায় পুরো কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। মুসলমানরা সেখানে কর্তৃত্বহীন থাকতে বাধ্য হয়েছে। কারণ বিভাজনের খেলায় ইংরেজদের পুরো অনুকম্পা লাভ করেছিল সুবিধাবাদী হিন্দুশ্রেণি এবং নিজেদের স্বার্থে ইংরেজকে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছিল। এরা শিক্ষা-দীক্ষায় যেভাবে পারদর্শী হয়ে উঠতে পেরেছিল, মুসলমানরা সেক্ষেত্রে অনেক পশ্চাৎপদ ছিল। ফলে সেসময় শিক্ষিত সমাজ বলতে তাদেরই বোঝাতো। অথচ এই শিক্ষিত ভদ্রলোকদের দেশের সর্বসাধারণের কল্যাণ ও মঙ্গলের চিন্তা করে দেশের একটি সর্বজনীন স্বাধীন ও মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা বা পরিকল্পনা কোনোদিনই ছিল না, কোনোদিনই তারা ভাবেনি এই দেশটি পরাধীন–এই দেশটিকে স্বাধীন করে নিজেরা ক্ষমতা গ্রহণ করা প্রয়োজন। শিক্ষিত সমাজ সবসময়ই কৌশলী আচরণের ভেতর দিয়ে চলেছে, তারা সব সময় রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করার কূটকৌশল করেছে। যাতে সমাজের ক্ষমতাবান হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং সর্বধরনের সুযোগসুবিধা একচেটিয়াভাবে গ্রহণ করতে পারে। এই ছিল শিক্ষিত সমাজের মূল উদ্দেশ্য। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রয়াসে বাংলার জাগরণ যেভাবে ঘটার প্রয়োজন ছিল, রাজনৈতিক অপতৎপরতায় তা ঘটেনি। বাঙালিত্বের চেয়ে ধর্ম সেখানে বড় হয়ে উঠেছিল। সাম্প্রদায়িকতা সেখানে ভাঙনের মূল কারণ হয়ে উঠেছিল। বিশেষ কোনো ধর্মের লোকের সমাজের সংখ্যা গরিষ্ঠতা ও কূটকৌশল আর এক ধর্মের লোকের কাছে বিষবাষ্প হয়ে উঠলো। বাংলা ও বাঙালি সেখানে গুরুত্বহীন হয়ে উঠলো। ধর্মভিত্তিক ভবিষ্যৎ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো। চাকরি বাকরিসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রেও এটাই প্রধান বিবেচ্য হয়ে ওঠে। বাংলা ও বাঙালির দুর্ভাগ্যের সবচেয়ে বড় কারণ এটি। হিন্দু ও মুসলমান–কেউই মনে-প্রাণে বাঙালি হয়ে উঠতে পারেনি, কেউই ধর্মের বাইরে এসে নিজেদের একক সত্তায়

প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। আর সে কারণেই এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের শত শত বছরের সভ্যতা ঐতিহ্য সংস্কৃতি ধ্বংস করতে মরিয়া হয়ে উঠতে পেরেছিল। ধর্মের উর্ধ্বে উঠে নিজেরা বাঙালি সত্তায় জাগরিত হলে বাংলার কোনো ধর্মের মানুষের পক্ষেই এই সব ধ্বংসযজ্ঞ ঘটানো সম্ভব ছিল না। বিশেষ এক শ্রেণির নেতাদের একগুয়েমির কারণে দেশ-বিভাগ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, যারা মনে-প্রাণে সাম্প্রদায়িক ছিল, চলনে-বলনে-কথনে বাঙালিয়ানা থাকলেও, মনে-প্রাণে বাঙালি ছিল না। মনে-প্রাণে বাঙালিত্ব ধারণ-লালন করলে বাংলার বুকে নিষ্ঠুর ছুরি চালিয়ে খণ্ডিত করতে পারতো না। অবধারিতভাবে ধর্মটাই সেখানে বড় ছিল, বাঙালিত্ব নয়। অথচ অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্য বাংলায় বিপ্লববাদের জন্ম ঘটেছিল। এই বোধে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে, ইংরেজদের আক্রমণ করতে থাকে। তাদের মধ্যে অনুভূত হতে থাকে এ দেশ আমাদের–ইংরেজকে উৎখাত করতে হবে। যদিও এখানেও বিভাজন ছিল। একশ্রেণির লোক ইংরেজ শাসকদের অনুগত থেকে বিত্তবৈভবের মালিক হয়েছে। একইভাবে রাজনীতিকদের মধ্যেও এ বিভাজন তৈরি হয়। বাঙালিদের মধ্যে নানারকম বিভাজন সৃষ্টি করে তারা ক্ষমতা স্থায়িত্ব করার অদম্য চেষ্টা করেছে। যে কারণে বাংলাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে বাংলাকে ক্ষমতাহীন করার চেষ্টা করেছে। বিপ্লবীরা ইংরেজদের এই অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে তাদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করে স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। তাদের স্বপ্নও ভূলুণ্ঠিত হয়েছে।

ভারতবর্ষে বাংলার সীমানা কিন্তু অনেক বড় ছিল। বাংলা নিজেই একটি সুবৃহৎ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হতে পারতো। পূর্ব বাংলা, পশ্চিম বাংলা, আসাম ও ত্রিপুরা–চার বাংলা নিয়ে অখণ্ড বৃহৎ বাংলা রাষ্ট্র গঠন করলে, বর্তমানে বাংলার বিভাজিত এই রূপ দেখতে হতো না। বাঙালির যে বহুমাত্রিক অবক্ষয় দ্রুততার সঙ্গে ঘটছে, সেটাও সম্ভব হতো না। বাঙালি তার ইতিহাস ঐতিহ্য শিক্ষা সংস্কৃতি প্রকৃত মূল্যবোধ নিয়ে স্বকীয়তায় বাঁচতে পারতো। নিজের দেশে নিজের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারতো। নিজের দেশকে অনিশ্চিত মনে করে বিভিন্ন দেশে তাদের নিশ্চিন্ত জীবনের সন্ধানে যেতে হতো না। '৪৭ এর পূর্বে ইংরেজশাসিত থাকলেও বাংলার মেধাবী সন্তানেরা শিক্ষা লাভের অভিপ্রায়ে বিশ্বখ্যাত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গেলেও, শিক্ষা সম্পন্ন করে দেশের কল্যাণে দেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করে নিজেদের মেধার সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করেছে। দেশপ্রেম তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বর্তমানে কী দেখছি? চলে যাচ্ছেন তো চলেই যাচ্ছেন–অন্য দেশকে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করে, সে দেশেই চিরকালের মতো নিজের ঠিকানা করে নিচ্ছেন। তাদের দ্বিতীয় প্রজন্ম বাংলার কথা শুনলেও তার পরবর্তী প্রজন্ম থেকে এই বাংলার মাটি সবুজ প্রান্তর ভাষা আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধ এসব অচেনা অধ্যায়। তারা ভিন্ন জাতির মানুষের

সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে–তাদের ঘরে জন্ম নেওয়া সেই সব সন্তানদের জাতিগত পরিচয় কি? বাংলা-বাঙালি-বাংলাদেশ তাদের কাছে কোন বিশেষত্ব বহন করে? তাদের কাছে বাঙালিত্ব বলে আদৌ কোনো ব্যাপার থাকে কী? বাঙালির শক্তিমত্তা বলতে যা বোঝায় তা তাদের কাছে অপাঙক্তেয়–কোনোভাবেই তাদের চিন্তা-চেতনায় তা কাজ করে না। সময়ের প্রবহমানতায় তাদের রক্তধারা থেকেও বাংলা বাঙালি বাঙালিত্ব এসব হারিয়ে যায়, যাচ্ছে। হয়তো প্রবাসী বাঙালির কাছেও এই বাস্তবতা বর্তমানে প্রত্যাশিত রূপ নিয়েছে এবং যে প্রত্যাশার কাছে তারা পরাভূত হয়ে পড়েছে। এই রূঢ় ও নির্মম বাস্তবতা আমরা পরিষ্কারভাবে অনুভব করছি। তাহলে বাংলার ভবিষ্যৎ কী? বাঙালির ভবিষ্যৎ কী? বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ কী? বাঙালির শক্তিমত্তার ভিত্তি কী? চোখ বন্ধ করে একশ দুশ বছর ভবিষ্যতে তাকালে আমার হাজার বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলার করুণ বিবর্ণ ছবিটি অনুধাবন করে নিতে পারি।

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ত্রিপুরাই হচ্ছে বাঙালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল। একসময় আসামে সিকিমে অরুণাচলে মণিপুরে মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী বেশি ছিল। মেঘালয়ের রাজধানী শিলং ও অন্যতম প্রধান শহর তুরায় ঐতিহাসিকভাবেই উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বাঙালি বংশপরম্পরায় বসবাস করে আসছে। দেশ-বিভাগপূর্ববর্তী মেঘালয়ের দাফতরিক কাজে বাঙালিদের আধিপত্য ছিল। তবে এখন সেখানে ক্রমশ বাংলা ভাষার ব্যবহার কমে যাচ্ছে। বাঙালির বাঙালিত্ব পলেস্তারার মতো খসে পড়ছে। জীবনজীবিকা প্রতিষ্ঠা পরনির্ভরশীলতা তাদের গ্রাস করে নিচ্ছে। অথচ বাঙালির যে দাপট ছিল, যে সম্মান সম্ভ্রম সমীহ ছিল, সেসব হারিয়ে যাচ্ছে। যদি এই প্রবাহ ঠেকানো না যায়, তাহলে বাঙালির ভবিষ্যৎ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। এমন তো নয় পৃথিবীতে কোনো জাতি কখনো হারিয়ে যায়নি, কোনো ভাষা কখনো হারিয়ে যায়নি। বহু জাতি বহু ভাষা হারিয়ে গেছে। জাতিসত্তা হারিয়ে গেছে। বাঙালিও যদি তার বাঙালিত্বকে ধারণ না করে, লালন না করে, বাংলা ভাষাকে যদি ব্যবহারিক জীবনে কার্যকরি করে না তুলে, নিজের দেশের প্রতি দায়বোধ অনুভব না করে, তাহলে কালের যাত্রায় বাঙালির গৌরবময় বেঁচে থাকা যে অনিশ্চয়তার শিকার হবে, এই সময়কালের চলতি হাওয়ার পদ্ধি তো স্পষ্ট করে দেয়। সেদিক বিবেচনা করলে বাঙালির ভবিষ্যৎ আতঙ্কিত অবস্থার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলা এখন আর বাঙালির কাছে সুন্দর ও নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের জায়গা নয়, প্রাচুর্যময় ভবিষ্যতের স্থান নয়, বাঙালি বাংলায় নিজেদের কোন ভবিষ্যৎ দেখে না। বিভিন্ন উন্নত দেশে বাঙালি তার ভবিষ্যতের মোহে কাতর কাঙাল হয়ে উঠছে। বাঙালি কোনদিন

বাংলাকে নিজের করে ভাবেনি। বাংলার প্রতি তাদের দৃঢ় দেশপ্রেম চিরকালই ঘাটতি ছিল। বাংলা প্রাকৃতিক সম্পদের পাহাড় তাদের চোখে পড়ে না। মনে ধরে না। বাংলার মানুষেরা আদৌ নিজের সম্পদে অধিকারবোধ ধারণ করেনি। এই মেরুদণ্ডহীনতা হাজার বছর পেরিয়ে এখনো একইভাবে বহাল রয়েছে। মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানোর শক্তিটা এখনো অনুভব করে না। দুর্ভাগ্য, বাঙালি নিজেই তার শক্তি সম্পর্কে কোনোদিন জানার চেষ্টা করেনি। ব্যক্তি লোভ-লালসা আর হীন চক্রান্তে নিমজ্জিত থেকেছে, তাতে পরাধীনতা বেড়েছে, মেরুদণ্ড ক্ষয়ে ক্ষয়ে মেরুদণ্ডহীনতায় পরিণত হয়েছে, নিজস্বতা হারিয়ে অন্যের নিজস্বতাকে ধারণ করে অগৌরবের বাঁচাকে গৌরবের করে ভাবতে শিখেছে। যে ভাবনার ভেতরে বাঙালির বাঙালিত্ব তলিয়ে যাচ্ছে–ভেসে যাচ্ছে কালের নিষ্ঠুর স্রোতে।

বাঙালির দেশপ্রেম কোনো কালে ছিল কি না, সে প্রশ্নও রাখা যায়। দেশপ্রেম থাকলে, বাংলা ভাষার প্রতি দরদ থাকলে তো বাংলা ভাগ হয় না। বাংলা ভাগে বাঙালির কি কোনো লাভ হয়েছে? না। বাঙালির অবক্ষয় এখন সর্বত্র এবং ভয়াবহ। এই অবক্ষয়ের মাত্রা অকল্পনীয় ও লজ্জাজনক। মাথা নিঁচু হয়ে যায় নিজের জাতি নিয়ে যখন এসব কদর্য সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়। একজন বাঙালি হিসেবে আমার নিজেরই প্রশ্ন জাগে, কেমন জাতি আমরা? পৃথিবীতে কি এমন জাতি আর দ্বিতীয়টি আছে? কোনো জাতি কি এত স্ববিরোধিতা করে? নিজেরা নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ লোভ-লালসায় নিজের দেশের নিজের জাতির এত ক্ষতি করে?

আমরা সেই জাতি, যারা স্বেচ্ছায় দেশ ভাগ করে পরাধীনতায় স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পছন্দ করি। পূর্বপুরুষদের ভিটেমাটি থেকে স্বেচ্ছায় উচ্ছেদিত হই– দেশান্তরিত হই, আবার ভাষার জন্য আবেগে প্রতিরোধ, আত্মত্যাগ করি। আবার সেই বেদনা শ্রদ্ধবোধ ভুলে নিজ ভাষাকে অবজ্ঞা অবহেলা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। বাঙালি ইংরেজিতে কথা বলে এবং সেটাকে গর্ব মনে করে। এ নিয়ে তাদের অহংকারেরও কমতি নেই। কী ভয়ানক এক মানসিক রোগে আক্রান্ত আমরা!

এদেশ থেকে বহু মেধাবী মানুষ বিদেশে গিয়েছেন, অধ্যয়ন করেছেন। কেউ তো তারা ভিন দেশকে আজীবন বসবাসের কথা ভাবেননি। আবার দরিদ্র শ্রেণির মানুষেরা বিদেশে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করে স্থায়ীভাবে চলে গেছেন। এ সবের শুরু ব্রিটিশ শাসনকালে। মূল অবক্ষয়ের যাত্রার শুরু সেখান থেকেই। ব্রিটিশ রাজত্বকালে অবিভক্ত বাংলার আসাম প্রদেশের শ্রীহট্ট অর্থাৎ সিলেট থেকে বিলেতগামী জাহাজে প্রচুর শ্রমিক ও সারেং জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ করতো। শিল্প বিপ্লবে সমৃদ্ধ ও ব্রিটিশ রাজত্বে অনুগত অন্য দেশসমূহ থেকে বাণিজ্য সুবিধা অর্জন করে তখন লন্ডন, ম্যানচেস্টার,

ডাবলিন, ব্রাইটন আলোক উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো শহর ও বন্দরে পরিণত হয়েছিল। এসব দেখে এবং অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা প্রাপ্তির আশায় তারা লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। এছাড়া লন্ডনের রেস্তোরাঁয় কাজ করার জন্য সিলেট ও নোয়াখালী অঞ্চল থেকে বহু মানুষ লন্ডনে গেছে। উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা, ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে যে ভারতীয়রা তখন লন্ডনে যেতেন, তাঁরা শিক্ষা সম্পন্ন করে স্বদেশে ফিরে আসতেন। এক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, জওহরলাল নেহেরু, শরৎ বসু, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জ্যোতি বসু আচার্য, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, স্যার জগদীশ চন্দ বসু, বিজ্ঞানী এম এন সাহা, আচার্য শ্যামাপ্রসাদসহ বহু রাজনীতিবিদ-বিজ্ঞানী-গবেষক-শিক্ষাবিদ প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁরা সবাই প্রয়োজনীয় উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশপ্রেমের টানে স্বদেশে এসে মাটি ও মানুষের জন্য কাজ করেছেন।

ভারত– পাকিস্তান আলাদা দেশ হওয়ার পর এটি অপধারায় পরিণত হয়। চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক, স্থাপত্যবিদ, সাংবাদিক, চিত্রকর, ভাস্কর, অভিনয় শিল্পী শুধু লন্ডনে নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মান, নিউজিল্যান্ড ও ইউরোপে পেশা নিয়ে দেশত্যাগ শুরু করেন। সে সব দেশের উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা, সুশাসন, অবকাঠামো সুযোগ ও সামাজিক নিরাপত্তায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁরা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এভাবে দেশের মেধাবী সন্তানেরা ক্রমশ দেশ ত্যাগ করে বিদেশে চলে গেছে, এবং এখনো প্রবল গতিতে সেদিকেই ছুটছে। দেশ মেধাশূন্য হয়ে অকার্যকর রাষ্ট্র হওয়ার লক্ষণ তখন থেকেই শুরু হয়। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই ভয়ংকর প্রবণতা সুনামির রূপ ধারণ করেছে। মেধাপাচার আন্তর্জাতিকভাবে একটি অভিবাসন প্রক্রিয়ার অনুসঙ্গ। মেধাবী, শিক্ষিত ও অন্য দেশে অভিবাসনের উদ্দেশ্যে নিজ দেশত্যাগের ঘটনা এখন নিয়মিত ঘটে চলেছে। মেধাবী ও প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের এই প্রবণতা রোধ করতে না পারলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি হবে সুদূর পরাহত। মজবুত টেকসই অর্থনীতি নিয়ে আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে মেধাবীরা ভবিষ্যতের আশায় দেশত্যাগ করছেন। চরম নিরাপত্তাহীনতা, সুশাসনের অনুপস্থিতি, প্রতিভাবানদের বিকশিত হওয়ার পথে অন্তরায়ের কারণেও এই দুঃখজনক মেধা পাচার সংঘটিত হচ্ছে। মেধাবী তরুণ প্রজন্মের বড় অংশ দেশে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। তারা উন্নত দেশের স্বপ্নে বিভোর থাকে। নীতি নির্ধারকদের উদাসীনতার কারণে আমরা মেধাবীদের হারাচ্ছি। আমাদের মেধাবী সন্তানেরা বিদেশে উন্নত শিক্ষা ও গবেষণা সম্পন্ন করে সেদেশে স্থায়ী হয়ে বিরল অবদান রাখছে। আরও করুণ চিত্র

হলো আমাদের দক্ষ ও পারঙ্গম জনশক্তি ব্যবহার করে সে সব দেশ সমৃদ্ধ হচ্ছে, অর্থনৈতিকভাবে পরাক্রমশালী হচ্ছে। সেখানে বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশ যোজন মাইল দূরত্বে অবস্থান করে যে তিমির, সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। এসব দেখেও আমাদের কোনো আকার-বিকার নেই।

বর্তমানে নানা দুর্নীতি ও অবস্থাপনার পাশাপাশি যে বিষয়টি সবচেয়ে উদ্বেগের কারণ তাহলো মেধাপাচার। একটা দেশের ধ্বংসের জন্য সে দেশের মেধা শূন্যতাই যথেষ্ট। আমরা কি সে পথেই প্রবল গতিতে ছুটে যাচ্ছি না! প্রবল এক মোহে দূর আমেরিকা লন্ডন অস্ট্রেলিয়া কানাডাসহ উন্নত বিভিন্ন দেশে নিজেদের ভবিষ্যৎ তৈরি করছি। এর পক্ষে-বিপক্ষে অনেক যুক্তি দেখানো যাবে, আমি সেদিকে যাচ্ছি না। আমি বাঙালির বাঙালিত্বের কথা বলতে চেয়েছি, দেশপ্রেমের কথা বলতে চেয়েছি। আমরা কি গভীর এক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি না? আমাদের অস্তিত্ব কি সংকটের মুখে পড়ছে না? এসব নিয়েই আমার আত্মপোলব্ধির কথা বলতে চেয়েছি। আমার কথা-চিন্তা-আত্মপোলব্ধির সঙ্গে অনেকের দ্বিমত থাকতেই পারে। সেটাকেও আমি সম্মান জানাই। এটা আজ সচেতন মানুষের কাছে পরিষ্কার যে শিক্ষিত জনশক্তি সৃষ্টিতে দেশের আপামর জনগণের অবদান অনস্বীকার্য। মেধাবী শিক্ষার্থীরা সরকারের টাকায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য সিংহভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা সরকারি অনুদান নিয়ে বিদেশে যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও পিএইচডিসহ উচ্চতর বিভিন্ন গবেষণাকর্মের জন্য অনুদান বা বৃত্তি গ্রহণ করে বিদেশে যান। কিন্তু তাদের বৃহৎ অংশ আর দেশে ফিরে আসেন না। কারণ দেশে তাদের উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগানোর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নেই। সামাজিক নিরাপত্তাসহ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নেই। যথাযথ মূল্যায়ন নেই। নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের নিশ্চয়তা নেই। অভিযোগ আছে সুশাসন ব্যবস্থাও নেই। অন্যদিকে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রত্যেক খাতে সার্বিক অবক্ষয়ের কারণে এসব শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মাঝে দেশপ্রেম ও নীতি নৈতিকতারও প্রচণ্ড অভাব ঘটে। দেশ ও সমাজের প্রতি তারা কোন দায়বোধ অনুভব করে না। এসবের পেছনে বৈশ্বিক অনেক কারণও রয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতীয়তাবাদী শক্তি উদ্ভব হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণ কমে যায়। অথচ পরাশক্তির ক্ষমতার এই যুদ্ধটা শুরুই হয়েছিল গোটা দুনিয়া নতুন করে ভাগ বাটোয়ারা করার অভিসন্ধিতে। সারা দুনিয়ায় গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন প্রমুখ বড় উপনিবেশবাদী শক্তির উপনিবেশগুলোতে এক পর্যায়ে আধিপত্য বিস্তারে হিটলারের জার্মানি মরিয়া হয়ে উঠেছিল। এটা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, দুটি বিশ্বযুদ্ধের জন্যই মূলত দায়ী তারা। এ জন্য তাদের অজুহাত সৃষ্টির অভাব হয়নি। অজুহাত যতই থাকুক, মূল

কারণ ছিল সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়াই হিটলার ও তার জার্মানির লক্ষ্য ছিল। সেটি তারা পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। তবে মন্দের ভালো যে তাদের এই আগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা বিশ্ব উপনিবেশবাদ কবরে পতিত হয়। কিছু স্বাধীনতাকামী দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। কিছু দেশ পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তি পেয়ে শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থায় ফিরে যায়। তাই বলে সাম্রাজ্যবাদ হাল ছাড়েনি। নয়া ঔপনিবেশিক শক্তি নতুন রূপে অর্থনৈতিক শোষণে তারা বেঁধে ফেলে গোটা দুনিয়াকেই। কিন্তু তখনো পর্যন্ত নিজেদের মাটিতে পরাধীন জাতির লোকদের প্রবেশাধিকার মানতে পারেনি। সেটা ছিল সাদা চামড়ার অহংকার। এই বর্ণবাদী চরিত্র তাদের মধ্যে আরও দেড় দশক ছিল।

সত্তরের দশকে পেট্রো-ডলারের দাপটে তা ভেঙে পড়তে শুরু করে। ঐ দশকের শেষ দিকে সুইডেন এক নতুন তত্ত্ব হাজির করে। যদিও ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে তার ভূমিকা ছিল না। তবে শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে স্বল্প জনসংখ্যার দেশ সুইডেন একটি সত্য উপলব্ধি করে। আর তা হলো শুধু বস্তুই সম্পদ নয়, আসল সম্পদ হলো কর্মীর হাত ও মেধা। সেটিই তাদের সবচেয়ে বড় অভাব। মাথাপিছু রোজগারে তখন সুইডেন সবার শীর্ষে। কাজেই টাকার অভাব নেই। ছিল কর্মীর অভাব। সে কর্মী শুধু কারখানার শ্রমিক নয়। অভাব উচ্চশিক্ষিত, উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মী, পেশাজীবীর। তারা এটাও অনুধাবন করে, নিজের টাকায় শিক্ষিত কর্মী ও পেশাজীবী তৈরি করা অনেক কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল। বিনিয়োগ যেমন বেশি, তেমনি রাতারাতি তা তৈরিও করা যায় না। তার চেয়ে সহজ বিদেশ থেকে মেধা ভাড়া করা ও কিনে নেওয়া। সুইডেন এ পথকেই গ্রহণ করে।

সত্তরের দশকে এই মূলনীতির আড়ালে তথাকথিত নয়া উদারবাদী পথ ধরে সুইডেন তার সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেয় গরিব দেশের শিক্ষিত প্রতিশ্রুতিশীল কালো, বাদামি ও পীত যুবকদের জন্য। ফলও মিলতে শুরু হয় হাতে হাতে। সুইডেনের এই পদ্ধতি অচিরেই পশ্চিমের অন্যান্য দেশও অনুসরণ করতে শুরু করল। তারাও শিক্ষিত তরুণদের জন্য তাদের দরজা খুলতে শুরু করে। পশ্চিমের সাদা দুনিয়া বেনো জলের মতো কালো, বাদামি, হলুদ চামড়ার শিক্ষিত মানুষে ভরে গেলো। সাদা দুনিয়ায় যেতে পারার গৌরবে কালো, বাদামি, হলুদ চামড়ার শিক্ষিতরা তখন আত্মহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু একবারও তারা ভাবেনি, নিজের দেশের গরিব মানুষ তাদের মেধার লালন করেছে ও বিকাশ ঘটিয়েছে, সবকিছু উজাড় করে তাদের তৈরি করেছে। স্বদেশের সেই গরিব মানুষদের তারা কতখানি বঞ্চিত করছে, এটা তারা ভাবার প্রয়োজন মনে করেনি। ব্যক্তিগত স্বার্থকেই তারা বড় করে দেখেছে। পুঁজিবাদে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের জৌলুস আছে। এই শিক্ষিত পেশাজীবীরা সাদা দুনিয়ায় বাসিন্দা হয়ে স্বদেশের সঙ্গে সব

যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নিজের দেশ অচেনা অজানা অপরিচিত হয়ে ওঠে। আয়-রোজগারের কানাকড়িও তারা দেশে পাঠায় না। স্বল্পশিক্ষিত, আধা দক্ষ শ্রমিকদের গতর খাটানো ডলারে আমাদের রাজকোষের এত জৌলুসের কারণ। চিন্তক বুদ্ধিজীবীরা এটাকে মেধা পাচার (ব্রেন ড্রেন) নাম দিয়েই দায় সেরে ফেলে। অথচ এটা যে পুরোনো বস্তুসম্পদ লুণ্ঠনের পরিবর্তে মেধা লুণ্ঠনের নতুন সূত্র, সেটি চাপা পড়ে গেলো। বর্তমানে এটাকেই বলা হচ্ছে মেধাস্বত্ব। যা স্বল্প উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ হতে চলেছে। বাংলাদেশের অবস্থাও কি তাই নয়? এদেশের মেধাবী অন্য দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অভাবনীয় অবদান রাখছে। আর নিজের দেশ মেধাশূন্যতায় অবক্ষয় ও অব্যবস্থাপনায় অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছরই অসংখ্য শিক্ষার্থী বিদেশে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে যান। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই পড়াশোনা শেষ করে সেখানে চাকরিতে প্রবেশ করে পরবর্তী সময়ে সেখানকার স্থায়ী নাগরিক হয়ে যান। এতে করে বাংলাদেশ প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থী হারাচ্ছে। একজন মেধাবী দেশে যখন তাঁর যোগ্যতা অনুসারে চাকরি না পান, তখন তিনি হতাশ হবেন, অনিশ্চয়তায় ভুগবেন, এটাই স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে নিরাপদ, সচ্ছল জীবনযাপনের জন্য তিনি যদি বিদেশে চলে যান, তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়া বা দেশের প্রতি অকৃতজ্ঞ বলে দায়ী করা যায় না। কাজেই বিদেশে মেধা পাচার রোধে দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষকে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এ দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্য মূল্যায়নের মাধ্যমে তাঁদের দেশের কল্যাণে নিয়োজিত করার পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। নীতি-নির্ধারক কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

উচ্চ শিক্ষালয়গুলোর নিয়ন্ত্রক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য দিয়ে শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে ব্যয় সামঞ্জস্য করার ক্ষেত্রে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। একজন উচ্চ শিক্ষার্থী মেডিক্যাল, বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং, পিএইচডি ও অন্যান্য শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত তহবিল ছাড়াও সরকারের রাজস্ব খাত থেকে বড় একটা অংশ ব্যয় করতে হয়। এই শিক্ষার্থী তার শিক্ষাজীবন শেষে দেশের কল্যাণে কাজ করবে এটাই দেশ প্রত্যাশা করে। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য, বড় বড় ডিগ্রি অর্জন করে তারা বিদেশে পাড়ি জমিয়ে সেসব দেশের সেবা করে। আমাদের গরিব দেশের মানুষের করের টাকায় অর্জন করা মেধা চলে যাচ্ছে অন্য দেশে। কিন্তু কেন চলে যাচ্ছে মেধাবীরা, এই প্রশ্ন সবার। আসলে এ ব্যাপারে ভাবার ও সঠিক করণীয় কাজটি করার ক্ষেত্রে সরকারি, আধা সরকারি ও

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সুদূর প্রসারি কার্যকরি পরিকল্পনার ব্যাপক অভাব রয়েছে। আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, নিরাপত্তাহীনতাসহ নিজেকে বিকশিত করার অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে মেধাবী তরুণ প্রজন্মের একটি বড় অংশ উন্নত দেশে চলে যান। উন্নত দেশের গবেষণা, প্রযুক্তি আর স্থিতিশীলতাকে কাজে লাগিয়ে এই মেধাবীরাই সেসব দেশকে আরও শক্তিশালী ও পরাক্রমশালীভাবে গড়ে তোলেন। এটা সম্পূর্ণভাবে মেধা পাচার বা ব্রেইন ড্রেইন। বাংলাদেশে সরকারি অথবা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সবখানেই আছেন মেধাবীরা। চোখেমুখে তাঁদের জানার আগ্রহ অপরিসীম। সজীব তারুণ্যে ভরা এসব মেধাবী শিক্ষায় নিজেদের তৈরি করে অনেকেই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ছাত্রাবস্থায় অথবা কর্মজীবনের শুরুতেই তাঁদের এক বিশাল অংশ বিদেশে যাওয়ার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন। এক সময় চলেও যান। মেধার বিকাশ ঘটাতে গুণগত শিক্ষা আর উন্নত গবেষণার দরকার আছে। তা ছাড়া প্রতিযোগী না থাকলে প্রতিযোগিতা জমে না।

বিশ্বায়নের যুগে তাল মেলাতে বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছেন ঠিকই। তবে তাঁদের অনেকেই দেশ থেকে চলে যাচ্ছেন বাইরে। দেশের মাটিতে বড় হয়ে, সেখানে উচ্চশিক্ষা নিয়ে, পরে শিক্ষকতাসহ প্রথম সারির বিভিন্ন পেশার কর্মক্ষেত্র ছেড়ে বিদেশে চলে যাচ্ছেন। ভিন দেশের উন্নত গবেষণা ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের আরও যোগ্য করে গড়ে তুলছেন। অনেকেই বাইরে গিয়ে সফল হলেও কেউ কেউ হয়তো সেটা পারছেন না। তবুও তারা হাল না ছেড়ে থিতু হয়ে পড়ে থেকে সেসব দেশে একসময় স্থায়ী হন।

উন্নত বিশ্বে শিক্ষা ও গবেষণায় রাজনীতির ভিন্ন ভিন্ন রঙ নেই। জাতি তৈরির মহান পেশা শিক্ষক হতে হলুদ-বেগুনি, সাদা দল নয়, যোগ্যতা ও গবেষণার মানই মুখ্য। বিশ্ববিদ্যালয় আর বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষকেরা দিনরাত কাজ করেন আবিষ্কারের নেশায়। শিক্ষা ও গবেষণায় অর্জিত ফসল ছড়িয়ে যাচ্ছে সবার কাছে। কৃষি, শিল্প কারখানায় সব জায়গায়। বিদেশের মাটিতে ওদের সঙ্গে মিশে প্রতিযোগিতায় আমরাও এগোতে পারি। দেশেও তা সম্ভব। নিজ জায়গায় স্বচ্ছতা ও দায়িত্ববোধের আজ খুব দরকার। সে পরিবেশ তৈরির জন্য রাষ্ট্রকে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে। তুখোড় মেধাবীদের সুবিধা দিয়ে দেশের জন্য কাজে লাগাতে হবে। মূল্যবোধ, অনৈতিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা, দুর্নীতি, লুটপাটের একটা দেশের অবস্থা যখন নাজুক হয়ে পড়ে, তখন সেই দেশের মেধাবীরা যখন উন্নত বিভিন্ন দেশে চলে যান, দেশ তখন অসীম এক শূন্যতায় দিকে এগিয়ে যায়। এরপরও যদি সেই দেশ থেকে অন্য দেশে অর্থপাচার হয়ে যায়, একটি দেশের আর কী অবশিষ্ট থাকে! আমাদের

এতো সুন্দর অপার সম্ভাবনাময় একটি দেশ সর্বদিক দিয়ে ক্রমাগত অবক্ষয়ের কারণে বর্তমানে হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

অর্থপাচার নিয়ে কিছু কথা বলার আছে। কারণ একটি দেশের মূল শক্তিই হলো অর্থনীতি। মেরুদণ্ডস্বরূপ সেই অর্থনীতির অবকাঠামো যদি ভেঙে যায়, নিজেদের অর্থনীতি যদি অন্য দেশের রাজকোষে জমাকৃত হয়, তখন তো বিরাট এক আশঙ্কা স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়। ইতিহাস থেকে জানি, বর্গিরা বাণিজ্যের নামে অর্থ সম্পদ লুটপাট করে অর্থ পাচার করে দিতো। কোনো দেশকে উপনিবেশ বানিয়ে সে দেশের অর্থ ও সম্পদ নিজ দেশে প্রেরণ করতো। ঔপনিবেশিক দেশকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে নিজের দেশকে সম্পদশালী ও সমৃদ্ধ করাই ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির মূল কাজ। যেমন গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেনসহ বিভিন্ন শক্তি অতীতে এদেশে এসে শাসনকার্য ও বাণিজ্যের অজুহাতে ভারত তথা বাংলাকে শোষণ করেছে। এখন এদেশেরই একশ্রেণির মানুষ–বিশেষ করে দেশপ্রেম বিবর্জিত ও মূল্যবোধহীন রাজনীতিক, লুটেরা আমলা ও অসৎ শিল্পোদ্যোক্তারা অপকৌশলে রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করে বা ক্ষমতার ছত্রছায়ায় থেকে সীমাহীন লুটপাট ও দুর্নীতির মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে তা নিরাপত্তার রক্ষার জন্য বিদেশে পাচার করছে। এটা কয়েক দশক ধরে ঊর্ধ্বগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশ-বিরোধী শক্তি হিসেবে এসব দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিক ও অর্থশালীরা বাংলাদেশের জন্য দস্যুপ্রবৃত্তির এক ভয়ঙ্কর অপশক্তি। একটি জরিপ সূত্র অনুযায়ী, অর্থ পাচারের কারণে বছরে আনুমানিক ১.৫০%–২% প্রবৃদ্ধি কম হয়। এটা রোধ করা না গেলে এ দেশ ও জাতি দুঃখজনক এক পরিণতির শিকার হবে। তা অনুধাবন করে অসহায় বিবেকবান ও দেশপ্রেমিক নাগরিক সমাজ উদ্বিগ্ন। সাহসিকতার সঙ্গে এটা রোধ করার ব্যবস্থা এখনই নেওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশের অসৎ আমলা ও কিছু রাজনীতিবিদরা বিভিন্ন কায়দায় দেশের অর্থ, সম্পদ অন্য দেশে পাচার করেন। অন্যদিকে বিদেশিরাও বাংলাদেশ থেকে শত শত কোটি টাকা নিজ দেশে নিয়ে যাচ্ছেন। এর চেয়ে কয়েক গুণ বেশি অর্থ পাচার করেন বাংলাদেশিরা নিজেরাই। বাংলাদেশে বিদেশিদের নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে বিদেশিরা টাকা পাচার করলেও বাংলাদেশিরা পরিকল্পনা করে নৈতিকতা বিবর্জিত অবস্থায় পাচার করছে। প্রথমত যারা অবৈধ উপায়ে অর্জিত টাকা দেশে ভোগ করতে পারে না, তারাই বিভিন্ন দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করার নামে অর্থ পাচার করছে। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণেও বাংলাদেশিরা টাকা পাচার করছে। দেশের অধিকাংশ সচেতন ও ধনী নাগরিকরা মনে করেন, বাংলাদেশ তাঁদের ছেলে-মেয়েদের জন্য নিরাপদ নয়। তাদের ধারণা, দেশে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ তৈরি করা সম্ভব

নয়। ফলে এ ধরনের ব্যবসায়ী, উচ্চ পর্যায়ের আমলা, সচেতন নাগরিকরা তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা ও উন্নত জীবন বলতে বাইরের উন্নত দেশগুলোকেই বোঝে। সে কারণে তাঁদের ছেলেমেয়েদের বিদেশে পাঠিয়ে দেয় এবং সেখানে টাকা পাঠানো অতি স্বাভাবিক ব্যাপার মনে করে। দেশপ্রেমহীনতা দুর্দান্ত এক চিত্র। এই গরিব-মেহনতি মানুষের শ্রমের টাকায় পড়ালেখা শিখে রাজনীতিক-সচিব-ব্যবসায়ী হয়ে নিজেদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ এদেশে দেখেন না। কিন্তু এদেশের টাকায় সন্তানদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করেন। অকৃতজ্ঞতা ও বেঈমানিরও একটা সীমা থাকে। এখানে সেই সীমাটাও নেই।

দুঃখজনক ব্যাপার হলো সত্তরের দশক থেকে বড় বড় আমলা ও নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত রাজনৈতিক নেতারা অর্থপাচারের এই সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। বাংলাদেশের ব্যবসায়ী, আমলা, রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই বিভিন্ন দেশে অর্থ পাচারের মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে এসব খবর এখন আর খুব বেশি গোপন থাকে না। অর্থপাচারের মাধ্যমে রাজনীতিক, সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন দেশে বাড়ি করেছেন। সেসব দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানও করেছেন। ব্যাপারটি ভয়াবহ–আঁতকে ওঠার মতো ঘটনা। এসব বিনিয়োগ যদি নিজের দেশে হতো, ভাবা যায় বাংলাদেশের উন্নয়ন কতগুণ বেড়ে যেতো। বাংলাদেশ থেকে অবৈধ উপায়ে লাগামহীনভাবে অর্থ পাচার করে কানাডায় একটি পাড়া গড়ে উঠেছে, যেখানে পাচারকারীদের বেগম সাহেবারা সপরিবারে থাকেন তাঁদের বেশির ভাগ পরিবারের কর্তা অবৈধ উপায়ে বাংলাদেশ থেকে অর্থ উপার্জন ও সরকারি টাকা লোপাট করে কানাডাসহ অন্যান্য দেশে পাচার করেছেন। কানাডায় এখন বাংলাদেশিদের এমন পাড়া অসংখ্য। অস্ট্রেলিয়ায়ও বাংলাদেশ থেকে টাকা পাচারকারীরা অবৈধ পথে টাকা পাচার করে অনেকে নিরাপদ আশ্রয় গড়ে তুলেছেন। কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশ থেকে অবৈধ পথে টাকা পাচার হওয়া ছাড়াও আরও কিছু দেশে অর্থ পাচার হয়। মালয়েশিয়া, দুবাই, সিঙ্গাপুর, সুইস ব্যাংক (সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংক) অন্যতম। কয়েকদিন আগে পত্রিকায় দেখলাম, শুধু ২০২০ সালে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার ২৯১ কোটি টাকা। দেশের প্রায় সব পত্রিকাই সংবাদটি গুরুত্বের সঙ্গে ছেপেছে। এই পরিমাণ অর্থ কমপক্ষে দেশের ১২টি বেসরকারি ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের সমান। এই অর্থ দিয়ে দেশে চারটি পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব। এই অর্থের একটি বড় অংশই বেআইনি পথে এসব ব্যাংকে পাচার হয়েছে এবং তা আয় হয়েছে দুর্নীতির মাধ্যমে। ২০২০ সালে অর্থ পাচারে বাংলাদেশের নাম বিশ্বের প্রথম ৩০টি দেশের তালিকায় রয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে বছরে কত টাকা অবৈধভাবে পাচার হয় তার সঠিক হিসাব পাওয়া কঠিন। তবে ওয়াশিংটনভিত্তিক গ্লোবাল ফিন্যানশিয়াল ইন্টেগ্রিটি (জিএফআই) নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সূত্র মতে, প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে ৭.৫৩ বিলিয়ন ডলার বিদেশে অবৈধভাবে পাচার হয়, যা টাকার পরিমাণে ৬৪০ কোটি। দুর্নীতির মাধ্যমে এই অর্থপাচার বন্ধ করতে পারলে বাংলাদেশের গড় প্রবৃদ্ধি কমপক্ষে ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেত। ২০১৬ সালে পানামা পেপারসে অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের সংগঠন আইসিজেএস সারা বিশ্বের অর্থপাচারকারীদের একটি তালিকা প্রকাশ করে। এই তালিকায় ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক দলের সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তাদের নাম ছিল। জিআইএফের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে যে পরিমাণের অর্থ কালো পথে বিদেশে পাচার হয়, তা বাংলাদেশের মোট গড় উৎপাদনের প্রায় ২৫ শতাংশ। (তথ্যসূত্র: দৈনিক কালের কণ্ঠ, আবদুল মান্নান, এ যুগের বেগমপাড়া, ৩০ জুন, ২০২১)

কানাডায় যারা টাকা পাচার করে বিলাসী বাড়ি বানিয়েছেন বা ক্রয় করেছেন, তাঁদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ সরকারি অসৎ কর্মচারী। তাঁদের কেউ অবসরপ্রাপ্ত আবার কেউ কর্মরত। কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, দুবাইয়ে যাদের নির্ধারিত অর্থ আছে, তারা সেসব দেশে কোনো ঝুটঝামেলা ছাড়া সম্পত্তি ক্রয় করে নাগরিকত্ব পেতে পারেন। এসব দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি সেই সুযোগই গ্রহণ করে। কয়েক বছর আগে শুধু মালয়েশিয়ায় তিন হাজার বাংলাদেশির বাড়ি কেনার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এদের অধিকাংশই অসৎ রাজনীতিবিদ, দুর্নীতিবাজ আমলা, ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎকারী ব্যবসায়ী। তবে অনেকে বৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জন করে ব্যবসায়িক স্বার্থে বিদেশে বাড়ি কিনেছেন, তাদের কথা ভিন্ন।

বিদেশে টাকা পাচার করার আরও কিছু কারণ আছে। অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশের পুঁজি বিনিয়োগ নিরাপদ নয়। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। নিজেদের জমানো পুঁজি বিদেশে পাচার করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। এতে দেশে কাঙ্ক্ষিত পুঁজি বিনিয়োগ হয় না। পুঁজি বিনিয়োগ না হলে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের বা শিল্পের উন্নতি সম্ভব নয়। আর তা যদি না হয়, তাহলে দেশের বেকারের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। এমনিতে করোনার সময় বহু মানুষ বেকার হয়েছে। সামনে এটা আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। এভাবে চলতে থাকলে নিকট ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। এ পরিস্থিতিতে মূল্যবোধ সম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিলুপ্তি ঘটে যেতে পারে। আর এটা যদি ঘটে তাহলে দেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের যে ব্যাপারটি রয়েছে, তাও অতলে হারিয়ে যেতে পারে। দেশপ্রেম তখন আক্ষরিক শব্দে পরিণত হবে। দুর্নীতির পাগলা হাওয়ায় আমাদের ভবিষ্যৎ যে কোথায় গিয়ে আছড়ে পড়বে, তা ভেবে আতঙ্কিত হই।

আমাদের দেশে আরেক শ্রেণির লুটেরা আছে, যারা ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণের অর্থ ঋণ নিয়ে তা ফেরত না দিয়ে সিঙ্গাপুর, মালেশিয়া, কানাডায় অট্টালিকা ক্রয় করে বহাল তবিয়তে বাস করেন। বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অসৎ ব্যবসায়ী-রা আমদানি রপ্তানিতে ওভার ইনভয়েসিং, আন্ডার ইনভয়েসিং করেও দেশের অর্থসম্পদ পাচার করছেন। সব ধরনের খাদ্যে বিষ মেশানো হচ্ছে অধিক মুনাফার লোভে। চিকিৎসার নামে ডাকাতি চলছে। মৃত মানুষকে লাইফ সাপোর্টে রেখে বাণিজ্য চলছে। দেশের এমন একটি খাত নেই, যেখানে দুর্নীতি ভয়াবহতা নেই। এই যে মেধা পাচার হয়ে যাচ্ছে, এই যে অর্থ পাচার হয়ে যাচ্ছে–এর পেছনে দুর্নীতি, নিরাপত্তাহীনতা, নিরাপদ ভবিষ্যৎহীনতা–এসবও কম দায়ী নয়। মেধাবীদের যোগ্য মূল্যায়ন ও সম্মান এদেশে না থাকায় হতাশায় অনিশ্চয়তায় বিদেশে চলে যাচ্ছে মেধা ও অর্থ। এটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। রক্তের ওপর যে দেশ প্রতিষ্ঠিত, রক্তের বিনিময়ে যে দেশের স্বাধীনতা অর্জিত, সেই দেশের এমন ভয়াবহ চিত্র কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। অথচ এটিই বর্তমানে বাস্তব হয়ে উঠেছে। পরাধীনকালে ভিনদেশি ভিন জাতি শোষণ-শাসন-লুটপাট করেছে, এখন নিজেরাই করছে। এর থেকে প্রতিকার কী? মুক্তির উপায় কী? এর থেকে বের হয়ে না আসতে পারলে, এর থেকে মুক্তি না ঘটলে, আমাদের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার, বাঙালির অভিযাত্রা যে ক্ষীণকায় পরিণত হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দেশ ও মাটি নিয়ে মমত্ববোধ জাগানোর জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা দরকার। কঠিন ও কার্যকরি আইন প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বাণিজ্যের আড়ালে অর্থ পাচার রোধে বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করতে পারে। এই টাস্ক ফোর্স কঠোর নজরদারি করলে অর্থপাচার বহুলাংশে কমে যাবে। তবে অবৈধভাবে বসবাসকারী বিদেশি যারা কাজ করছেন, তাদের চিহ্নিত করে যারা উন্নয়ন প্রকল্পের, তাদের ওয়ার্ক পারমিটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, আর যারা প্রকল্পের বাইরে ব্যক্তিস্বার্থে কাজ করছেন তাদের চিহ্নিত করে দেশ থেকে বের করে দিতে হবে। তাহলে এই অর্থসম্পদ পাচার অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

মূল্যবোধহীন এক সমাজ তর তর করে বেড়ে উঠছে। যে কারণে মাতৃভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতি, সংগীত, শিল্পকলার প্রতি ঔদাসীন্য ও অশ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটছে। বাংলাদেশ ও বাঙালির জন্য এই আত্মধ্বংসী প্রবণতা রোধ জরুরিভাবে সময়ের দাবি হয়ে পড়েছে। সত্যিকারার্থে আমাদের ঘুরে দাঁড়ানো ছাড়া বিকল্প নেই। নীতিনির্ধারক, রাজনীতিক, সুশীল সমাজের কর্তাব্যক্তিরা যত দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, ততই আমরা নিশ্চিত হতে পারবো, নচেৎ আমাদের ইতিহাসের অতলগহ্বরে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

যে রক্ত ও চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশ, সেই দেশে যে সম্ভাবনার অপার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, পুনর্গঠন পর্যায়ের সেই দেশেও আসলো এক প্রতিবিপ্লবী আঘাত। একটা সময়ে গণতন্ত্র বিবর্জিত সামরিক শাসন, পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্রের অভিযাত্রা শুধু নামে, বাস্তবে চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সীমাহীন লুটপাটে পথভ্রষ্ট দিকহারা এক দেশ। যে দেশে দেশপ্রেম, নীতি-নৈতিকতা বর্তমানে ভুলুণ্ঠিত। উদ্দেশ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তার পথে বাঙালি অন্ধকারে পথ হাঁটছে। দেশত্যাগ সর্বক্ষেত্রে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর সময়ও দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। তারপরও ঘুরে দাঁড়াতেই হবে। তা নাহলে বাংলা বাংলাদেশ বাঙালির অস্তিত্ব যে সংকটের মুখে, তা গ্রাস করে ফেলবে। একদিন বাঙালির হাজার বছরের গর্বিত পরিচয় অতল অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। আমরা কি ক্রমশ সেই অন্ধকারের দিকে দ্রুত গতিতে হাঁটছি না? এই প্রশ্নের উত্তর নিজেদের বিবেকের কাছেই আছে বলে আমার দৃঢ় ধারণা।

হাজার বছর ধরে বিভিন্ন জাতি এই দেশে এসেছে, শাসন করেছে, বাণিজ্য করেছে, বিয়ে করে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছে। ফলে আমাদের রক্তে বিভিন্ন জাতির রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে। যে কারণে এক রৈখিক এবং একই বর্ণ ও আদর্শের ভিত্তি নির্মিত হয়নি। অবয়ব থেকে চারিত্রিক–সব কিছুতেই ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। এই মিশ্রণ গত এক শত বছরে সেভাবে আর ঘটেনি। ফলে আদর্শিক ও চারিত্র্যিক গুণাবলীর একটা নিজস্ব ভিত্তি এই সময়কালের মধ্যে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। নিজস্বধারায় বিকাশে এগিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়কালের মধ্যে জাতির জীবনে নতুন এক রোগ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে–তা হলো সর্বক্ষেত্রে সীমাহীন দুর্নীতি ও বিদেশপ্রীতি। এটা ধারাবাহিকভাবে ক্রমশ বেপরোয়াভাবে হয়ে উঠেছে। এ অবস্থা থেকে বাঙালিকে ফিরতে হবে–নিজস্ব দায়বোধে–দেশপ্রেমে–আত্মমর্যাদায়। এই ঘুরে দাঁড়ানো ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। বহু দেশ বহু জাতি এভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে– এরকম অনেক উদাহরণ নিকট অতীতেই রয়েছে। তাহলে আমরা কেন পারবো না?

আমি বাঙালি–এটা আমার পরিচয়–এটা আমার গর্ব–এটা আমার শক্তিমত্তা। বাঙালিমাত্রেই এই সত্যের ধারক–সেটা বিশ্বাসে রাখতে চাই। বিশ্বাস করতে চাই সব ধরণের অবক্ষয়ের পতন ঘটিয়ে দেশপ্রেমে–মূল্যবোধে–নৈতিকতায় দেশের মাটি ও মানুষের উন্নয়ন বাঙালির ধ্যান-জ্ঞানে পরিণত হবে। আর তার জন্য প্রয়োজন বাংলা যে অন্তিম যাত্রার দিকে ধাবিত হয়েছে, তা যেকোনো মূল্যেই রোধ করা প্রয়োজন। তা না হলে দেশপ্রেমহীন জাতিসত্তাহীন এক অস্তিত্ব হয়ে বাঙালি সত্তার কঙ্কালসার যে অবয়ব পৃথিবীতে অবস্থান করবে, তা ক্রমশ বিভিন্ন জাতিসত্তার ভেতর একসময় যেমন বিলুপ্ত

হয়ে যাবে, আর এই দেশে যেভাবে অবজ্ঞা ও অবহেলার শিকার হচ্ছে, এর ভবিষ্যৎ ভয়াবহ রকমের খারাপ হবে। যা আমরা গত কয়েক দশক ধরে অনুধাবন করছি। অবক্ষয়ের অতলে, দুর্নীতির রাহুগ্রাসে, স্বার্থের উন্মত্ততায়, নষ্টের সীমাহীনতায় বহু জাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে, আমাদের যাত্রাও সেদিকেই প্রবলভাবে ধাবিত হয়েছে। যাকে অন্তিম যাত্রার সঙ্গে তুল্য ভাবতে পারি। যদি তা রোধ না হয়, যদি দেশপ্রেম বাঙালির সত্ত্বায় জাগ্রত না হয়, যদি বিদেশ-বিভুঁই আরাধ্যতায় অদম্য হয়ে ওঠে, হাজার বছরের বাঙালির যে অস্তিত্ব–বিকাশমানধারা–সভ্যতা–ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি তা এক ভগ্নস্তূপের গল্প হয়ে থাকবে ইতিহাসের বিবর্ণ পাতায়। সেখানে বাঙালি অকৃতজ্ঞ এক জাতি হিসেবে চিহ্নিত হবে– যারা তার নিজের দেশকে ভালোবাসেনি, নিজের রক্তে কেনা মাতৃভাষাকে ভালোবাসেনি–নিজের দেশের বীর সন্তানদের আত্মত্যাগী বীর-রক্তকে সম্মান ও শ্রদ্ধায় ধারণ করেনি। নিজেদের হীনস্বার্থে নিজের দেশকে লুটতরাজ করেছে, নিজের দেশের উর্বর বুকে মৃত্যুর পেরেক ঠুকেছে। এই জঘন্য ইতিহাসের দিকে বাঙালির যে অন্তিম অভিযাত্রা ঘটেছে, তা বন্ধ করতে হবে।

বাঙালি পারবে–অন্তিমযাত্রামুখী না হয়ে–অবক্ষয়ের অতল থেকে উঠে এসে– জীবনমুখী হয়ে ফিরে দাঁড়াবে। কারণ আমাদের বাঁচতে হবে।

সহায়ক গ্রন্থ

১ অখিলেশ্বর ভট্টাচার্য, মোদের গরব মোদের আশা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৫।
২. অজয় রায়, বাংলা ও বাঙালী, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৭।
৩. অজয় রায়, শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত) বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৫।
৪. অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক), মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি, কলকাতা, কে পি বাগচি, ১৯৯২।
৫. অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর, প্যাপিরাস সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯১।
৬. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৬০।
৭. আনিসুজ্জামান, আঠারো শতকের বাংলা গদ্য, ঢাকা: চট্টগ্রাম: বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সমিতি, ১৯৮২।
৮. আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮।
৯. –, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮।
১০. আবু ইউসুফ মো. আবদুল্লাহ, ভারত ও বাংলা ভাগ, নর্দান ইউনিভার্সিটি পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০২১।
১১. আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৬।
১২. আবুল মোমেন, বাংলা ও বাঙালির কথা, সাহিত্য প্রকাশ, তৃতীয় প্রকাশ, ২০০০।
১৩. আহমদ শরীফ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১।
১৪. –, বাঙলা বাঙালি বাঙলাদেশ, মহাকাল, ঢাকা। তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৭।
১৫. আশরাফ আলী, উনিশ শতকে জন্ম নেয়া শ্রেষ্ঠ বাঙালি বিজ্ঞানীদের জীবনী, কলি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯।

১৬. এ কে এম শাহনাওয়াজ, ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), প্রতীক, ঢাকা, ২০১৬।
১৭. কঙ্কর সিংহ, ১৯৪৭'র বাংলাভাগ অনিবার্য ছিল, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২।
১৮. কৃষ্ণা বসু, হারানো ঠিকানা, ১৯৩০–১৯৫৫, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৩।
১৯. ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলার সাধনা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৫৪।
২০. গোলাম মুরশিদ, কালান্তরে বাংলা গদ্য: ঔপনিবেশিক আমলে বাংলা গদ্যের রূপান্তর, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯২।
২১. হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, অবসর, ঢাকা একাদশ মুদ্রণ, ২০১৯।
২২. গোলাম হুসেন সলীম, বাংলার ইতিহাস, সোপান পাবলিশার, কলকাতা, ২০১১।
২৩. জয়া চ্যাটার্জী, বাঙলা ভাগ হল, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৩।
২৪. জ্যোতির্ময় বসু, সাতচল্লিশের দেশভাগ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫।
২৫. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, বাঙালীর আত্মপরিচয়, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৯।
২৬. তথাগত রায়, যা ছিল আমার দেশ: হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানের পূর্ব বাংলা ত্যাগের কারণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।
২৭. নীরদ চৌধুরী, আত্মঘাতী বাঙালি, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৯।
২৮. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০১।
২৯. নূরুল ইসলাম মনজুর, বাঙালির ইতিহাস চর্চার ধারা, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৭।
৩০. পবিত্র সরকার, ভাষা দেশ কাল, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৯৯।
৩১. –, আমাদের সুভাষচন্দ্র, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫।
৩২. পৃথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯০।
৩৩. ফজলুল আলম, সংস্কৃতির স্বরূপ ও বাঙালি মনন, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৯।
৩৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রচনাবলী (২য় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ষষ্ঠদশ মুদ্রণ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।
৩৫. বদরুদ্দীন উমর, বাংলা ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (তৃতীয় খণ্ড)।
৩৬. বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, পাঠভবন, কলকাতা, ১৯৬৮।
৩৭. বিমলানন্দ শাসমল, ভারত কী করে ভাগ হলো, আদর্শলিপি, ঢাকা, ষষ্ঠ প্রকাশ, ২০২১।
৩৮. ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দেশবিভাগ: পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৩।
৩৯. মুনতাসির মামুন, (সম্পাদিত), উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র, ৫ খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪–১৯৯৩।
৪০. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত), আবহমান বাংলা, অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯।
৪১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত।
৪২. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, ভারত যখন স্বাধীন হলো, সুপ্রভাত, ঢাকা, ২০১৫।
৪৩. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, সংস্কৃতি কথা, নবযুগ প্রকশনী, ঢাকা দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৪।
৪৪. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, বাঙালির আত্মপরিচয়, বর্ণায়ন, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০২০।
৪৫. যশোবন্ত সিংহ, জিন্নাহ ভারত ভারত দেশ ভাগ স্বাধীনতা।
৪৬. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, বাঙালি কি আত্মঘাতী ও অন্যান্য রচনা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, কলকাতা, ২০০০।
৪৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, আত্মপরিচয় , প্রাচীন সাহিত্য, বাংলা ভাষা পরিচয়, সভ্যতার সংকট, সাহিত্যের স্বরূপ, ভারতবর্ষ।
৪৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, প্রথম খণ্ড, নবম সংস্করণ, ১৯৯৮।
৪৯. –, বাংলা দেশের ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৯৮।

এনইউবি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা
(Peer-Reviewed Journal)
ISSN : 2710-4451
বাংলা বিভাগ
নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: বাঙালির বহুমাত্রিক অর্জন

ড. মো. আব্দুল মতিন*

সার-সংক্ষেপ: বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাস ও ইতিহাসের প্রবহমান ধারায় মহান মুক্তিসংগ্রাম এবং একাত্তরের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। আমাদের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় মুক্তিসংগ্রাম, দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র লড়াই, ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তদান, দুই লাখ মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন–শুধু এই অঞ্চলের নয়, এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা তথা সমগ্র পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী, মুক্তিসংগ্রামী, নিপীড়িত জাতিসমূহের কাছে এক অনন্য মাইলফলক হিসেবে পরিগণিত হয়ে আছে। বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ শতকের এশীয় ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভাষাতাত্ত্বিক, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং সামগ্রিক জীবনধারায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বিবদমান বৈসাদৃশ্য ও বৈষম্য, সামরিক শাসনের কলাকৌশল, দমননীতি ও পাকিস্তানিদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিপরীতে পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের প্রতিরোধ ও গণআন্দোলনের ডাক দেন বঙ্গবন্ধু। রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসভায় ৭ই মার্চ ১৯৭১ বহুমাত্রিক নির্দেশনা সংবলিত যে ঐতিহাসিক ভাষণ বঙ্গবন্ধু প্রদান করেন, সেই ভাষণই ছিল মূলত বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। ঐতিহাসিক সেই ভাষণের ফলেই জাতিগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ প্রক্রিয়ার সুদীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি সারা বিশ্বের কাছে একটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও বাঙালির বহুমাত্রিক অর্জন নিয়ে আলোচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

১. F. Field Jocob Edited by, We shall Fight on the Beaches : The Speeches that Inspired History, Michael O'Mara Books Limited, London, 2013, p. 214.

'গণ সূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে' বাংলাদেশের স্বাধীনতার অমর কবিতা শুনিয়েছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের পড়ন্ত বিকেলের অপ্রতিরোধ্য বজ্রকণ্ঠ, দ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছিল ৫৬ হাজার বর্গমাইলজুড়ে। 'শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে' বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্ব-ইতিহাসে ও স্বাধীনতার ইতিহাসে এক অনন্য দলিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান অধুনা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঐতিহাসিক বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করে ১৮ মিনিটের যে ভাষণটি দিয়েছিলেন, তা অমোঘ তীক্ষ্ণতা, সাবলীল ভঙ্গি, বাহুল্যবর্জিত কিন্তু গভীরভাবে অন্তর ছুঁয়ে যাওয়া, বিস্ময়করও বটে। পূর্ববাংলার মানুষের বঞ্চনার ইতিহাস ও অধিকারহীনতার বিষয় এতে দীপ্র হয়ে উঠেছে এবং পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমেই বাঙালির সার্বিক মুক্তি সম্ভব-এ বক্তব্যই বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতাশৈলীর অতুলনীয় ভঙ্গিতে কখনো আবেগ, কখনো যুক্তি, কখনো প্রশ্ন বা ইচ্ছাকৃত পুনরুক্তির মাধ্যমে সোচ্চার করে তুলেছেন; কিংবা বিশেষ স্পর্শকাতর ক্ষেত্রে সংগত কারণেই কৌশলগত ভাষা বা ইঙ্গিতে শ্রোতাদের মনে গেঁথে দিয়েছেন।

ইতিহাসবিদ ড. জ্যাকব এফ. ফিল্ড (Jacob F. Field) সম্পাদিত এবং Michael O'Mara Books Limited প্রকাশনা কর্তৃক ২০১৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে `We shall Fight on the Beaches : The Speeches that Inspired History' শীর্ষক আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। গ্রন্থটিতে সংকলিত আড়াই হাজার বছরের ৪১টি ইতিহাস সৃষ্টিকারী ভাষণের একটি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যার শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'The Struggle This Time is the Struggle for Independence'. ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী ভাষণকে 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ইউনেস্কো 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' কর্মসূচির আওতায় আন্তর্জাতিক তালিকায় মোট ৭৮টি দলিলকে মনোনয়ন দেয়। এ তালিকায় ৪৮ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, বিশ্ব-ইতিহাসে যে কয়টি অসাধারণ বক্তৃতা আছে, ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ প্রায় দশ লাখ লোকের সামনে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণটি দিয়েছিলেন, তা তার অন্যতম, সম্ভবত শ্রেষ্ঠতম ভাষণ। জনগণের দাবির মুখে ৮ই মার্চ বেতার ও টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ প্রচার করা হয়। আর কোনো স্মরণীয় ভাষণের বক্তা এরকম একটি বিশাল জনসমুদ্রে তাৎক্ষণিক শব্দচয়নের মাধ্যমে এমন একটি মহাকাব্যিক ভাষণ দেননি। দু'হাজার বছর পূর্বে আলেকজান্ডারের

পিতা ফিলিপের হাতে যখন একে একে গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলোর পতন ঘটছিল, তখন ডেমোস্থেনিস নগররাষ্ট্রগুলোর নাগরিকদের উদ্দেশে এক কালজয়ী ভাষণ দিয়েছিলেন, যা আজও বিশ্ব-ইতিহাসে স্মরণীয়। যিশুখ্রিষ্টের জন্মের চার'শ বছর পূর্বে এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে ৩০ বছরব্যাপী পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধের এক পর্যায়ে এথেন্সের রাষ্ট্রনায়ক, গণতন্ত্রের পূজারি পেরিকিস যে মৃত্যুঞ্জয়ী ভাষণ দিয়েছিলেন তা আজও ইতিহাসকে আলোকিত করে। ইতিহাসখ্যাত ভাষণগুলোর মধ্যে আরও ছিল আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ বক্তৃতা, নেতাজী সুভাস বসুর বক্তৃতাসমূহ, মার্টিন লুথার কিং-এর ১৯৬৩ সালের আগস্টে 'আই হ্যাভ এ ড্রিম' শীর্ষক বক্তৃতা নিঃসন্দেহে অবিস্মরণীয়। তাঁদের মধ্যে আব্রাহাম লিঙ্কন, মার্টিন লুথার কিং এবং বঙ্গবন্ধু ঘাতকদের হাতে নিহত হয়েছেন, আত্মহত্যায় বাধ্য হয়েছেন ডেমোস্থেনিস, সুভাষ বসু নিরুদ্দেশ হয়েছেন এবং পেরিকিসের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। তবে তাঁদের কেউই এত বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেননি। ব্যতিক্রম কেবল বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর সমসাময়িককালে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বহু দেশেই চলছিল গণতান্ত্রিক ও মুক্তি আন্দোলন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অং সান সুচি (১৯১৪-৪৭), হো চি মিন (১৮৯২-১৯৬৯), আহমেদ সুকর্ণ (১৯০২-৭০), ইয়াসির আরাফাত (১৯২৯-২০০৪), কোয়ামে নক্রুমা (১৯০৫-৭১), জোমো কেনিয়াত্তা (১৮৯১-১৯৭৪), জামাল আবদুল নাসের (১৯১৮-৭০), জুলিয়াস নায়ারে, লিওপোল্ড সেড়ঘার, প্যাট্রিস লুমুম্বা, বেন বেল্লা, হুয়ারি বুমেদিন, ফিদেল ক্যাস্ট্রো, চে গুয়েভারা প্রমুখ। তবে তাঁদের কারও বক্তৃতায় যুদ্ধে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রেক্ষাপট, সাধারণ মানুষের বঞ্চনার এবং বৈষম্যের ইতিহাস বিধৃত করা হয়নি। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ভাষণে তাঁর অনুপুঙ্খ বিধৃত হয়েছিল প্রকাশ্য বিশাল জনসভায়, এমনকি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে। ষাটের দশকে তৃতীয় দুনিয়া যখন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে উত্তাল, পূর্ব বাংলায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারায় নিপীড়ন নির্যাতনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন মুক্তি আকুতির প্রতীক। পাকিস্তানি সামরিক জান্তার দমন-পীড়ন ও প্রতিরোধ সত্ত্বেও ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণ প্রদানের জন্য তিনি যখন সভামঞ্চে এসে দাঁড়ালেন তখন শোতৃমণ্ডলীর কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল আশু সংকটময়তা, গণতান্ত্রিক রায় পদদলনকারী পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠীর কবল থেকে মুক্তির ফয়সালা কী হবে তা জানার উদগ্র বাসনা। এক কঠিন সংকটময় মুহূর্তে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-ভয়-ত্রাস এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনায় উদ্বেল সাড়ে সাত কোটি মানুষকে মাত্র ১৮ মিনিটের এক জাদুকরী ভাষণে রাজনৈতিক চেতনার একটি উত্তুঙ্গ স্তরে এনে স্বাধীনতার জন্য মরণপণ অঙ্গীকারদীপ্ত মুক্তিসেনানীতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। এ যেন বিশ্ববাসীর কাছে এক অনন্যসাধারণ ভাষণ এবং চিরকালীন মাস্টারপিস হিসেবে সোনার

হরফে লেখা হয়ে গেলো। বঙ্গবন্ধুর একান্ত বিশ্বস্ত বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ বলেছেন, 'আগের দিন রাত ৪টা পর্যন্ত জেগে আমরা তাঁর জন্য ৭ই মার্চের ভাষণ ও তার ইংরেজি তরজমা করলাম। কিন্তু ভাষণ দেওয়ার সময় দেখা গেলো আমাদের প্রস্তুত করা খসড়া তাঁর সামনে নেই এবং যে ভাষণ দিলেন তার সঙ্গে আমাদের খসড়ার কোনো কোনো পয়েন্ট ছাড়া আর কোনো মিলই নেই। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে বলেছেন :

> "ভাইয়েরা আমার,
> আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তাঁর অধিকার চায়।...প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা : রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব– এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম-এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।" (সংক্ষেপিত)

বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত ৭ই মার্চের ভাষণে বাঙালির ক্রান্তিকালের সব নির্দেশনাই যেন লিপিবদ্ধ হয়েছিল। বাঙালি জনগোষ্ঠীর বঞ্চনার ধারাবাহিক করুণ ইতিহাস আছে, তা বর্ণনা করার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া আছে আবেগ, মুক্তিপাগল বাঙালির রক্ত ঝরানোর নির্মম স্মৃতি এবং তাদের গণতান্ত্রিক আশা-প্রত্যাশার ন্যায্যতা; আছে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সব মানুষের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ এবং যুক্তির জোরালো উপস্থিতি। এসব মিলে বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি মানবিক বোধের শ্রেষ্ঠত্ব, গণতান্ত্রিক চেতনার উজ্জ্বলতা এবং নিপীড়িত মানুষের স্বাধিকার অর্জন ও আর্থ-সামাজিক মুক্তির এক অনন্য দলিল হয়ে উঠেছে। এসব গুণের জন্য এই ভাষণটি শুধু বাঙালি নয়, গোটা বিশ্ববাসীকে 'বাংলাদেশ পরিস্থিতি'র প্রকৃত সত্য অনুধাবনে সহানুভূতিশীল করেছে। ভাষণটির গঠনশৈলী, কূটনৈতিক প্রজ্ঞা, ইতিহাস থেকে নেওয়া শিক্ষা, সময়জ্ঞান, শব্দচয়নে মুন্সিয়ানা রয়েছে। বাঙালিকে 'আমার দেশের গরিব-দুঃখী-নিরস্ত্র মানুষ', 'আমার মানুষ' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে 'মুক্তি' ও 'মুক্ত' শব্দ দুটি বেশি গুরুত্বে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি তাঁর ভাষণের চতুর্থ লাইনে বলেছেন, 'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়'; এবং অষ্টম লাইনে 'মুক্তি' শব্দটি এসেছে এভাবে, 'এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে'। আবার বলেছেন, 'যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে', এবং 'এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ'। তবে এই ঐতিহাসিক ভাষণের সারকথা

যে বাক্যটিতে উচ্চারিত হয়েছে তাতে 'মুক্তির' কথাটি সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলার স্বাধীনতা চাননি, বাঙালির মুক্তিও চেয়েছেন। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় ঘোষণা দেয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন, যা ছিল : 'You will see history made if the conspirators fail to come to their sense'. বঙ্গবন্ধুর সেই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ বছর শেষ না হতেই ফলে গিয়েছিল। অর্থাৎ বাঙালি জাতি ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যদিয়ে পৃথিবীর বুকে একটি নতুন রাষ্ট্রের মানচিত্র আঁকতে সক্ষম হয়। ফলে এই ভাষণ একই সঙ্গে কালজয়ী ও কালোত্তীর্ণ।

বাংলার মানুষের দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে 'আমার' শব্দটি বারবার ব্যবহার করেছেন। যেমন 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে', 'আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে', ভাইয়েরা আমার', আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে আমার দেশের গরিব, দুঃখী, নিরস্ত্র মানুষের মধ্যে'-'তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি', 'আমার গরিবের উপর', আমার বাংলার মানুষের', 'আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে', 'আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে', আমার মানুষ কষ্ট না করে', 'আমার লোককে হত্যা করা হয়' ইত্যাদি। বঙ্গবন্ধু ভাষণ শুরু করেছিলেন 'ভাইয়েরা আমার' বলে এবং শুরুতে বলেছিলেন 'আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন' এবং ভাষণের শেষাংশে তাঁর কম্যুনিকেট করার আত্মীয়তাসুলভ ভঙ্গিতে তিনি এমন স্তরে পৌঁছে গেছেন যে তাদের সহজেই 'তুমি' সম্বোধন করেছেন। এতে বিশাল জনতার সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়েছে এবং বক্তব্যের আবেদন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বক্তা এবং শ্রোতা একাত্ম হয়ে গেছেন। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধুর শিকড়সম্পৃক্ত বুলি ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'সাড়ে ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবা না।' তিনি এই ভাষণে যাচাইয়ের ভঙ্গিতে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। যেমন 'কী অন্যায় করেছিলাম? কী পেলাম আমরা?' এসব প্রশ্ন যেন বঞ্চনার অমোঘ উদাহরণকে তুলে ধরেছে। ভাষণে বঙ্গবন্ধুর যুক্তি দেওয়ার কৌশলটিও বেশ চমকপ্রদ- 'যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনও যদি সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।' বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূলনীতির সারবত্তা ব্যক্ত হয়েছে এই ভাষায় : 'এই বাংলার হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, নন-বেঙ্গলি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে, আমাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।' ইতিহাস, আবেগ ও রেটরিক্যাল ভঙ্গির আর একটি উদাহরণ : 'আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের

ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রঞ্জিত করার ইতিহাস।'

জনগণের প্রবল চাপ ও প্রত্যাশা ছিল বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চে স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কৌশলগত গণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার পথকে সুপ্রশস্ত করার ঘোষণা দেন। কারণ তিনি যদি 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম-এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এই বাক্যকে একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা বলে উল্লেখ করতেন তাহলে আন্তর্জাতিক আইন ও বিশ্বজনমত দুইই তাঁর বিপক্ষে চলে যেতো। মূলত তিনি রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা ও মেধাবী কৌশলবিদ হিসেবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েও তার কার্যকারিতা তিনি শর্তসাপেক্ষ করে রাখলেন। বঙ্গবন্ধুর ক্ষুরধার রাজনৈতিক কৌশলের কাছে পরাজিত হয়ে ইয়াহিয়া-ভুট্টোরা ক্রোধান্ধ বুনো শুয়োরের মত নিজেরাই ক্র্যাকডাউনে গিয়ে গণহত্যা শুরু করায় বঙ্গবন্ধুর আর কোন দায় রইল না বরং ২৬ মার্চ আপনাআপনি স্বাধীনতা কার্যকর হয়ে যায়। ২৬ মার্চ মধ্যরাতে তাঁর স্বাধীনতার নতুন ঘোষণাটি ছিল আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের দুটি দিক আমাদের সামনে দৃশ্যমান হয়-এক. আন্তর্জাতিক এবং দুই. লোকায়তিক মাত্রা। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ক্ষমতাবান সরকার ও বিশ্বসম্প্রদায় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিল। সব আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা ঢাকায় উপস্থিত থেকে ভাষণের বিবরণ প্রদান করেছিলেন। 'নিউজউইক' সাময়িকীর বিখ্যাত রিপোর্ট, যেখানে বঙ্গবন্ধুকে উল্লেখ করা হয়েছিল 'Poet of Politics' হিসেবে। ঢাকাস্থ মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাডের মনে হয়েছিল, তিনি লিখেছেন, 'রোববার ৭ই মার্চ প্রদত্ত মুজিবের ভাষণে তিনি যা বলেছিলেন তার চেয়ে লক্ষণীয় হলো তিনি কী বলেননি। কেউ কেউ আশঙ্কা করছিলেন, আবার কেউ কেউ আশা করেছিলেন যে, তিনি বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করবেন। কিন্তু তা না করে মুক্তি ও স্বাধীনতার লক্ষে শান্তি পূর্ণ অসহযোগ চালিয়ে যাওয়ার আহবান জানালেন।' ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু জাতীয় মুক্তির গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ভবিষ্যৎমুখী আন্তর্জাতিক মাত্রা ও গ্রহণযোগ্যতা জুগিয়েছিলেন উচ্চকণ্ঠে সংগ্রামের গণতান্ত্রিক অধিকার ও দাবি উত্থাপন করে। তিনি কথা বলেছিলেন কেবল বাংলার প্রতিনিধি হয়ে নয়, পাকিস্তানের ইতিহাসের ২৩ বছরে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে। তিনি বলেছিলেন, 'আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাঁকে (ইয়াহিয়া খানকে) অনুরোধ করলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না।' তিনি আরেকবার বলেছিলেন, 'আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই

তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।' অসাধারণ প্রজ্ঞার পরিচয় মেলে তাঁর এমনি ঘোষণায়, যার ফলে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম স্নায়ুযুদ্ধ-পীড়িত বিশ্বে কোন এক পক্ষের সংগ্রাম না হয়ে অর্জন করে সর্বজনীন সমর্থন, যে সমর্থনের বীজ নিহিত ছিল ৭ই মার্চের ভাষণে। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ যেন উন্নীত হয়েছিল ওরাকলের পর্যায়ে, তিনি হয়ে উঠেছিলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এবং এই অমোঘ বাণী দেশবাসীর অন্তরে যে অনুরণন তৈরি করেছিল সেই শক্তিতে অবিসংবাদিত জাতীয় নেতা থেকে শেখ মুজিবুর রহমান পরিণত হয়েছিলেন তৃতীয় বিশ্বের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের কাতারে সামিল আরেক অনন্য নেতায়। এই স্বীকৃতি বঙ্গবন্ধু পেয়েছিলেন আরো পরে, যখন ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি যোগ দিয়েছিলেন জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে এবং বরিত হয়েছিলেন হুয়ারি বুমেদিন, জুলিয়াস নায়ারে, লিওপোল্ড সেড়ঘার, ফিদেল ক্যাস্ট্রো, ইয়াসির আরাফাত প্রমুখ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ দ্বারা।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের লোকায়তিক দিকটিও ছিল অনন্য অভিধায় অভিষিক্ত। পূর্বের সব শিক্ষিত নাগরিকই ছিলেন ঔপনিবেশিক শিক্ষা-সংস্কৃতিতে প্রশিক্ষিত। ফলে বাঙালি জীবনরীতির কাছে প্রতিক্ষেত্রে তাঁরা হোঁচট খায়। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর জীবনকৃতি ও ৭ই মার্চের ভাষণ বিবেচনাকালে আমরা এটা লক্ষ করি বঙ্গবন্ধু ছিলেন একান্তভাবে জাতীয় ঐতিহ্য ও জীবন থেকে উঠে আসা মানুষ, তিনি শুধু ঔপনিবেশিক মানস-মুক্ত ছিলেন না, সৃষ্টি করেছিলেন আন্দোলনের জাতীয় রূপ এবং লোকায়ত জীবনধারা থেকে বক্তৃতার এমন এক ভাষারূপ নির্মাণ করেছিলেন, যা ছিল একান্তভাবে জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য-অনুগত, আর এর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছিল ৭ই মার্চের ভাষণে। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন ও মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ ও সত্যাগ্রহী আন্দোলনের সাথে সাযুয্যমান। চরম বর্বর ও স্বৈরতান্ত্রিক সামরিক শাসকগোষ্ঠীর মুখোমুখী বঙ্গবন্ধুর অসহযোগের আহবানে একদিকে ছিল শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধানের রূপরেখা, সামরিক আইন প্রত্যাহার করে অবিলম্বে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি, অন্যদিকে ছিল সর্বাত্মক অসহযোগের প্রস্তুতি। ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব।' সেই সঙ্গে প্রায় এক নিঃশ্বাসে তিনি আরো বলে উঠেছিলেন, 'তোমরা আমাদের ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাক, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।' ৭ই মার্চের ভাষণে প্রতিরোধ আন্দোলনের এই লোকায়ত রূপ মেলে ধরার পাশাপাশি প্রত্যাঘাতের ডাক এমন এক লোকভাষায় ব্যক্ত করলেন বঙ্গবন্ধু যে তিনি উন্নীত হলেন অনন্য এক লোকনায়কের ভূমিকায়, যার তুলনীয় নেতৃত্ব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কাফেলায় বিশেষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভাষণের প্রথম বাক্যটিও একান্ত ব্যক্তিগত ভঙ্গিতে বলা, যেন ঘনিষ্ঠজনের কাছে মনের নিবিড়তম অনুভূতির প্রকাশ, 'আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।'

এরপর তিনি বাংলার মানুষের আত্মদানের কথা বললেন, তাদের মুক্তি-আকুতির প্রকাশ ঘটালেন, তখন সেই অন্তরঙ্গ ভঙ্গি রূপ পেলো জনসভার ভাষণের, কিন্তু তারপরও হারালো না বিষয়ের সঙ্গে নিবিড় সম্পৃক্তি। তিনি বললেন, 'আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার তার অধিকার চায়।' তিনি আরও বললেন, 'শহীদের রক্তের ওপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগ দিতে পারে না', 'আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই', আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না', 'তোমাদের উপর আমার অনুরোধ রইল', 'আমি যদি হুকুম দেবার না পারি'–ইত্যকার উচ্চারণগুলির গ্রামীণ ও লোকজ প্রকাশভঙ্গি লক্ষণীয়। এই অনন্য সূচনা বেঁধে দিয়েছিল বক্তৃতার সুর, তিনি সত্যোচ্চারণ করলেন অন্তরের সবটুকু আকুতি ঢেলে এবং নিবিড় ভালবাসার বন্ধনে শ্রোতৃমণ্ডলীকে, যেন তাঁর রক্ত সম্পর্কের ভ্রাতৃপ্রতীম সবাই, একাত্ম করে তুললেন। গভীর প্রেমভাব উৎসারিত এই একাত্মতা নেতা ও জনতার মধ্যে আর কোনো ফারাক রাখলো না। ভাষণে যখনই তিনি মানুষের কথা বলেছেন সেখানে আর কোনো নৈর্ব্যক্তিকতার অবকাশ থাকেনি, এই মানুষেরা যে তাঁরই মানুষ, একান্ত আপনজন। বক্তৃতার শেষে বাংলার লোকায়ত ইসলামে সুফিতত্ত্বের প্রভাবে যে উপাসনা পদ্ধতি বিশেষ স্থান পেয়েছে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মিলনে যে ফানা ও পরম উপলব্ধি সঞ্চারিত হয়, যে নিবিড় সম্পৃক্তি-আকাঙ্ক্ষা লৌকিক ধর্মে আরো নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে তেমনিভাবে নেতা ও জনতা একীভূত হয়ে পড়েন যখন বঙ্গবন্ধু বললেন, 'মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।' ভাষণে শুধু সম্বোধনের রূপবদল নয়, ঘটে যায় সত্তার রূপান্তর। এখানেই ভাষণের লোকঐতিহ্যিক রূপকল্প অত্যন্ত পরিশীলিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

আবার এভাবেও ৭ই মার্চের ভাষণকে বিবৃত করা যায় : প্রথমত, বঙ্গবন্ধু ভাষণের প্রথম অংশে ইতিহাসের প্রেক্ষাপট আলোচনা করেছেন এবং বর্তমান সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সিদ্ধান্তটি ঘোষণা করেছেন। দ্বিতীয়ত, 'ভাইয়েরা আমার' সম্বোধনের পুনরাবৃত্তির মধ্যদিয়ে তিনি শাসকদের কিছু শর্ত ও জাতির জন্য কিছু সুচিন্তিত দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। শর্তগুলো স্মরণ করা যেতে পারে এভাবে :

১. সামরিক আইন মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে।
২. সামরিক বাহিনীর লোকদের ফেরৎ নিতে হবে।
৩. যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে।
৪. জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।
৫. এবং তারপরেই তাঁর দৃপ্ত ঘোষণা, 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমি এদেশের মানুষের অধিকার চাই।'

এ পর্যায়ে আমরা উপনীত হই ভাষণের সবচেয়ে দিকনির্দেশনা ও বৈপ্লবিক অংশে। আসে কয়েকটি নির্দেশ এবং সবশেষে একটি স্মারকসম্বলিত সংকল্প। যা নিম্নরূপ :

১. আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে বাংলাদেশে কোর্ট কাচারি, আদালত, ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। ....২৮ তারিখে গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।
২. আর যদি একটি গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।
৩. জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দেবার না পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে।
৪. আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে....যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন।
৫. সরকারি কর্মচারীদের বলি : আমি বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়া হল। কেউ দেবে না।
৬. এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-নন-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।
৭. যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয় কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।
৮. দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়না-পত্র নেবার পারে।
৯. যদি এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন।
১০. প্রত্যেক গ্রামে, পত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক।
১১. মনে রাখবা : রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব-এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য কেবল এর রাজনৈতিক বিবেচনার মধ্যদিয়ে বোঝা যাবে না। এটা ছিল স্বাধীনতার ডাক, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সর্বাধিক প্রতিরোধের আহবান এবং পূর্ণাঙ্গ বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ। এই ভাষণের পরতে পরতে মিশে আছে বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং সেই ইতিহাস বিনির্মাণে লোকসাধারণের সুদীর্ঘ সাধনা। প্রাকৃতজন হিসেবে বঙ্গবন্ধু বেড়ে উঠেছিলেন লোকায়ত জীবনের গভীরতায় স্নাত হয়ে। সেই সঙ্গে তিনি অর্জন করেছিলেন বিশ্বজনীন অভিজ্ঞতা। কলকাতা মহানগরীতে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের উষালগ্নে নেতাজীর আন্তর্জাতিকতাবাদী চিন্তা ও স্বাধীনতার প্রবল স্পৃহা দ্বারা তিনি আলোড়িত হয়েছিলেন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সস্নেহ সান্নিধ্য এবং আপন কর্মোদ্যোগ তাঁকে ভারতীয় রাজনীতির প্রধান

কুশীলবদের সঙ্গে পরিচিত করেছিল। পঞ্চাশের দশকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি-প্রকাশক কর্মসূচিতে তিনি অংশ নিয়েছিলেন, বিশেষভাবে জামাল আবদুল নাসের সুয়েজ খালের ওপর মিশরের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করলে ব্রিটেনের ন্যাক্কারজনক আক্রমণের মুখে পূর্ববাংলায় গড়ে ওঠা সংহতি আন্দোলনের তিনি ছিলেন তরুণ নেতা। পঞ্চাশের দশকে গণচীন সফর করে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন সমাজ রূপান্তরে মহাচীনের বিপ্লবী ও তার নেতাদের সঙ্গে। ১৯৫৭ সালে লিডারশিপ প্রোগ্রামে তিনি যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। তিনি জনজীবনের সঙ্গে কী নিবীড়ভাবে মিশতে পারতেন, কত সুগভীর ভালোবাসা নিয়ে প্রতিটি মানুষকে আলিঙ্গন করেছিলেন সেসব নিয়ে নানা গল্পকথা রয়েছে। তিনি যার সঙ্গে একবার পরিচিত হতেন তাকে কখনো বিস্মৃত হতেন না। এমনি জনসম্পৃক্তির মধ্যদিয়ে তিনি নিয়ত আহরণ করেছেন লোকায়ত উপাদান ও লোকজ্ঞান। আপন বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে লোকজ্ঞানের সংমিশ্রণ আর সেই সঙ্গে মানুষের জন্য অপার ভালোবাসা, যে মানুষ বলতে আর্ত দুঃখী নিপীড়িত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ও তাদের ব্যক্তিরূপই তাঁর কাছে মুখ্য, এসব মিলিয়েই শেখ মুজিব হয়ে উঠেছিলেন বঙ্গবন্ধু এবং ৭ই মার্চের ভাষণে সেই অনন্য জীবনবোধের প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন জাতির জনক।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের শেষ পঙ্‌ক্তিটিই ছিল তীব্র-তীক্ষ বর্শাফলক, ক্রমস্ফুটমান নাটকের কাইমেক্স, এতক্ষণ ধরে তিনি যেসব নির্দেশনা দিচ্ছিলেন তার লক্ষবিন্দু এবং সারাৎসার হলো : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম-এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' দুই পঙ্‌ক্তির এই অজর কবিতা ও অবিনাসী গান যেন বিষ্ণু দের কবিতার সেই 'সংহত গ্লেসিয়ার'। সামান্য আবেগের অতিরেক, একটি শব্দের স্থানচ্যুতি কিংবা সামান্যতম অতিশায়নে ভেঙে চুরমার হয়ে যেত গ্লেসিয়ার এবং অনিরুদ্ধ প্রবল জনরোষের সৃষ্টি করতে পারতো যাতে ঘোড়সওয়ারের হাতের লাগামটি হয়ে যেত ছিন্ন। যে জনতার জোয়ারকে তিনি নেতৃত্বের প্রখর লাগাম ধরে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন, ওই মুহূর্তে তা স্খলিত হলে ভেস্তে যেত সব। শত্রু তখন আক্রমণের সুযোগ সন্ধানী; সামান্যতম উসকানিতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ত নিরস্ত্র জনতার ওপর; পুনরাভিনীত হতো কয়েক সহস্র জালিয়ানওয়ালাবাগ। বঙ্গবন্ধু নিশ্চয়ই শিরা ও শোণিতের, অগ্নি ও তুষারের এক অবিশ্বাস্য সমীকরণের মহড়া দিয়ে রেখেছিলেন মনে মনে; না হলে জনসমুদ্রের স্বাধীনতার উদ্বেল আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছাত্রনেতাদের প্রবল চাপ, অন্যদিকে একপাক্ষিক স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত বিপদের আশঙ্কা এবং সর্বোপরি ইতিহাসের তুঙ্গতম মুহূর্তে পৌঁছার হিরণ্ময় সুযোগের হাতছানি, সবকিছুর মধ্যে একটি ফাইন ব্যালেন্স তিনি যেভাবে ঘটালেন তা এককথায় বিস্মিত ও শিহরিত করার

মতো ঘটনা। তিনি একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করে শত্রুকে সুযোগ দিলেন না, আবার একই সঙ্গে যা করলেন তা স্বাধীনতা ঘোষণারই অন্য নাম। যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ আসলে সশস্ত্র হওয়ার নির্দেশ, প্রাণপণ প্রতিরোধ ও সম্ভাব্য রক্তবন্যার ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা ও মুক্তির তীরে পৌঁছানোর নির্দেশ। 'নির্দেশ' কথাটির অর্থ হতে পারে দেশহীনতাও; সেই অর্থে নির্দেশ থেকে দেশে উত্তরণের যে পথ তারই মানচিত্র ও দিগদর্শন ৭ই মার্চের ভাষণ।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইতোমধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতা বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর দলের সঙ্গে আলোচনা করতে ১৫ মার্চ ঢাকায় আসেন। বিরতিসহ আলোচনা ২৫ মার্চ পর্যন্ত চলে। এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন এবং লাগাতার হরতাল চলছিল। মার্চের ২ তারিখ থেকে ছাত্র ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে থাকে এবং ধারা অব্যাহতভাবে চলে। এ পটভূমিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের নামে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে পৈশাচিক তাণ্ডব চালিয়ে ছাত্র-শিক্ষক এবং নিরীহ লোকদের গণহারে হত্যা করে। এভাবে পাকিস্তান দখলদার বাহিনী দীর্ঘ নয় মাস ধরে গণহত্যা চালিয়ে যায়। শেখ মুজিবকে ২৫ মার্চ রাতে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে আটক রাখা হয় এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও বিদ্রোহে উসকানি দেওয়ার অভিযোগে বিচারের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে তা সম্প্রচারের জন্য ইপিআর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে চট্টগ্রামে এক ওয়্যারলেস বার্তা পাঠান। তাঁর ঘোষণাটি নিম্নরূপ :

> 'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ হতে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আমার আহবান, আপনারা যে যেখানেই থাকুন এবং যার যা কিছু আছে তা দিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার বাহিনীকে প্রতিহত করুন। বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটি বিতাড়িত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের এ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।'

২৫ মার্চ পাকবাহিনীর হামলার পর থেকে যে স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয় তা মূলত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণেরই ফল। যদিও বঙ্গবন্ধু ওই সময় পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি ছিলেন তথাপি তাঁকে তাঁর অনুপস্থিতিতে মুজিবনগর সরকার নামে অভিহিত অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার জনপ্রতিনিধিরা ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল এ সরকার গঠন করে। তাঁকে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কও করা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের গোটা অধ্যায়ে শেখ মুজিবের অনন্য সাধারণ ভাবমূর্তি মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা এবং জাতীয় ঐক্য ও শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে এবং দীর্ঘ লড়াই

সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পৃথিবীর মানচিত্রে স্থায়ী আসন করে নেয়।

খুব সংক্ষিপ্ত ছিল ৭ই মার্চের ভাষণ; কিন্তু বক্তব্যের গভীরতায়, গুরুত্বে এবং ব্যাপকতায় এর সমতুল্য বক্তৃতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। আব্রাহাম লিঙ্কন গেটিসবার্গ বক্তৃতা দিয়েছেন মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে গণতন্ত্রের আদর্শে তাঁর বিশ্বাস ও ধারণা উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে। বেশ ভেবেচিন্তে অনেক সময় নিয়ে লেখা সেই বক্তৃতা। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চে যে বক্তৃতা দেন সেটি প্রায় তাৎক্ষণিক জনসভায় দাঁড়িয়ে অথবা তার ঠিক আগে ঠিক করতে হয়েছে কী বলবেন। তাঁর সময় ছিল না ভাবনা চিন্তার, তদুপরি ছিল অসম্ভব চাপ। এ সত্ত্বেও যে বক্তৃতাটি তিনি রেসকোর্সের জনসমুদ্রের সামনে দিয়েছিলেন সেটি অবিস্মরণীয়। আশা করি পৃথিবীতে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক বক্তৃতা হিসেবে এর মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে চিরকাল।

এনইউবি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা
(Peer-Reviewed Journal)
ISSN : 2710-4451
বাংলা বিভাগ
নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২২

আবুল হাসানের কবিতা: চোখের পাতায় লেগে থাকা হিরণ্ময় বেদনা

ড. নিতাই কুমার ঘোষ*

সার-সংক্ষেপ : আবুল হাসানের কাব্য পরিসর স্বল্প কিন্তু কবিতার বিষয় বিচিত্র। সময়কে আশ্রয় করে কবিতার উপরিতলে অপ্রাপ্তি, দুঃখবোধ, হতাশার চিত্র আঁকলেও এর মর্মমূলে রয়েছে নষ্টপ্রায় সমাজের বিনির্মাণ ভাবনা। আত্মযন্ত্রণায় কাতর কবিকে নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করতে দেখি তাঁর কবিতায়। তিনি ফিরে পেতে চান আরাধ্য– সমাজ, রাজনীতি, মানুষ, গ্রাম, প্রীতি, পরিবার ও প্রকৃতি। এই সব যাপিত জীবন উপকরণের সমন্বয়ে হিরণ্ময় সময়। যে কারণে তিনি সামগ্রিক হিরণ্ময়তার প্রত্যাশায় নীলকণ্ঠ হয়ে বেদনা ধারণ করেন। তাঁর কবিতার আলোকে কবি-হৃদয়ের স্বরূপ পাঠ ও শিল্পিত সমাজ নির্দেশনা নির্ণয় এ প্রবন্ধের অন্বীষ্ট।

শেষ ষাটের কবি আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫)। তিনি স্বল্পায়ু ক্ষণজন্মা। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলো– *রাজা যায় রাজা আসে* (১৯৭২), *যে তুমি হরণ করো* (১৯৭৪), *আমার প্রেম আমার প্রতিনিধি*[১] (১৯৭৪), *আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা* (১৯৮৫) *পৃথক পালঙ্ক* (১৯৭৫) এবং বিভাস প্রকাশনী প্রকাশ করেছে *আবুল হাসানের অপ্রকাশিত কবিতা* (২০১৬)। বিভাস প্রকাশনী কর্তৃক 'কয়েক বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে মেঘের আকাশ আলোর সূর্য নামে তার প্রথম দিকের কবিতার সংকলন। এটি ছিল কবির সহপাঠী ও ভাষাবিদ শেহাবউদ্দীন আহমদের কাছে।'[২] 'হাসানের বোহেমিয়ানিজম ছিলো অন্তর্গত'। ফলে তাঁর বন্ধু-বান্ধব-স্বজনের কাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত কবিতার যে সন্ধান ক্রমশ পাওয়া যাচ্ছে, তার সংখ্যাও নেহায়েত কম হবে বলে মনে হয় না। এ যাবৎ প্রকাশিত কবিতার মধ্যে তিনি সৃষ্টিশীলতার স্বাতন্ত্র্য-স্বাক্ষর যথেষ্টই রাখতে পেরেছেন বলে মনে করি। এ সত্য বাংলা কবিতার ইতিহাসে প্রগাঢ় গর্বের। বাংলা সাহিত্যসহ বিশ্ব সাহিত্যের যে কজন কবি স্বল্পায়ু হয়েও সৃষ্টিতে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিলেন আবুল হাসান তাঁদের মধ্যে একজন। শুরুতে তিনি আবুল হোসেন নামে লিখতেন। 'বোধহয় সেটাই ছিল তাঁর পিতৃদত্ত নাম।'[৩] তাঁর কবিতায় অবক্ষয়িত সমাজ ও রাজনীতি প্রধানত জায়গা করে নিয়েছে। আর এসবের প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি হারানো প্রেম, স্বাপ্নিক স্বদেশের বিবর্ণ রূপ ও রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন এবং তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমিত্বের আধারে উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে ইতিপ্রত্যাশী অভীপ্সার নেতিবাচক প্রকাশ প্রায় সব ক্ষেত্রেই বেদনা ও হাহাকারে পরিপূর্ণ। ফলত কবি তাঁর ব্যক্তিক ও সামষ্টিক দুঃখ আর হৃদয়ের ক্ষতকে প্রসব করেন কবিতায়। সরলীকৃত বিচারে তিনি দুঃখবিলাসী কবি হিসেবে পরিচিতি পেতে থাকেন। যেহেতু দুঃখ-বেদনা মানবজীবনের অধিকাংশ সময়ব্যাপী লালিত অনিবার্য এক সত্য, তাই কবিতায় দুঃখ-হতাশা থাকা দোষের নয় বরং স্বাভাবিক। তবে জীবনের এই অনিবার্য সত্যকে কে কতখানি শৈল্পিক রূপ দিতে পারেন সেটিই বিবেচ্য। এদিক থেকে বিচার করলে দেখি আবুল হাসান যাপিত জীবনের অতি সাধারণ ঘটনা ও এবং ব্যবহারিক জীবনের অতি তুচ্ছ উপকরণকেও কবিতায় স্বতন্ত্র মর্যাদায় উপস্থাপন করেছেন। ফলে তিনি কবিতায় সঠিক স্থানে সঠিক শব্দ ব্যবহারের দক্ষতা প্রকাশে সহজেই উতরে যান। অতি সাধারণ ঘটনাও প্রকাশ গুণে অসাধারণ হয়ে ওঠে। উপরন্তু তার বিশেষত্ব দেশ-প্রেম বিষয়ক কবিতা সৃষ্টিতে। দুঃখিনী আর অসহায় মায়ের বেদনা কাব্যব্যঞ্জনায় একাকার হয়ে যায় বলেই তিনি প্রথম কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রে লেখেন "আমার মা/ আমার মাতৃভূমির মতোই অসহায়।" সমাজ কাঠামোর চিরায়ত নিয়ম অনুযায়ী সমাজে দুই প্রধান শ্রেণির বাস। এক শোষিত আর এক শোষক। একের সংখ্যাধিক্য আর অন্যের ক্ষমতাধিক্য। এই দুই বিপরীতমুখীর সহাবস্থানে নিয়তই সমাজে অশান্তি বিরাজ করে। শোষিতের অন্তর্বেদনার বহিঃপ্রকাশ তাই হয়ে ওঠে সকাশ-আন্দোলন অথবা শিল্প আন্দোলন। এই শোষিতেরা নিজেদের আত্মতুষ্টি করার প্রয়াসে অথবা নিতান্তই বেঁচে থাকার প্রয়োজনে গোষ্ঠীবদ্ধ বা দলবদ্ধ হয়। তারা দমন পীড়ন সহ্য করতে চায় কিন্তু পরাধীন হতে চায় না। এসব বাস্তবতা আপামর মানুষকেও ভাবায় আর ক্রমে প্রতিবাদমুখী করে তোলে। এ রকম ভাবনার প্রকাশ আবুল হাসানের কবিতায় শিল্পরূপ পেয়েছে। তাঁর কবিতায় রাজনীতি এসেছে বিশ্ব পরিক্রমাকে সঙ্গী করে। বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রভাব, স্বাধীনতা-পূর্ব পাকিস্তানের উত্তাল অবস্থা, এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাঙালির লালিত চেতনা, যা কিনা মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছে

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

মানুষকে; সমূহভগ্নপ্রায় বাংলায় বেঁচে থাকার প্রেরণা দিয়েছে যেসব স্মৃতি;– স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর সেসবের মূলে কুঠারাঘাত, অপূরণীয় প্রত্যাশা, রাজনীতির নোংরামিসহ নানাবিধ আঘাত মর্মাহত করেছে আবুল হাসানকে। এই বহুবিধ কাব্যবিষয় ও অনুষঙ্গ তাঁর কবিতার বিষয়। কিংবা বলা যায় 'নারী, প্রেম, প্রকৃতি, দুঃখ, যন্ত্রণা, দাহ, কোনো কিছুই নয়, আবার সব কিছুই তাঁর কবিতার, একমাত্র কবিতার উপাদান হয়ে উঠেছে।'[৪] তবে অনুষঙ্গ যাই থাক অন্তরালে বেদনার ধারা বয়ে চলেছে অবিরাম ধারায়:

এই অধিনায়কেরা কী চায়? কেবলি ক্লান্তি! কেবলি কনিষ্ঠ তরবারী?
কেবলি করুণ প্রেম?
কেবলি নারীর নষ্ট শরীরের ঘ্রাণ?
কিন্তু আমি তরবারীর সঠিক স্বভাব আজো বুঝতে পারিনি,
আমি সমাজের সঠিক শব্দার্থ আজো খুঁজে পাইনি কোনো শ্লোকে;
মানবিক ভালোবাসা, নারীর নির্জন হাত কাকে বলে এখনো জানিনা!
আমি সমুদ্রের কাছে গিয়ে পুনর্বার সমাজের কাছে ফিরে এসেছি!
রমণীর কাছে গিয়ে পুনর্বার প্রশ্নাতীত আঁাধারের কাছে ফিরে এসেছি তমসা,

আমি আলোর ভিতরে শুধু ধ্বংস, হাড় হৃৎপিণ্ড, রোদনের স্রোত দেখে
এসেছি তোমার কাছে ফিরে ফিরে হে পাবক, অগ্নিশিখা হে তামস![৫]

রাজনীতি ও সমাজ সচেতন কবি শাসকের ভয়ে রাজনীতিবিদ, শিল্পী, কবি, সবাইকে বদলে যেতে দেখে ব্যথিত হয়েছেন। এমনকি বাঙালি তার নিজের সংস্কৃতি বদলাতেও বাধ্য হচ্ছে– কবি পরিবর্তন করছে তাঁর কবিতার শব্দ। ব্যবহারিক জীবনেরও মানুষের শব্দ ব্যবহারে প্রচলিত ধরন পাল্টে যাচ্ছে। সমান্তরালে রবীন্দ্র সংগীত শুনতে রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ। চারদিকের মানুষ আর পরিবেশ দেখে আবুল হাসান ব্যথিত হচ্ছেন তিনি ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় প্রতিবাদ করছেন– 'কিছুটা বদলাতে হবে বাঁশী/ কিছুটা বদলাতে হবে সুর/.. বদলে দাও, তুমি বদলাও/ নইলে এখুনি/ ঢুকে পড়বে পাঁচজন বদমাস খুনী,/ যখোন যেখানে পাবে/ মেরে রেখে যাবে,/ তোমার সংসার, বাঁশী, আঘাটার নাও।/ বদলে যাও, বদলে যাও, কিছুটা বদলাও!'[৬] তিনি বলেছেন বদলে যাওয়ার কথা, তাছাড়া বেঁচে থাকাটাই যেন কঠিন হয়ে যায়। কবি লক্ষ করছেন শিল্প তার নিজস্ব ও নিরপেক্ষ জায়গায় দাঁড়াতে পারেনি, 'শিল্প এখন সুবিধাবাদ!'। তাও এখন সুবিধাবাদিদের হাতে হারিয়েছে তার স্বকীয়তা। রাজনৈতিক অবস্থা কবিকে ও সমাজের মানুষগুলোকে কোনোভাবেই শান্তি দেয় না। জীবনের ও সম্পর্কের সামগ্রিক রাজনীতিকরণ জীবনের সৌন্দর্যকে হরণ করেছে। এইসব অরাজকতা দেখে হরণকারীদের লক্ষ করে কবি তীব্র শব্দবাণ নিক্ষেপ করেছেন।

দালান উঠেছে তাও রাজনীতি, দালান ভাঙছে তাও রাজনীতি,
দেবদারু কেটে নিচ্ছে নরোম কুঠার তাও রাজনীতি,
গোলাপ ফুটছে তাও রাজনীতি, গোলাপ ঝরছে তাও রাজনীতি!
মানুষ জন্মাচ্ছে তাও রাজনীতি, মানুষ মরছে তাও রাজনীতি!
... তরুণেরা অধঃপাতে যাচ্ছে তাও রাজনীতি...
আমি পকেটে দুর্ভিক্ষ নিয়ে একা একা অভাবের রক্তের রাস্তায় ঘুরছি
জীবনের অস্তিত্বে ক্ষুধায় মরছি রাজনীতি, তাও রাজনীতি আর

বেদনার বিষবাষ্পে জর্জরিত এখন সবার চতুর্দিকে খাঁ, খাঁ, খল,
তীব্র এক বেদেনীর শাপ খেলা দেখছি আমি, রাজনীতির তাও কি
রাজনীতি?[৭]

প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী দৌরাত্ম্য সামূহিক ক্ষয়-ক্ষতি বৃদ্ধি করে। আধিপত্য বিস্তারই যেখানে প্রধান লক্ষ্য, মানবিকতার সেখানে স্থান নেই। প্রাক্কালের ভূমি দখলের প্রক্রিয়াকে ছাপিয়ে বাজার ও প্রযুক্তি দখলকেন্দ্রিক সাম্রাজ্যবাদ আরও বেশি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। তারা প্রযুক্তিগত উন্নতিকে সব কল্যাণের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করে অনাহারী মানুষকে নিয়ে, বিবস্ত্র মানুষকে নিয়ে রাজনীতি করছে। মরীচিকা ছোঁয়ার প্রত্যাশা জাগিয়ে ঢেকে দিয়েছে নিপীড়িত মানুষের চিৎকার। রাজনীতির ভয়াল রূপ তাই কবিকে করেছে আহত। রাজনৈতিকে ব্যবহার করে শান্তি রক্ষার নামে চলে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের প্রয়াস। মানবিকতা রক্ষায় নয়, কেবল কাগজে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় স্বার্থান্বেষীর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য। রাজনৈতিক সংগঠন ও নেতাদের চরিত্রও আদর্শগত জায়গাগুলোতে স্থির নয়; তাই প্রশ্নবিদ্ধ সত্যসন্ধানী মানুষের বিবেক। উপরন্তু রাজনীতি যেহেতু সবকিছুকে প্রভাবিত করেছে তাই শিল্পকলা, মতবাদ সব সুবিধাবাদীর হস্তগত। ফলে অনিশ্চিত আর ভয়াবহ ভবিষ্যতের চিত্র আভাসিত হয় কবিকল্পনায়; ঝরে পড়ে হাহাকার:

আমি কার কাছে যাবো? কোনদিকে যাবো?
অধঃপতনের ধুম সবদিকে, সভ্যতার সেয়ানা গুণ্ডার মতো
মতবাদ; রাজনীতি, শিল্পকলা শ্বাস ফেলছে এদিকে ওদিকে,
শহরের সবদিকে সাজানো রয়েছে শুধু শাণিত দুর্দিন, বন্যা অবরোধ
আহত বাতাস!
আমি কার কাছে যাবো? কোনদিকে যাবো?...
... পিপাসার রক্তসাগরমাখা সমস্যার
সাম্রাজ্যে এখানে বুঝি বাজে না সানাইয়ের সুর?
বসে না উদার তাবু? লাল নীল কার্ণিভাল, আসে না ময়ূর?
এখানে কেবলি ক্ষুধা, মহামারী, মৃত্যুভয়[৮]

কবির এই হাহাকার আরও প্রলম্বিত হয়েছে "জন্ম মৃত্যু জীবনযাপন" নামক কবিতায়। কবির যে সংশয়– তিনি কোথায় যাবেন? এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন এ কবিতায়। প্রকৃত পক্ষে হতাশার শেষ প্রান্তে এসে কবি মৃত্যুতেই আশ্রয় দেখতে পাচ্ছেন। এই প্রতীতি তার বাস্তবতা দর্শনজনিত। তিনি দেখছেন, যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠি অশান্তির হোতা, মুখোশ পড়ে তারাই শান্তি কামনা করছে। ফলে শান্তি প্রত্যাশা প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। আসলে ক্ষয়সম্ভূত নিয়ামক ক্ষয়ের মধ্যেই শান্তি প্রত্যাশা করে। আর আপাত পৃথিবীর চোখে তারা সদর্থক ও শান্তির বার্তাবাহক বনে যায়। জাতিসংঘ এমন একটি সংগঠন যা নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গঠিত হলেও প্রকৃত পক্ষে নিয়ামক শক্তির প্রভাবে তা লক্ষ্যপূরণ করতে পারেনি। মানবতার শেষ আশ্রয় বলে খ্যাত এই প্রতিষ্ঠান নিয়ে কবির আক্ষেপ:

> মৃত্যু আমাকে নেবে, জাতিসংঘ আমাকে নেবে না,
> আমি তাই নিরপেক্ষ মানুষের কাছে, কবিদের সুধী সমাবেশে
> আমার মৃত্যুর আগে বোলে যেতে চাই,
> সুধীবৃন্দ ক্ষান্ত হোন, গোলাপ ফুলের মত শান্ত হোন কী লাভ যুদ্ধ কোরে?
> শত্রুতায় কী লাভ বলুন?
> আধিপত্যে এত লোভ? পত্রিকা তো কেবলি আপনাদের
> ক্ষয়ক্ষতি, ধ্বংস আর বিনাশের সংবাদে ভরপুর...[৯]

আপাত যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ শেষ হয় না। শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়নি সমাজে; প্রতিষ্ঠিত হয়নি মানুষের মৌলিক অধিকার, বোধের জায়গাগুলো হয়নি শানিত। স্বাধীনতায় একটি ভূখণ্ড পাওয়া গেছে; কিন্তু স্বাধীনতাপূর্ব স্বপেন্ন সফলতা আসেনি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে– অন্ধকারেই থেকে গেছে স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা আর ইতিবাচক জীবনবোধ। রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদলে নোংরামি পরিবর্তিত হয়নি। তা যেন থেকে গেছে 'নতুন বোতলে পুরাতন মদের স্বরূপে। কবি স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পাচ্ছেন এবং সর্বজ্ঞ হয়ে যেন বলছেন তিনি জানতেন এ সমাজে যুদ্ধ থামে না, শান্তি নামে না, কারণ যুদ্ধ অন্তহীন। তাই যতই প্রয়াস হয় তা হয় ব্যর্থ।

ব্যক্তি সময়ের সন্তান; সময়ই তৈরি করে ব্যক্তিমানস। তাই কালবাস্তবতায় এর চিন্তার পরিবর্তন ঘটে। তবে এই চিন্তা পরিবর্তনের সূত্র অন্বেষণ সচেতন মানুষ তথা কবিদের জিজ্ঞাসু করে তোলে। তাঁরা খুঁজে ফেরে এর মূল, যখন উত্তর পায় তখন দৃঢ় হয়। তাঁরা ভাবে মানুষ অন্য মানুষকে কতটা নিচে নামায়, কতটা হেয় করে। আবুল হাসানের কবিতায়ও অনেক বড় একটা জায়গাজুড়ে বিস্তার করেছে মানুষের অবমাননার চিত্র। সেইসঙ্গে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উপস্থাপন, অতীত রোমন্থন, নৈতিকতা বিবর্জিত ও

হতাশাগ্রস্ত সময় জায়গা করে নিয়েছে তাঁর কবিতায়। তিনি যেন দগ্ধ হয়ে গেছেন সময়ের প্রভাবে। তাই তার কবিতাগুলোতে এর স্পষ্ট এবং দুর্দমনীয় প্রভাব। সময়ের অনিবার্য নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতা কবিকে সময়ের সাথে কোনোভাবেই একাত্ম হতে দেয়। 'পরিবার বিচ্ছিন্ন উন্মূলিত যাপিত-যৌবন আবুল হাসানের চেতনায় জন্ম দিয়েছে সীমাহীন নিঃসঙ্গতা। একাকিত্বের দুঃসহ যন্ত্রণার শিল্প-ভাষ্যই আবুল হাসানের কবিতা।'[১০] তিনি সামাজিক কুপ্রথার অনুকরণীয় এক বোধহীন প্রাণী বলে নিজেকে মনে করছেন; যার কোনো নিজস্বতা নেই। ফলে অনিবার্যভাবেই তিনি সর্বদা নিঃসঙ্গ ও একাকিত্ব বোধে বেঁচে আছেন নিজেরই সত্তার কাছে অচেনা স্বরূপে:

> অবশেষে জেনেছি মানুষ একা!
>
> জেনেছি মানুষ তার চিবুকের কাছেও ভীষণ অচেনা ও একা!
> দৃশ্যের বিপরীত সে পারে না একাত্ম হতে এই পৃথিবীর সাথে কোনোদিন।
> ... ...
> সবার গোচরহীন আছি অজো সুদূর সন্ধানী!
> দূরে বসে প্রবাহের অন্তর্গত আমি, তাই নিজেরই অচেনা নিজে
> কেবল দিব্যতাদুষ্ট শোণিতের ভারা ভারা স্বপ্ন বোঝাই মাঠে দেখি,
> সেখানেও বসে আছে বৃক্ষের মতোন একা একজন লোক,
> যাকে ঘিরে বিশজন দেবদূত গাইছে কেবলি
> শতজীবনের শত কুহেলী ও কুয়াশার গান![১১]

'পাখি হয়ে যায় প্রাণ' কবিতাটি অতীতচারী। নষ্টালজিক এ কবিতায় ফেলে আসা জীবনের শুভ সময়ের বন্দনা করা হয়েছে। কবিসত্তা পাখি হয়ে অতীতে চলে যায়, যেখানে শৈশব আছে, পরিবার-পরিজন আছে, আছে গ্রাম্য প্রকৃতির সৌন্দর্য। নিঃসঙ্গ মানুষ শান্তি অন্বেষণে অতীতে ফিরে যায়। শুভ স্মৃতিতে শান্তি সন্ধান মানুষের স্বভাবজাত। খুঁজে ফেরে তার সঙ্গী, যাপিত জীবনের বাঁকে। আধুনিক জীবনের নিঃসঙ্গতা মানুষকে বিচ্ছিন্ন করেছে, সে চাইলেও আর গোষ্ঠীবদ্ধ হতে পারছে না। ফলে নিজের দিকে তাকিয়ে নিঃসঙ্গতা খুঁজে পাওয়া মানুষ অন্যের চোখে দেখে অবিশ্বাস, ঘৃণা। এই অবিশ্বাস কালসৃষ্ট। সমাজের অসঙ্গতি প্রথমে মানুষকে আত্মিক ভাবে বিচ্ছিন্ন করে। এরপর সে ক্রমশ গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং সর্বত্র নিজেকে বেমানান মনে হয় এবং তাঁর মধ্যে জন্ম হয় বেদনাবোধের ।

> কথা ছিল তিনদিন বাদেই আমরা পিকনিকে যাবো,
> ... ...
> নতুন নির্মিত একটি সাঁকোর সামনে দেখলুম তীরতীর কোরছে জল,
> আমাদের সবার মুখ সেখানে প্রতিফলিত হলো,
> হঠাৎ জলের নীচে পরস্পর আমরা দেখলুম

আমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অপরিসীম ঘৃণা ও বিদ্বেষ।
আমরা হঠাৎ কী রকম অসহায় আর একা হয়ে গেলাম![১২]

সময় ও সমাজ অখণ্ড স্রোতের ক্রমপ্রবাহ। যা অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে নিজস্ব গতিতে ধাবিত হয়। এই স্রোতের অবিচ্ছিন্ন ঘূর্ণিবদলে তাল মিলাতে পারে না সবাই। ফলে বিরুদ্ধ স্রোতের মানুষকে প্রতিঘাত সহ্য করতে হয় নিয়ত; অন্তরে সৃষ্টি হয় বেদনাবোধের। আবুল হাসান তাঁর কবিতায় যে স্রোতটি ধরেছেন অথবা প্রভাবিত হয়েছেন তা ষাটের দশকের, আবার ষাটের দশককেই একেবারে নির্দিষ্ট করে বলাও চলে না। কারণ কবিতা কোনো তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার ফসল নয়। একজন কবি তথা কবিতাকে হয়ে ওঠার জন্য অপেক্ষা করতে হয় অতীতকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত। অবশ্য সেখানে ভবিষ্যৎ কালের বার্তাও লুকায়িত থাকে। ফলে কবিতাকে বলা যায়, ত্রিকালের মিলনক্ষেত্র অথবা ত্রিকালব্যাপ্ত শিল্প প্রতিমা। ষাটের কবিদের বৈশিষ্ট্যে সময় চেতনার প্রকাশ দৃশ্যত মুখ্য। কারণ এসময়ে বাংলা ভূখণ্ডে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহ কবি-শিল্পীরা কোনোভাবেই এড়িয়ে যেতে পারেননি। বাঙালি কবির ব্যক্তিচিন্তা গঠনের ক্ষেত্রেও পঞ্চাশ থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত সময়পর্ব কবিচিত্তে বিশেষ অভিঘাত সৃষ্টি করেছে। আবুল হাসানও এই বাস্তবতারই মধ্যপর্বের কবি। ফলে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ পরবর্তী সময় বিশেষত ১৯৫২এর ভাষা আন্দোলন, আইয়ুব খানের সামরিক শাসন এবং এর মধ্যে সংঘটিত ১৯৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০এর নির্বাচন এবং তৎপরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বাধীনতা পরবর্তী অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া, সব মিলিয়ে সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা কবিহৃদয়কে দগ্ধ করেছে-আহত করেছে। অতীতে ফিরে কবি অনুধান করছেন পাকিস্তান জন্মের বাস্তবতা এবং বর্তমানে অবস্থান করে প্রত্যক্ষ করছেন বাংলাদেশের চিত্র। ফলে ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি শঙ্কিত। সেইসঙ্গে ভাবছেন বৈশ্বিক রাজনৈতিক বাস্তবতা– সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে কীভাবে পদানত হচ্ছে বিশ্বের দেশসমূহ। ফলে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে কৃত্রিমতা প্রকাশ করছে। এই বীভৎসতা কবিমনে সৃষ্টি করেছে ক্ষতের।

দৃশ্য মধ্যে অহরহ পরস্পরকে খুঁজে আবার কেথায় হই প্রতিধ্বনিত
আমার নিজ কণ্ঠস্বরে অন্য কাউকে ডেকে ফিরছি, ছেঁড়া চক্ষু ভাঙা গলা
দেখে যাচ্ছি, শুনে যাচ্ছি, একই বৃত্তে পরস্পরকে একই সঙ্গে এক আসরে
অথচ দ্যাখো আমরা কেউ চিনিনা কাউকে ব্যক্তিগত পোশাক পরলে!
... ...
ভাঙা বয়স, ভাঙা আয়না, গ্রীবা রেখায় ধূলো জমছে একই বৃত্তে একই সঙ্গে
দেখে যাচ্ছি সত্য বলি সবাই কেমন আত্মগ্রস্ত ঃ শবযাত্রীও বোলতে পারো,

এখন আমরা কেউই কাউকে চিনতে চাই না; স্বজন বন্ধু অন্নদাত্রী,
আমরা কেউই চিনিনা কাউকে ব্যক্তিগত পোশাক পরলে![১৩]

যন্ত্রযুগের উপহার এই 'ব্যক্তিগত পোশাক' এর প্রভাবে মানুষ তার অন্তর্গত উপলব্ধি হারিয়ে বোধহীন প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। যার কাছে সামনের মেকি আলোকচ্ছটাই সত্য। আত্মপ্রচারই দেশপ্রেম-মানবপ্রেম প্রকাশের নিয়ামক। কবির উপলব্ধি বাহ্যিক চাকচিক্যেই মানুষ যেহেতু মশগুল, মৌলিক সত্যের অবস্থান ক্রম-ক্ষীয়মাণ; তাই তিনি হতাশাগ্রস্ত ও ব্যথিত। তিনি উপলব্ধি করছেন কোথাও একটা কিছু নষ্ট নিয়ামক কাজ করছে; তাই তাঁর কাছে চাঁদের উপস্থিতিকেও ডাইনির মতো মনে হয়। এবং তিনি সামষ্টিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান–'রিলিফের কাপড়ে আমি মানুষের অধ্বঃপতন ঢাকতে পারবো না।' মানুষের তথা 'জীবনের এই সমগ্রতাবোধ আবুল হাসানের মৌলিকত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের প্রাণবিন্দু।'[১৪] যে কারণে তাঁর সংবেদনশীল মনে বেদনার প্রকাশ অধিকাংশ কবিতায়।

একটা কিছু মারাত্মক ঘটছে কেথাও
নইলে ডাইনির মতোন কেন কোমর বাঁকানো
একটি চাঁদ উঠবে জ্যোৎস্নায়
... ...
সবদিকে
কেন এত রক্তপাত হবে? গুপ্তহত্যা হবে?
কেন জীবনের দ্রব্যমূল্য বাড়বে এত শনৈঃ শনৈঃ
... ...
একটা কিছু মারাত্মক ঘটছে কেথাও
নইলে কিশোর চেনেনা কেন ঘাস ফুল? ঘাস কেন সবুজের বদলে হলুদ?

একটা কিছু মারাত্মক ঘটছে কেথাও
নইলে নয়টি অমল হাঁস
থেঁতলে যায় ট্রাকের চাকায়?
ভালোবাসা, কেবলি...কেবল একটি
বাজেয়াপ্ত শব্দের তালিকা হয়?
একটা কিছু মারাত্মক ঘটেছে কেথাও
নইলে মানুষের দরজায় টোকা দিলে কেন আজ দরোজা খোলে না?[১৫]

তবে এ কথার অন্তরালে প্রগাঢ় ভালোবাসারও প্রকাশ ঘটেছে; যেখানে কবি সমগ্র জাতিকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে চান। আত্মকথনের মধ্য দিয়ে কবি সময়কে তুলে ধরেছেন। সময়েই তৈরি করেছে অকৃতজ্ঞ মানসিকতা। কিন্তু কবিসত্তা এমন সময় পাড়ি দিতে চায়, অবক্ষয়ের মধ্যেও হতে চান আশাবাদী। কখনো আবার দুঃখকে সময়ের স্বাভাবিক অনুষঙ্গ বলে মেনে নিয়ে দুঃখকে সুখময় করে তোলার কথা বলেছেল। দুঃখকে

জীবনের মৌলসত্য হিসেবে মেনে নিয়ে সুখকেই বলেছেন অসার। 'এ প্রজ্জ্বলনের পথ জাগতিক সকল প্রাণীর শুভপ্রেরণায়। কিন্তু সেটি উজ্জীবিত হওয়ার সরণী সমাজ-বিধৃত অভাব, দুঃখ, বেদনা, গ্লানির ভেতর দিয়ে। কবি দুঃখ-বেদনারও কাব্যময় প্রসিদ্ধি নির্মাণ করেন।'[১৬] তবে অস্তিত্ব রক্ষাই যেখানে মুখ্য সেখানে কবি দুঃখকে ফাঁকি দিয়ে সুখী হওয়ার ভান করেন।

আমিও গ্রহণ করে দেখেছি দুঃখকে
দেখেছি দুঃখের জ্বালা যতদূর না যেতে পারে
তারও চেয়ে বহুদূরে যায় যারা সুখী!
দেখেছি দুঃখের চেয়ে সুখ আরো বেশী, দুঃখময়![১৭]

ব্যক্তি-চেতনা না থাকলে একটি সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন যাপন সম্ভব নয়। কিন্তু সময় এতটাই প্রতিকুল ও অস্থিরতাময় যে সেখানে স্বভাবিকতা অদৃশ্য। তাই ভালোবাসার কবিতা লিখতে চাইলেও কবি তা লিখতে পারেন না। শূন্যতা ঘেরা আগ্রাসী সময়ে প্রেমের কবিতা সৃষ্টি হয় না। কবি তাই সময়কে দেখেন শিলীভূত।

ইঁদুরের তবু পালাবার পথ রয়েছে গর্ত
আমাদের তাও নেই হে ময়ূর মনে করে নিও
... ...
পালাবার পথে পাথুরে গুহায়
খণ্ড পাথর স্পর্শ করেছি, স্পর্শ করেছি
আর কিছু নয়, আর কিছু নয়,
এর চেয়ে বেশি আর কিছু নয়।[১৮]

কবি পালানোর পথের সন্ধান করলেও পলায়ন কোনো সমাধান নয়। কেননা সমাজ বহির্ভূত হয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। সামাজিক রীতি-প্রথা ব্যক্তির চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে সাধারণ মানুষের জীবন ধারণ আর কবি-শিল্পীদের জীবন বিকাশস্বরূপ এক নয়। 'মর্ত্যে যা সচরাচর ঘটে না তা-ই হয়তো কবির জীবন সত্য।[১৯] তারা সমাজের কথা বলতে গিয়ে সামাজিক রীতি-প্রথা দ্বারা অবস্থাভেদে উল্লসিত ও ব্যথিত হন। সাধারণ মানুষের চেয়ে তাদের হৃদয়ে অনুরণন অপেক্ষাকৃত দ্রুত হয়। ফলে তাদের সাহিত্যকর্মে সমাজের ক্ষুদ্র ও অস্পষ্ট অনুষঙ্গগুলোও প্রগাঢ় ও স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। তারা সভ্যতার ধারাক্রম সার্বিকভাবে দর্শন করেন। তাই সমসাময়িক সমাজ অথবা যাপিত জীবনের সমাজকে অখণ্ড ধারায় মিলিয়ে দেখেন। সাধারণের চোখে যা অভ্যস্ত জীবন, কবি ও শিল্পির দৃষ্টিতে তা অনিবার্যতা। আবুল হাসানের কবিতায় সমাজ উঠে এসেছে সার্বিকভাবে। তবে বিশেষ কবির কবিতায় বিশেষ কোন বিষয়ের মুখ্য প্রকাশ থাকে। এ দিক থেকে বলা যায় আবুল হাসানের কবিতায় রাজনীতিসৃষ্ট দুঃখময় জীবনের

চিত্রই প্রধানত ফুটে উঠেছে। যদিও 'আবুল হাসানের কবিতায় রাজনীতি নেই; কিন্তু থাকে দুর্মর ঘৃণার আশ্লেষে জড়ানো নির্বিকার ক্ষোভ। আর ক্ষোভের বিকল্প হিসেবে নিজের অন্তর্গত চেতনালোকে নির্বাসিত হন তিনি।'[২০] তাঁর কবিতায় ইতিবাচক সমাজের চেয়ে নেতিবাচক সমাজ দৃষ্টিই মুখ্যত প্রকাশ পেয়েছে, কারণ সমাজে সংঘটিত নেতিবাচক ঘটনাগুলো কবিহৃদয়ে বেদনাবোধের জন্ম দিয়েছে। তিনি প্রত্যক্ষ করছেন রাষ্ট্রীয় ভাবে ও সামাজিকভাবে ঘুষ, হত্যা, খুনকে অপ্রত্যক্ষ সমর্থন দেওয়া হচ্ছে; নৈতিকতা রক্ষার সৈনিকেরা হচ্ছে অবমূল্যায়িত।

মা বোলতেন বাবাকে তুমি এই সমস্ত লোক দ্যাখো না?
ঘুস খাচ্ছে, জমি কিনছে, শনৈঃ শনৈঃ উপরে উঠছে,
কত রকম ফন্দি আটছে কত রকম সুখে থাকছে,
তুমি এসব লোক দ্যাখোনা?[২১]

অনৈতিক কাজে সিদ্ধ সমাজ ব্যবস্থায় শিল্প ও শিল্পীরা উপেক্ষিত; কেননা শিল্পচর্চাই মানুষকে শুভবোধ সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে পারে। তাই 'রক্তমাখা দুঃখের সমাজ' বদলানোর স্বপ্ন দেখেন কবি। 'কিছুটা বদলাতে হবে বাঁশী/কিছুটা বদলাতে হবে সুর/সাতটি ছিদ্রের সূর্য, সময়ের গাঢ় অন্তঃপুর/কিছুটা বদলাতে হবে/মাটির কনুই, ভাঁজ/রক্তমাখা দুঃখের সমাজ কিছুটা বদলাতে হবে...'। কেননা কবি লক্ষ করছেন জৈবিকতার কাছে মানুষ পরাজিত হয়ে গেছে, সামাজিক দায়বোধ ম্লান হয়ে গেছে। সেইসঙ্গে প্রযুক্তিগত সুবিধাকে উন্নতির মাপকাঠি করতে গিয়ে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে মানবিকতা। তাই মানুষের চাঁদে যাওয়াকে উন্নতি বললেও নুলো ভিখারিরা রাত জেগে থাকে, পৃথিবীতে হানাহানি চলে। ফলে আয়েসি জীবন লাভেও মানুষ নিজেকে সুখী করতে পারে না; ভিতর থেকে বলতে পারে না ভালো আছি।

আমাদের জীবনের অর্ধেক সময়তো আমরা
সঙ্গমে আর সন্তান উৎপাদনে শেষ কোরে দিলাম,
সুধীবৃন্দ, তবু জীবনে কয়বার বলুন তো
আমরা আমাদের বোলতে পেরেছি,
ভালো আছি, খুব ভালো আছি?[২২]

কবির এই ভালো থাকার প্রত্যাশা পূরণে তিনি ঝিনুকের মতো। অন্তরে বিষের ভাণ্ড ধারণ করে সমাজের জন্য মুক্তা প্রসবে ব্যস্ত। আবুল হাসানের পূর্বজ পঞ্চাশের দশকের কবি আজীজুল হকের (১৯৩০-২০০১) *ঝিনুক মূহূর্ত সূর্যকে* (১৯৬৯) কাব্যগ্রন্থের কবিতায়ও এরূপ ঝিনুকস্বভাবী উজ্জয়নীশক্তি প্রকাশক রূপকের সন্ধান পাওয়া যায়। সেখানেও লক্ষ্য করা যায় কবি ঝিনুক আর সূর্যের সম্মীলিত শক্তির রূপকে মুক্তা প্রসবের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। কবির শুভ প্রত্যাশা যেমন চিরকালীন, তেমনি সাধারণ মানুষের বঞ্চনাও

চিরকালীন। লক্ষণীয়, প্রত্যেক কালের সকল কবির প্রত্যাশা ও কল্যাণকামী চিন্তার যোগসূত্র সাবলীলভাবে একই রকম। আর এসব কারণেই ব্যক্তি মনুষ্যত্বহীনতায় অনৈতিক কর্মকাণ্ড করলেও কবির কিছু এসে যায় না। সমাজের প্রচলিত বিষয়গুলোকে কবি উপেক্ষা করে চলেন। কবির কাছে অর্থনৈতিক উন্নতি বোধহীন স্তরের মানুষের জীবনমানের মাপকাঠি। কবি মনে করেন 'সমাজমাত্রই একটা মাথামোটা মানুষের হুলস্থূল প্রবাহ।' ফলে এসব সামাজিক ক্রিয়া কবিকে আলোড়িত করে না। 'কুহেলি মাঠের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে অবিনাশী জীবনের আলোক সম্ভাবনার ইঙ্গিতের সাথে সাথে জন্ম, মৃত্যু, ধ্বংস ও রক্তপাতের গভীর ট্রাজিডিকে ব্যক্ত করেন তিনি, দেবদূতের মতো।'[২৩] তিনি তার স্বভাববৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সমাজের কল্যাণচিন্তা ও মানবতার উদ্ধারণি প্রচেষ্টা করে চলেন।

ঝিনুক নীরবে সহো
ঝিনুক নীরবে সহো, ঝিনুক নীরবে সহে যাও
ভিতরে বিষের বালি, মুখ বুঁজে মুক্তা ফলাও![২৪]

নিজেকে নিঃশেষ করে মুক্তা ফলানোর এই প্রত্যাশা কবির জেনে বুঝে। 'সময় ও সভ্যতার যে সর্ববিস্তারী দুঃখী দহনের মধ্যে আবুল হাসান কবিতার ভূমিকে কর্ষণ করে গেছেন, তার ভিত্তি প্রোথিত ছিলো সমকাল ও সমাজের গভীরে।'[২৫] কারণ তিনি জানেন কল্যাণকামী মানুষদের আজন্ম পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জিত হতে হয়। কিন্তু পৃথিবী যতই প্রতিকুলে যাকনা কেন কবি বিশুদ্ধতার স্বপ্ন দেখেন। একটি শুদ্ধ বর্তমানের জন্য তিনি প্রার্থনা করেন- 'আমার মানসজাত অশ্রু তুমি পঙ্ক, আমাকে ধুইয়ে দিয়ে কোরে তোল/শুদ্ধ বর্তমান।' কিন্তু মেরুদণ্ডহীন সমাজ পুঁজিবাদী শোষকদের সুবিধাক্ষেত্র। সে ক্ষেত্রে যত মেরুদ-হীন মানুষ ততো তাদের সুবিধা। তারা মনে করে 'ক্রয়যোগ্য যদি তবে কিনে ফেলবো পি-তের মাথা-/দোয়াত, কলম ,কালি, ছাপাখানা, তথ্যাগার, তাবৎ দলিল,/আমার নকশায় ফুটবে ইতিহাস, ঘটনাপ্রবাহ!' কিন্তু ঠিক বিপরীতে কবির প্রত্যাশা ও বেদনা প্রকাশ পায় দ্বিবিধ ব্যঞ্জনায়।

সামান্য ডোবার জলে মহীরুহ, এমনকি নীলিমাও মাঝে মাঝে
দেখে তোর মুখ। সেই ভালো, আমিও না হয় পঙ্কে ডুবে শুদ্ধ করে নেবো
আমার এ পঙ্কজ হৃদয়।
এ সংসারে জন্মের প্রথম চিৎকার থেকেই পাপ পুণ্যের খেলা হয় শুরু
আর তাই...
পাপ পুণ্যের প্রশ্রয়ে
আমিও না হয়, রিলকের গোলাপের মতো শুধু এক বিন্দু অশ্রুর
আর্তনাদ রেখে

অস্থিপুঞ্জ পর্যন্ত নিজের উলঙ্গতা নিজেই মাড়িয়ে যাবো।
অশ্রুবিন্দু প্রস্তরিত সত্তার ভেতর বইবে ঝর্ণার মতো চিরকাল।[২৬]

প্রেম কবিতার অনিবার্য অনুষঙ্গগুলোর একটি। তা সে দেশপ্রেম বা নারীপ্রেম যাই হোক না কেন। তবে আবুল হাসানের নারী বিষয়ক ভাবনা অন্যান্য কবির চেয়ে একেবারেই আলাদা। তাঁর কবিতার নারীকেন্দ্রিক ভাবনা প্রায়শ লিবিডো তাড়িত নয়। তিনি নারীকে মা হিসেবে ভাবতে ভাবতে দেশ-মাতৃকায় অথবা দেশকে মায়ের আসনে গমনাগমনে প্রতিস্থাপন করেন। বলা যায় 'মা-মাটির অসহায়ত্বের যন্ত্রণাকাতর কবিচিত্তের শব্দগত প্রকাশ তাঁর কবিতা।'[২৭] তাঁর কবিতার প্রেমিকারূপী নারীরাও আনন্দে বিচরণ করে না। উভয় ক্ষেত্রেই কবির ভাবনার পরিসমাপ্তি হয় বেদনাবোধে। ফলে আবুল হাসানের রোমান্টিকতা পুষ্ট নয়, রুগ্ণ-করুণ। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কবিতার নারীরা জননী, স্বদেশ, প্রেমিকা, সহোদরা, সেবিকা ও শিল্পরূপেই অধিক সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত।

> তাঁর কাছে নারী শিল্পেরই প্রতিমা। তাঁর নারী তাই নান্দনিক।... বেশি রোমান্টিক বলে, স্বাপ্নিক বলে, আর্দ্র করুন বলে অপরাহ্নের মতো তাঁর নারী ঢলে পড়ে শিল্পিত সন্ধ্যায়। তাঁর নারী বরাবর-রুগ্ন, ক্লিষ্ট, বিষণ্ন, মানসিক শ্রমে জব্দ, কুমারীত্বের কাফনে মোড়া।[২৮]

আবুল হাসান তাঁর কবিতায় নারীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবেই উপস্থাপন করেছেন। নারীকে যেমন আশ্রয় হিসেবে দেখিয়েছেন, আবার আশ্রয়ই হয়ে উঠেছে নারী। কবি যেহেতু সমাজের বাসিন্দা তাই তাঁর দৃষ্টি থেকে সমাজের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অসঙ্গতিও এড়িয়ে যেতে পারে না। তাই আবুল হাসানের প্রায় কবিতাতেই সমাজের অবক্ষয় ও নৈতিকতার অভাবচিত্র উঠে এসেছে। সমাজে নারীর নিগ্রহ, শিশুর বঞ্চনা, গণিকার মনোবেদনা, নর্তকীর অপমান সবই কবির হৃদয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। তিনি সমাজের এসব মানুষের যাপিত জীবনের বিষাদময়তা প্রত্যক্ষ করে নিজেও বিষাদগ্রস্ত হয়েছেন। 'উচ্চারণগুলি শোকের' কবিতায় কবি লক্ষ্মী বউ, হাঁটি হাঁটি শিশু, ছোট ভাই, ছোট বোনকে অন্বেষণ করেন; খুঁজে ফেরেন হারানো কৈশোর, ফেলে আসা গ্রাম-প্রকৃতি। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন তাঁর চারদিকে কেবলি 'কতকগুলি মুখস্থ মানুষ'। অন্যত্র কবি উচ্চারণ করেন 'আমি ভুলে গিয়েছিলাম পৃথিবীতে তিন চতুর্থাংশ লোক এখনো/ক্ষুধার্ত!/আমি ভুলে গিয়েছিলাম রাজনীতি একটি কালো হরিণের নাম!/আমি ভুলে গিয়েছিলাম সব কুমারীর কৌমার্য্য থাকে না।' 'তার কথায় আমরা পাই জীবনের বিষণ্নতা, নৈঃসঙ্গ এবং দীর্ঘশ্বাস। পাই মানুষের প্রতি মমতা, জীবনের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা।'[২৯] ফলে যে সমাজে নারীরা অনেক ক্ষেত্রেই নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছে সে সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, নারীর সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য

নারীদেরকেই এগিয়ে আসার কথা বলেন কবি।

নারী, নারীই কেবল যদি বোঝে কোনো নারীর হৃদয়- তবে
তুমি ভূখে-র মানে এই ঢাকা শহরের এক সবুজ তনয়া, নারী
তুমি কি বোঝোনা তার তিরিশ বছর কাল কুমারী থাকার অভিশাপ?
বোঝো না কি
তিরিশ বছর কত কাঁদায় যৌবন ঐ কোকিলের পাষ- রোদন!
... ...
অভিমানী, সর্বস্ব খোয়ানো ঐ মেয়ে-
মানসিক শ্রমে জব্দ জীবনধারিণী!
ওকে দয়া করো,
হে ভোর,
হে স্ট্রীট,
শিশুকাস,
আর্ট খাতা,
বনের বিজন
সাঁঝবেলা!
বিষণ্ন ও কুমারীকে দয়া করো![৩০]

অন্তর্গত বিশ্লেষণেও আবুল হাসান নারীদের বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মনে করেন নারীরা অসহায় ও নিরীহ। বাল্যকালে নিজের পরিবারেই তিনি নারীর নিগ্রহ হতে দেখেছেন। তাঁর কবিতায় তা নানা রূপকে উঠে এসেছে। এসব কারণেও নারী ও প্রেম সম্পর্কে তাঁর ধারণা অন্যদের চেয়ে ভিন্নতর। আবুল হাসানের কবিতায় প্রেম এসেছে বিরহরূপে। তার ভালোবাসার নারীকে তিনি তুলে এনেছেন স্মৃতি রোমন্থনে। কখনো কৈশোর-স্মৃতি কখনো যৌবনের স্মৃতি; কখনও ব্যর্থ প্রেমের স্মরণ। তিনি প্রেমের বীভৎসতা বুঝাতে অপেক্ষমান প্রেমিকের চোখে প্রেয়সীকে দেখিয়েছেন চাইনিজ পর্দা ও চামচ-রূপে;– 'তোমার কথার মতো নরম সবুজ/কেকগুলি পড়ে আছে একটি পিরিচে/তোমার চোখের মতো কয়েকটি চামচ!/তোমার হাসির মতো উড়ছে চাইনিজ পর্দা রেস্তোরাঁয়... রেস্তোরাঁয় তুমি কি আসবে না আর স্বাতী?'। কোথাও আবার থাকে অভিসারের ব্যথা। তবে হতাশাগ্রস্ত ও বিরহকান্ত কবি মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য অথবা নারীরূপে প্রেমিকাকে চির নিরুদ্রব রাখতে চেয়ে প্রেমকে কল্যাণবোধে নিয়ে যেতে চান। 'জীবনের অন্তর্জ্বালার যে সর্বগ্রাসী অনুভব ব্যক্তি শিল্পীকে নিয়ে যায় সমগ্রতার মধ্যে, বিশ্বঅস্তিত্বের বিপুল সমাবেশে– আবুল হাসান কবিজীবনের সূচনায় সেই অনুভব ও উপলব্ধির মধ্যে জাগ্রত হয়েছিলেন।'[৩১] সেই অনুভবের প্রকাশে তিনি বলেন, 'আর

যদি সে কিছু নয়, শুধু মারী, শুধু মহামারী!/ভালোবাসা দিতে গিয়ে দেয় শুধু ভুরুর অনল।/তোমরা কেউই আঘাত করো না তাকে, আহত করো না।/যদি সে কেবলি বিষ- ক্ষতি নেই– আমি তাকে বানানো অমৃত।' প্রেয়সীকে নিজে না পেলেও অন্যের কাছেও যেন ইতিবাচকভাবে থাকে, অন্যের ঘরের রমণী, জননী, শস্যবতী যাই হোক না কেন সে যদি বিষ হয় কবি তাকেই অমৃত বানাবেন। কিন্তু এই ধারণা পরক্ষণেই হাহাকার হয়ে ঝরে পড়ে, 'প্রিয়তম পাতাগুলি ঝরে যাবে মনেও রাখবে না/আমি কে ছিলাম, কী ছিলাম- কেন আমি/সংসারী না হয়ে খুব রাগ করে হয়েছি সন্ন্যাসী।/হয়েছি হিরণ দাহ, হয়েছি বিজন ব্যথা, হয়েছি আগুন!' 'আর জানোই তো কবিরা কাঁদলেও তার অশ্রু থেকে মৃত্যু ঝরে পড়ে?/ আর জানোই তো তাঁদের অশ্রুর মূলে মর্মর ঝরঝর করে আজো/ ঝরে যায় ফের'।

মানুষের মনুষ্যত্ব, মর্মছেঁড়া জীবনের এপাশ ওপাশ এটা ওটা!
আমার শরীর খোঁড়া, দুঃখময় আত্মার গাঁথুনি, দ্যাখো আমি ঠিকই
খণ্ডিত ইটের মতো খুলে যাবো সহজেই, কিছুই থাকবো না!
মায়া ও মমতা ছাড়া, মানুষের দুঃখবোধ, ব্যাথাবোধ ছাড়া আমি
কিছুই থাকবো না।[৩২]

প্রতিটি মানুষের দুঃখবোধকে কবি নিজের করে নিতে পারেন কারণ একজন সাধারণ মানুষের অনুভূতি আর কবির অনুভূতি সমগোত্রীয় নয়। কবিদের অনুভূতি ও নিজস্বতা নিয়ে একটা দায়বোধের ঘোষণা থাকে; নিজের অস্তিত্ব দিয়ে অন্যের অস্তিত্বকে বুঝে নিতে চান। কবিরা একইসঙ্গে শব্দ-শিল্পী হওয়ার কারণে তাঁদের লেখনীতে সেই নিজস্বতার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। কবির ভাবনা ও অস্তিত্বচেতনা তাঁর 'রাজা যায় রাজা আসে' কাব্যের "আবুল হাসান" নামক কবিতাটিতেই ঘোষণা করেছেন– 'এটা তোর জন্মদাতা জনকের জীবনের রুগ্ন রূপান্তর/একটি নামের মধ্যে নিজেরি বিস্তার ধরে রাখা/তুই যার অনিচ্ছুক দাস'। 'মধ্যবিত্ত জীবনের নাগরিক স্মৃতিযন্ত্রণা যে তাঁর নেই তা নয়, কিন্তু ব্যর্থ পিতৃত্বের করুণ প্রতিচ্ছবি অঙ্কনের মধ্যেও তিনি প্রকাশভঙ্গির নতুনত্বে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেন।'[৩৩] আজন্ম দাসত্ব শব্দের বহুমাত্রিকতাবোধে কবি তাঁর এবং সমগ্র জাতির অস্তিত্বের উন্মেষ, পরিচয় ও সঙ্কট নির্ণয় করে দিলেন। যদিও কবি জানেন মৃত্যুই শাশ্বত; সেইসাথে মানেন ব্যক্তি কখনো বিচ্ছিন্ন কোনো সত্তা নয়, ব্যক্তি চাইলেই সবকিছু এড়িয়ে যেতে পারে না। অনিবার্যতার অমোঘ নিয়মে তাই অন্তর্গত মানুষটি চাপা পড়ে যায়। 'আবুল হাসান আধুনিক কাব্যের উত্তরাধিকারের ভিতরে বসেও একা এবং নিঃসঙ্গ কবিপুরুষ।'[৩৪] এই কারণে কবি দুঃখবোধগুলো শুধুই নিজের করে নিয়ে অন্যকে সুখী দেখতে চান। তিনি দুঃখকেই শাশ্বত হিসেবে মেনে নিয়ে বলেন, 'দুঃখের এক ইঞ্চি

জমিও অনাবাদি রাখবো না/আর আমার ভেতর!' কিন্তু প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে কবি নিজেও একসময় অস্তিত্বের চরম সঙ্কট অনুভব করেন ও একা হয়ে যান।

অবশেষে জেনেছি মানুষ একা!
জেনেছি মানুষ তার চিবুকের কাছেও ভীষণ অচেনা ও একা!
দৃশ্যের বিপরীত সে পারে না একাত্ম হতে এই পৃথিবীর সাথে কোনোদিন।
... ...
সবার গোচরহীন আছি অজো সুদূর সন্ধানী!
দূরে বসে প্রবাহের অন্তর্গত আমি, তাই নিজেরই অচেনা নিজে[৩৫]

কবির হৃদয়ের অন্তর্গত বেদনা কবিকে স্বস্তি দেয়নি। তিনি একবার বলছেন পৃথিবীতে মানুষ বড় একা, আমি দূরে বসে প্রবাহের অন্তর্গত কিংবা জাতি সংঘ আমাকে নেবে না; কিন্তু এইসব সিদ্ধান্ত শিলিভূত নয়। চিত্তের চাঞ্চল্যের কারণে তিনি একবার নিজের জীবনের শেষপ্রান্ত দেখতে পাচ্ছেন আবার নতুন করে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা-আকুতি প্রকাশ করছেন। এই আকুতি সমাজসত্য নির্ণয়ে একজন কবির কাছে যেমন সত্য তেমনি ব্যক্তি আবুল হাসানের জীবন দিয়ে বিবেচনা করলেও সত্য। স্বল্পায়ু কবির এই আকুতি সাধারণের বাঁচার আকুতিতে রূপান্তরিত হয়ে হৃদয়স্পর্শী হয়ে যায়। 'আমি আবার ফিরে এলাম আমাকে নাও,/আমাকে নাও, ডুবতে ডুবতে বেঁচে গিয়েছি/নক্‌শী কাঁথা, নদীর বালিশ অনেক রকম গ্রাম্য শালিস/মনে কি পড়ে, মনে কি পড়ে?' শিল্পের কবি যেনো জিজ্ঞাসা করছেন ব্যক্তি-সমাজের অন্তরালে অন্য কোনো গূঢ় তাৎপর্য। সাধারণের জীবন যাপন বেঁচে থাকা ও সন্তান উৎপাদনকেন্দ্রিক; কবি সে কথা বলেছেন; কিন্তু শিল্পির অনুসন্ধান ত্রিকালব্যাপী। তবে কবি আবুল হাসান খুঁজে ফেরেন তাঁর অতীত, ইতিহাস-ঐতিহ্য। কবি ফিরে যেতে চান নোলোক পরা বউয়ের কাছে, নদীর কাছে, প্রকৃতির কাছে। আবুল হাসানের কবিতায় প্রকৃতি এসেছে অতীতচারণে। তাঁর কবিতায় প্রকৃতির জন্য হাহাকার আছে; আবার অতীতে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা আছে। কবির নস্টালজিক চেতনা বা অতীত বিধুরতা কবিকে মূহ্যমান ও ভারাক্রান্ত করে দেয়। কিন্তু 'তাঁর কবিতায় আত্মপ্রেম, নৈঃসঙ্গ্যবোধ, বিচ্ছিন্নতা কিংবা স্মৃতিকাতর বেদনার্ত আত্মা দিব্যত্ব লাভ করে।'[৩৬] ফলে মূহ্যমান বিলাপেও প্রকাশিত হয়েছে আবহমান বাংলার হারানো ছবি; তাতে মিশে থাকে বাঙালির চিরায়ত সংস্কৃতি।

মনে করতে দাও তবু কোনখানে বকুলবাগান ছিল
গেরস্থের হাজার দুয়ারী ঘরবাড়ি
উঁচু আসন, সিংহাসন
... ...
মাটির ময়ূর, ঠোঁটে ঠোঁটে, ফুলে ফুল
লুকানো ডাকবাক্স আছে সবুজের কাছে

মনে করো আমাদেরও ভালোবাসা আছে
খাগের কলমে লেখা তাদের অক্ষরগুলি
ধানের শীষের মতো টলমলায় সেখানে শরীর
... ...
আমরা নৌকার জলে ভাসতে ভাসতে যেনো প্রতীকের হাঁস
ঐ রাজহাঁস[৩৭]

আবুল হাসানের কবিতায় মৃত্যুভাবনা কবিচেতনায় যেমন সত্য, কবির যাপিত জীবনের ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য। 'আধুনিক জীবনের অন্তর্ভেদী চিৎকার ও ভয়াবহ আর্তির মধ্যে জেগে উঠলেন তিনি যেখানে মানবিক সম্মিলন প্রয়াসের মধ্যেও নিয়তির মতো অনিবার্য হয়ে বারবার ঘুরে ফিরে আসে 'নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব, অসহায়বোধ আর মৃত্যুবোধ।'[৩৮] কবি শারীরিক ভাবে অসুস্থ ছিলেন। দীর্ঘ দিনের রোগভোগকালে তাই তাঁর কবিতায় সেসব আবেগ-অনুভতি ও আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। "আমার চোখে বলেছিলাম" কবিতায় কবি স্বীকার করেছেন– 'এই দেশে জন্মেছি বলেই বিজ্ঞ বাউল, আমি তোমার/ আঙ্গুল ধরে টেনেছিলাম ধর্ম ও ফুল/ আমি তোমায় স্পর্শ করে বলেছিলাম গভীরতায়/আবার যখন আসবো, আমি দেখিয়ে দেবো/ জল কেন যায় মাটির নীচে মমতা আমি দেখিয়ে দেবো/কি কোরে যাই কি কোরে যাই!' পরবর্তী আগমনে কবি অতীত জীবনের ভুলগুলো শুধরে নিয়ে তাঁর পূর্ণপ্রকাশ ঘটাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। কারণ এই জীবনে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নে সময় রাষ্ট্র, রাজনীতি কিছুই তার অনুকুলে ছিলো না। তাঁর অভীপ্সা আর আক্ষেপ- 'এই দেশে জন্মেছি বলেই ফুল ফোটানোর প্রজ্ঞা আমি/পেয়েছিলাম, অনাবরণ আজ যদিবা হত্যাপ্রবণ/খরায় আমি।' ব্যক্তি জীবনে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই খরা কবি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। ফলে শস্যবিহীন বাস্তবতা কবির চিত্তে উৎপাতের সৃষ্টি করে। যেহেতু 'আবুল হাসানের কবিতা তার জীবনেরই অন্যতম অভিব্যক্তি।'[৩৯] তাই তাঁর কবিতার অসংখ্য চরণে প্রকাশিত 'ফলহীন সময়' বেদনাদীর্ণ জীবনদৃষ্টির পরিসীমায় পৌঁছে দেয়।

মাঝে মাঝে গলিত শুয়োর গন্ধ, ইঁদুরের বালখিল্য ভাড়াটে উৎপাত
অসুস্থতা, অসুস্থতা আর ক্ষত সারা দেশ জুড়ে হাহাকার
ধান বুনলে ধান হয় না, বীজ থেকে পুনরায় পল্লবিত হয় না পারুল
... ...
যুগে যুগে প্রেমিকের চোখের কস্তুরী দৃষ্টি,
প্রেমিকার নত মুখে মধুর যন্ত্রণা[৪০]

আত্মিক দুঃখ, হতাশা, অপ্রাপ্তির বেদনা আর রোগের যন্ত্রণাকে সঙ্গী করে ক্ষণকাল দৈহিকভাবে জীবিত থাকা এক কবির নাম আবুল হাসান।

'ষাটের দশকের মধ্যভাগে আমরা যারা কবিতা লেখা শুরু করি, কবিতার জন্য বাজি রাখি জীবন, কবি হওয়ার এক দুর্মর নেশা পেয়ে বসে। আমাদের, সেই তরুণ

কবিকুলের মধ্যে হাসানই ছিলো বোধহয় সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর। অপচয়ী, কবিতার প্রতি নিবেদিত, কবিতার জন্য নিজেকে ক্ষয় করার জন্য প্রস্তুত।'[৪১]

যিনি কবিতার জন্য, মানুষের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, ভাষার জন্য লড়েছেন। পরাজিত-ক্লান্ত হয়ে আবার উঠে দাঁড়ানোর সাহস সঞ্চয় করেছেন। কালে কালোত্তরে তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছেন। আবুল হাসান দৈহিকভাবে আমাদের মাঝে অনুপস্থিত কিন্তু তাঁর কবিতাশিল্প ক্রম-ঔজ্জ্বল্য লাভ করছে। কবিতার আলোয় আলোকিত আবুল হাসান। সেই আলোতে ভবিষ্যৎ পাঠকের জন্য আলোর পথ নির্মাণ করে গেছেন। তাঁর কবিতার যে বাণীরূপ তা কবির আসমুদ্র ব্যথার প্রকাশ কিন্তু তা ভষ্যিতের পথ নির্দেশকও বটে। যে বেদনা আর দুঃখের উদ্বোধন যাপিত জীবনকে ক্ষতবিক্ষত, হৃদয়কে আর্দ্র করে মিলিয়ে গেলো; তার পরিসমাপ্তিতে যে বোধ জেগে উঠলো তা 'হিরণ্ময়'।

তথ্যসুত্র:

১. শহীদ ইকবাল, বাংলাদেশের কবিতার সংকেত ও ধারা, চিহ্ন প্রকাশন, রাজশাহী, ২০০৮, প্র. ৫৬
২. সোহরাব হাসান, "আবুল হাসানের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি : কিছুকথা", আবুল হাসানের অপ্রকাশিত কবিতা, বিভাস, ঢাকা, ২০১৬, প্র. ১০
৩. শামসুর রাহমান, "ভূমিকা", আবুল হাসান রচনা সমগ্র, বিদ্যাপ্রকাশ, পঞ্চম প্রকাশ, ২০১২, প্র. ৭
৪. উদ্ধৃত, বিশ্বজিৎ ঘোষ, আবুল হাসান(জীবনী গ্রন্থমালা), কথাপ্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯১৭, প্র. ৩৯
৫. আবুল হাসান, "শিকড়ে টান পড়তেই", আবুল হাসান রচনা সমগ্র, পূর্বোক্ত, প্র. ৪৮
৬. আবুল হাসান, "বদলে যাও, কিছুটা বদলাও", তদেব, প্র. ৩৯
৭. আবুল হাসান, "অসভ্য দর্শন", তদেব, প্র. ৪৩
৮. আবুল হাসান, "দূরযাত্রা", তদেব, প্র. ৪৫
৯. আবুল হাসান, "জন্ম মৃত্যু জীবনযাপন", তদেব, প্র. ২৫
১০. বিশ্বজিৎ ঘোষ, পূর্বোক্ত, প্র. ৪৩
১১. আবুল হাসান, "পাখি হয়ে যায় প্রাণ", পূর্বোক্ত, প্র. ১৯
১২. আবুল হাসান, "বনভূমির ছায়া", তদেব, প্র. ১৮
১৩. আবুল হাসান, "ব্যক্তিগত পোশাক পরলে", তদেব, প্র. ৩৩
১৪. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, ২০০২, প্র. ১৭৬
১৫. আবুল হাসান, "একটা কিছু মারাত্মক", পূর্বোক্ত, প্র. ৪৪
১৬. শহীদ ইকবাল, বাংলাদেশের সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, প্র. ৯৫
১৭. আবুল হাসান, "এখন পারি না", পূর্বোক্ত, প্র. ৬৫
১৮. আবুল হাসান, "অনেক দিন পর ভালোবাসার কবিতা", তদেব, প্র. ১০৮
১৯. মহাদেব সাহা, "আবুল হাসানের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি", আবুল হাসানের অপ্রকাশিত কবিতা, পূর্বোক্ত, প্র. ৭
২০. শহীদ ইকবাল, বাংলাদেশের সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, পূর্বোক্ত, প্র. ৯৭
২১. আবুল হাসান, "চামেলী হাতে নিম্নমানের মানুষ", পূর্বোক্ত, প্র. ২১

২২. আবুল হাসান, "জন্ম মৃত্যু জীবনযাপন", তদেব, প্র. ২৫
২৩. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর, পূর্বোক্ত, প্র. ১৭১
২৪. আবুল হাসান, "ঝিনুক নীরবে সহো", পূর্বোক্ত, প্র. ১১৮
২৫. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর, পূর্বোক্ত, প্র. ১৭৪
২৬. আবুল হাসান, "কোরে তোলো শুদ্ধ বর্তমান", পূর্বোক্ত, প্র. ২০০
২৭. ড. আবু ছালেহ মোহাম্মদ ওয়াদুদুর রহমান, "আবুল হাসানের কবিতা: একাকীত্বের দীর্ঘশ্বাসে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা", বাংলা গবেষণা জার্নাল, বাংলা বিভাগ, বেরোবি, রংপুর, ৩য় সংখ্যা, ২০১৬-২০১৭, প্র. ৭১
২৮. গাজী আজিজুর রহমান, কবিদের কবি, বাংলা একাডেমি. ঢাকা, ২০১০, প্র. ১৮৬
২৯. সোহরাব হাসান, পূর্বোক্ত, প্র. ১২
৩০. আবুল হাসান, "মিসট্রেস : ফ্রি স্কুল স্ট্রীট", পূর্বোক্ত, প্র. ৪৬
৩১. রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, প্র. ১৭১
৩২. আবুল হাসান, "ভিতর বাহির", পূর্বোক্ত, প্র. ৮৩
৩৩. রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, প্র. ১৭২
৩৪. তদেব
৩৫. আবুল হাসান, "পাখি হয়ে যায় প্রাণ", পূর্বোক্ত, প্র. ১৯
৩৬. শহীদ ইকবাল, বাংলাদেশের কবিতার সংকেত ও ধারা, পূর্বোক্ত, প্র. ৫৬
৩৭. আবুল হাসান, "স্রোতে রাজহাঁস আসছে", পূর্বোক্ত, প্র. ৫৪
৩৮. রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, প্র. ১৭১
৩৯. তদেব
৪০. আবুল হাসান, "নচিকেতা", পূর্বোক্ত, প্র. ৯৩
৪১. মহাদেব সাহা, পূর্বোক্ত, প্র. ৫

এনইউবি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা
(Peer-Reviewed Journal)
ISSN : 2710-4451
বাংলা বিভাগ
নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২২

কবিতা ও চিত্রের নিবিড় সম্পর্ক

বাসুদেব মণ্ডল*

সার-সংক্ষেপ : কবি ও শিল্পী লোক-বিশ্বের মানুষ। দুজনেই সৃষ্টি করে চলেন সৃজনের অমোঘ টানে। একজন রঙে রেখায় ফুটিয়ে তোলেন হৃদয়ের অভিব্যক্তি, আর একজন বর্ণে বর্ণে সুসজ্জিত করেন অক্ষরমালা তাঁর হৃদয-রঞ্জিত সংরাগ। চিত্রশিল্পী এবং কবি দুজনের ভাবন-ঘরে প্রতিনিয়ত চলে সৃজনের টালমাটাল খেলা। চিত্রকরের সৃষ্টি আর কবির সৃষ্টি, দুজনের সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। একজন ছবি আঁকেন রঙে আর একজন ছবি আঁকেন অক্ষরে-অক্ষরে শব্দে-শব্দে। গন্তব্য একই। দুজনের সাধনাই সৌন্দর্যের সাধনা। পাঠক কবিতা পড়ে আনন্দ পান, হৃদয়কে রাঙিয়ে তোলেন, নিজে ঋদ্ধ হন। চিত্র শিল্পের দর্শকও একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলেন। তিনিও চিত্র শিল্পের মধ্যে খুঁজে ফেরেন সৌন্দর্যের মহিমা।

একজন সৃজনশীল মানুষ প্রতিনিয়ত ভাবছেন তিনি বাউল হয়ে যাবেন। বাউল হতে পারার মধ্যে নাকি আনন্দ বেশি। প্রতি মুহূর্তে আত্মখননে লেগে থেকে-থেকে আত্মার পাঠ নিতে থাকেন আর উপলব্ধি করেন অলৌকিক মায়ার জগৎ আনন্দে পূর্ণ। এই আনন্দের জগতে পৌঁছতে গেলে নাকি অমিয় বায়ুর দ্বারা তাড়িত হতে হয়। বায়ুগ্রস্ত বলেই তিনি বাউল। এ বায়ু সৃষ্টির বায়ু, প্রাণের বাতাস। সৃষ্টির যে হৃদপিণ্ডটা আছে তার অলিন্দ-নিলয়ের সুস্থতার জন্যে প্রাণবায়ু না নিলে কি চলে? তাই তো হৃদপিণ্ডের সুস্থতার জন্যে বাউল হতেই হয়। সৃষ্টির জন্যে যিনি বাউল হন লক্ষ্য তাঁর একটাই, অনন্ত আলোকের দিকে ছুটে যাওয়া। একটাই তার, একটাই সুর। মায়াময় হৃদপিণ্ডটা একতারা বেঁধে নিয়ে আনন্দ ঝর্ণায় ডুবে যায়; লৌকিক পরিমণ্ডলকে ভুলে যায়। এই যে জগৎ, এই যে ভাবন ঘর, এরই মধ্যে বাস করেন কবি, বসত করেন শিল্পী ।

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান,
ড. বি.আর.আম্বেদকর শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধীন।

'হ'তে চাওয়া' আর 'হয়ে আছে যা' তাকে বড় করা তো এক কথা নয়। প্রতিনিয়ত ভিতরের তাড়া অনুভব ক'রে যিনি শিখে যাচ্ছেন এঁকে যাচ্ছেন তিনি শিল্পী, না প্রযোজকের ব্যবসায় মুনাফার জন্যে যিনি লিখে যাচ্ছেন এঁকে যাচ্ছেন তিনি শিল্পী? আমার মধ্যে আমাকে ডুবিয়ে রেখে হৃদয় নিঙড়িয়ে বের করা হ'ল যে শিল্পকর্মটি তা তো অমৃতময়। এই অমৃতের সন্ধানে ছুটে চলেন শিল্পী এবং রসিক জনেরা। অনুভবের স্বর্ণ কুটিরে জমা হচ্ছে যে শৈল্পিক কারুকৃতি তাকে মাধ্যমে রূপান্তরিত ক'রে আলোতে নিয়ে আসাই মহৎ কর্ম। এই মহৎ কর্মযজ্ঞে অংশ নিতে পারেন কবি অথবা শিল্পী। যে মাধ্যমেরই শিল্পী হোন না কেন তার এটাই দায়িত্ব। কারণ শিল্প তো অপ্রয়োজনের আনন্দ মেনে নেয় না, অবসরের বিলাসকেও গ্রহণ করে না। শিল্প উপরি পাওনা প্রত্যাশা করে না। শিল্প আদায় করে নেয় লোকোত্তর বিভানন্দ।

শিল্পী লোকবিশ্বের মানুষ। তাঁর যাত্রার শুরু নিজস্ব পরিমণ্ডল থেকে। এই পরিমণ্ডলের কথা শিল্পে ব্যক্ত করতে করতে কখনও তিনি পৃথিবীর সোঁদা গন্ধ ভেদ করে শিল্পী মরমি জগতের বাণীকণ্ঠ হয়ে ওঠেন। অনেক সময় কবি-শিল্পী জল-হাওয়ার মানুষের কথা মাথায় নিয়ে তাঁর মহৎ কর্মে হাত লাগান। অর্থাৎ সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা ব্যক্ত-অব্যক্তভাবে তিনি অন্তরে বয়ে নিয়ে বেড়ান। প্রকৃত শিল্পীরা সেই কর্মটি করতে করতে অলৌকিক কথাও বলে ফেলেন মনের অজান্তে। লৌকিক জগতের ভূমি-পটে বিচরণ করার কালে, শিল্পী তার সৃষ্টিকর্মের নিজস্ব হাতিয়ার হাতে নিয়ে নন্দনতত্ত্ব প্রকাশের কালে, নিজেকে তিনি সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন। সমাজের অঙ্গীভূত করেন শিল্পকর্মটিকেও। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'আমি কবি যত কামারের' কবিতাটির কয়েকটি চরণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সেখানে তিনি লিখেছেন,

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের
-মুটে মজুরের,
-আমি কবি যত ইতরের।
আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই
সময় যে হায় নাই।
মাটি মাগে ভাই হলের আঘাত
সাগর মাগিচে হাল,
পাতাল পুরীর বন্দিনী ধাতু
মানুষের লাগি কাদিয়া কাটায় কাল,
দুরন্ত নদী সেতু বন্ধনে বাঁধা যে পড়িতে চায়,
নেহারি আলসে নিখিল মাধুরী
সময় নাহি যে হায়।[১]

এ' কবিতা পড়ার পর আপাতভাবে মনে হতে পারে এর মধ্যে রোমান্টিক স্বপ্ন কল্পনার কোনো দ্যুতি নেই। খেটে খাওয়া মানুষের বাস্তবতার চিত্রে ধরা পড়েছে কবির দায়বদ্ধতা। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কবি সমব্যথী হয়েছেন সমমনা হওয়ার কারণে। কিন্তু ভাবলে অবাক লাগে এর মধ্যেই তিনি উপহার দিয়েছেন শৈল্পিক সত্যতাকে। শিল্পের যে নন্দনতাত্ত্বিক আবেদন তা তো এই একই কবিতা অর্থাৎ 'আমি কবি যত কামারের' কবিতাতে উৎকীর্ণ। কবি ব্যক্ত করলেন,

মাটির বাসনা পুরাতে ঘুরাই
কুম্ভকারের চাকা, দুঃসাহসের পাখা।
আকাশের ডাকে গড়ি আর মোলি
অভ্রংলিহ মিনার দত্ত তুলি,
ধরণীর গূঢ় আশার দেখাই উদ্ধত অঙ্গুলি![২]

কুম্ভকারের চাকা ঘুরানোর অর্থ মাটির বাসনা পূরণ। মাটিরও তো একটা ইচ্ছে আছে। মাটিও তো শৈল্পিক আকৃতি চেয়েছে। কুম্ভকার হলো সেই শিল্পী যিনি চাকার ওপর কাঁচা মাটি ঘুরিয়ে স্নেহের স্পর্শ বুলিয়ে, সৃষ্টি করেন ফুলদানি, গাছকে লাগানোর অমৃতময় পাত্র। একথা ভাবতে কোনো দ্বিধা থাকে না। থাকার কথাও নয়। শৈল্পিক প্রয়োজন যে প্রয়োজন ছাড়াও অন্যকিছু তা ভাবতে আমাদের অসুবিধা হয় না।

ধরা ও অধরা জগতের এক বর্ণিল সুখ-পাখির মধুর কণ্ঠস্বর শুনতে পান মরমি সাধকরা, কবি-চিত্রশিল্পরা। এই কণ্ঠস্বর কখনো শ্রুতিকে কখনো হৃদয়ের সরগমকে মথিত করে, নন্দিত করে। জল-মাটির কাঠি নাড়তে নাড়তে তা হয়ে ওঠে সোনার কাঠি রূপোর কঠি, শিল্পীর হাতে, কবির হাতে। ধরা যাক চিত্রশিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। রঙের লীলায় তিনি জীবন প্রবাহের আনন্দ বাঁশরীর সুরটিকে ছড়িয়ে দেন। বেরিয়ে পড়ে সম্মোহনী শক্তির জাদুমন্ত্র। মন্ত্রমুগ্ধের মতো ছবির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে মনে মনে কতবার যে আনন্দ ধ্বনি অনুরণিত হয় তার ঠিক নেই। এই আনন্দ অনুধাবনের মুহূর্তে মানুষ কোন জগতে থাকে? মায়ার জগতে না অপার্থিব ভাবনঘরে? বলতে দ্বিধা নেই সুধাপায়ী তখন মায়াময় প্রপঞ্চকে ভুলে কল্পনার এক নির্জন দ্বীপে বিচরণ করেন। কবি যেমন উপলব্ধির বিষয় আপন ছন্দে-বর্ণে শব্দে প্রকাশ করেন, চিত্রশিল্পীও তেমন রেখায় রঙের মেলবন্ধনে এক মধুর দৃশ্যের অবতারণা করেন।

রামানন্দবাবুর বিনোদিনী এমনই একটি চিত্র যা হাজরবার দেখেও আশ মেটে না। যতবার দেখা যাবে ততবারই রঙ তার নিজস্ব কণ্ঠে বলে ওঠে আমার মধ্যে কী এমন সুধা আছে? আর কতবার দেখবে? এই হলো জীবন্ত রঙ ও রেখার অমৃতময় অলৌকিত্ব। মায়ার বন্ধনে বেঁধে ফেলে দর্শককে। এই শক্তি তো সমস্ত চিত্রশিল্পীর চিত্রে থাকে না।

গুটিকয়েক রেখমাত্র, দুই একটি রঙ যে এত শক্তিশালী হতে পারে, এত মায়াবী হতে পারে তা না দেখলে বোঝাবে এমন সাধ্যি কার।

শিল্পী রামানন্দ কি বাস্তবে কোনো বিনোদিনীকে দেখেছিলেন? হয়তো দেখেছিলেন বা দেখেননি, কলনায় এঁকেছেন বিনোদ সৃষ্টিকারী বিনোদিনীকে। এভাবেই তো বাস্তব থেকে কল্পনায়, কল্পনা থেকে বাস্তবে শিল্পকর্মটি আসন করে নেয়। পাখির নীড়ের মতো চোখ কি জীবনানন্দ দেখেছিলেন? দেখেননি। তবু তা যেন বাস্তবের মায়াময় জগতে, শান্তির জগতে আসনটি দেখল করে নিলো। নিজের প্রিয়জনের চোখের মধ্যে তো শান্তি থাকতে পারে। অনন্ত পরিশ্রমের পর প্রিয়ন্তী-প্রিয়া অথবা হৃদয়ের ধনের চোখের মধ্যে শান্তি খুঁজে পাওয়া অমূলক নয়। ক্লান্ত পাখিরা যেন দিনশেষে বাসায় ফেরে শান্তির জন্যে, মানুষও তো বাঁধাধরা কাজের মধ্য থেকে বেরিয়ে হৃদয়ের বাসাটায় আশ্রয় পেতে চায়। সে বাসাটি হতে পারে চিত্র, কবিতা অথবা গান বা শিল্প-নন্দন কাননের অন্য কোনো ফুল।

এই আর একটি অনুষঙ্গ। ফুল। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দুটি ইন্দ্রিয়কে তীব্র আকর্ষণ করে। চোখ আর নাক ফুলের প্রসঙ্গে এসে যায় অনায়াসে। কখনও বা ত্বকেও স্থান করে নেয়। নান্দনিক কোনও Painting দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার সান্নিধ্যে যেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে ঘ্রাণ নিতে। এই ঘ্রাণ কি নাকে নিতে হবে না হৃদয়ে? হৃদয়ে ঘ্রাণের স্বাদ লেগে থাকে, হৃদয়ও ঘ্রাণের দ্বারা অনুরণিত হয়। ফুল কী কাজে লাগে? হৃদয়কে রঞ্জিত করতে। আর? দেবতার পাদপদ্মে উৎসর্গ করতে। কবিতাও রঞ্জিত করে হৃদয়কে, চিত্রও তাই করে। তাহলে কবিতা ও চিত্র কাকে উৎসর্গ করা হয়? কবিতা-প্রেমিক রূপ দেবতাকে। চিত্র উৎসর্গ করা হয় চিত্রভুক দেবতাকে।

মায়ার বন্ধনের মতো শিল্প বেঁধে ফেলে শিল্প-প্রেমীকে। আবার কখনও বা মনে হয় এ কিছু নয়, কী-ই বা দাম আছে এর। একটা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত শিল্পকর্মে শিল্পকর্মীদের মধ্যে থাকে। কখনও মনে হয় শিল্প ছাড়া জীবন অচল, আবার কখনো মনে হয় শিল্প জীবনই অচল করে দেয়। এই দ্বৈত ভাবকে অস্বীকার করার উপায় থাকে না। যখনই কাঙ্ক্ষিত ইচ্ছে পূরণ হয় না, তখনই এ বিষয় বাসা বাঁধে অন্তরে। প্রিয় যখন কষ্ট দেয়, প্রেমে যখন ব্যর্থতা আসে তখন প্রেমিকের ভালোবাসার আসন নড়ে যায়, প্রিয়াকেও তুচ্ছ মনে হয়। আবার এর উল্টোটাও হয়। তার জন্যে জীবন বিসর্জন দেওয়া অসম্ভব কিছু নয়। জীবনও উৎসর্গ করা যায় সহজেই। এভাবেই দেখা যায় শিল্পের জন্যে জীবন, আবার জীবনের জন্য শিল্প। যদিও কখনো কখনো শিল্পী এবং শিল্প গুরুত্ব হারায়, উচ্ছৃঙ্খল জনতার মাঝে মর্যাদা হারায়। তবুও কবিতা উত্তাপ দেয়, চিত্র চিত্রিত করে মন।

কবি বুদ্ধদেব বসু বাস্তবের ঘনিষ্ঠতায় এসে এমনই উপলব্ধি করেন আপন অন্তরে।

সুন্দরকে শুধু মেখে নিতে হয় হৃদয়ের গোপন কন্দরে। দুঃখ আছে মৃত্যু আছে জেনেও এ চলার থামা নেই। 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থের 'মোহমুক্ত' কবিতায় এমনই বাণী উচ্চারণ,

দেখিলাম, থাকে না কিছুই।
হাওয়ায় হারায়ে যায় সুগন্ধি নিশ্বাস আর কেশগন্ধভার।
অন্তহীন অন্ধকার শুষে লয় ক্ষণচ্ছটা অগ্নি তারকার।
উচ্ছৃঙ্খল কলরোলে চকিতে মিলায়ে যায় অর্ধস্ফুট বাণীর শিহর,
ঘন অরণ্যের মর্মে অলতি ম'রে যায় ভীরু বনলতার মর্মর।
বুঝিলাম, কিছু সত্য নয়।
প্রণয়ের প্রতিশ্রুতি, হৃৎপত্রে প্রেমের স্বাক্ষর
জলের চিহ্নের মতো সব ধুয়ে মুছে যায় একদণ্ড পর।
মধ্যরাত্রে শয্যাপ্রান্তে যত সাশ্রু প্রার্থনার সুন্দর বেদনা
বিদীর্ণ হৃদয়ে তাহা আনে না শান্তির স্পর্শ, শীতল সান্ত্বনা।
যত উচ্ছ্বসিত কান্না আকুলিয়া ভেঙে দেয় নয়নের কূল
তাহাও শুকায়ে যায়, মনে হয় তাও যেন ভুল।
যে প্রেম ফুলের মতো গোপনে ফুটিয়া ওঠে রাঙিয়া লজ্জায়
স্পর্শ মাত্রে ঝরে পড়ে যায়।[৩]

এই কবিতারই ৭১ নম্বর এবং ৭২ নম্বর চরণে সুন্দরকে পান করার ইচ্ছেকে কবি তুলে ধরেছেন শব্দ বন্ধনে। হতে পারে এ শিল্প-সুন্দরী অথবা মানস-প্রেয়সী,

আর কিছু চাহিনা, সুন্দরী
সুন্দর তোমার দেহ গণ্ডুষে লইবো পান করি।[৪]

আদিরসের তাণ্ডব নৃত্য বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় ধরা পড়লেও তার মধ্যে অনেক সময় সত্যের ওঁ মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে বাস্তবের প্রেক্ষাপটে। আবার শিল্পের মর্মোদ্ধার করেছেন নারীর রূপকে। নারী যদি প্রকৃতি হয় বা প্রকৃতি যদি নারী হয় তবে সেখান থেকে শিল্পের রসদ সংগ্রহ শিল্পী করবেন, তাতে আপত্তি কোথায়!

বুদ্ধদেব বসু কবিদের প্রতি ব্যঙ্গবাণও নিক্ষেপ করেছেন, লিখিয়েদের গুরুত্ব দেননি অনেক সময়। বা এও হতে পারে ভেতরের বুদ্ধদেবকে ব্যঙ্গের জালে আটকে ফেলেছেন। সবাই শিখছেন বলে লেখার মান নষ্ট হচ্ছে এমনও হতে পারে। সবাই কবিতা লিখলে কাব্যজগৎ নয়-ছয় হয়ে যাবে এই বুঝি তাঁর ভাব। 'নিজের কবিতার প্রতি' কাব্যের ৩ নম্বর কবিতায় কবি বলছেন–

যে-কোনো, যে কোনো লোক, যে ক খ গ ঘ লিখতে পারে
আর দু'চার খানা বইয়ের পাত উল্টিয়েছে
হঠাৎ আজ ইচ্ছে করলেই হ'তে পারে দস্তুর মতো লিখিয়ে।
গাইতে গেলে যার হাঁ বেরুতো না, আঁকতে গেলে কাঁদতে হ'তো,

মিস্ত্রি মুচি দরজি কুমোর নাপিত ছুতোর
কিছু হবার যোগ্যতা যার নেই
হঠাৎ আজ ইচ্ছে করলেই সে হ'তে পারে।
মস্ত বড় লিখিয়ে। হায়রে আমার এই লেখার কাজ![৫]

শিল্পীর অন্তরে তেজোদীপ্ত একটা লাল ঘোড়া অবস্থান করে। প্রতিনিয়ত ছুটে চলাই এর ধর্ম। ভ্রমণের কোনও শেষ নেই বলে মননের বিশ্রাম নেই। রণ থেকে জাগরণ, জাগরণ থেকে ব্যথা, ব্যথা থেকে উঠে আসে লেখা; জন্ম নেয় নতুন শিল্প। চিত্র যেহেতু শব্দহীন কবিতা সেহেতু চিত্রের মধ্যে শিল্পীর মনের কবিতা ব্যক্ত হয়। চিত্রশিল্পী সুনীল দাসের শিল্পকর্মে ধরা পড়ে অন্তরের আবেগ, ইচ্ছে, সংঘাত। কাগজের ওপর চারকোলে আঁকা ঘোড়ার ছবিতেই পরিস্ফুট হয় সুনীলের অন্তরের ঘোড়ার গতিপ্রকৃতি, হৃদয়ের টগবগানি লাগামছাড়া ঘোড়াটি। সুনীলও এক সৈন্য, যাঁর বাহন ঘোড়া। জীবন যুদ্ধে তিনি জয়ী হতে চান যুদ্ধজয়ী অশ্বের মতো। তিনি নিজস্ব শিল্পের বিদ্রোহ ও গতি প্রকাশে অনাবৃত তার পেইন্টিং, রেখাচিত্র উজ্জ্বলতার সম্মান আদায় করে নেয়।

ভালো চিত্র মনের অবস্থায় রঙ ধরিয়ে দিতে পারে। মরা মনকে তাজা করতে পারে। তাজা মনকে বিষণ্ণতায় ভরিয়ে দিতে পারে। যে চিত্রের এই ক্ষমতা আছে তা স্বার্থক। ধন্য সেই শিল্পী। মনের অবস্থা পাল্টানোর ক্ষমতা যে শিল্পীর নেই, যে শিল্পকর্মের নেই তা সার্থক বলে ভাবতেও ভালো লাগে না। ভাবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কবিতাও তো সেই নন্দন-বলয়। কবিতাও সেই কথা বলে।

অনেক সময় এ' রকমও দেখা যায় কিছু ভালো চিত্র দেখার পর শিল্পীর প্রতি ভালোবাসা জন্মে যায়। ভালো কবিতা পড়ার পরও কবির প্রতি এরকম মানসিকতা প্রকাশ করেন পাঠক। সেই শিল্পীর-কবির মধ্যম মানের অনেক চিত্র কবিতা মনে দাগ কাটতে শুরু করে। একবার নাম পেয়ে যাওয়া অনেক শিল্পীই আজে বাজে অনেক কিছু চিত্রিত করেছেন। যা বহুমূল্যে বিকিয়ে যায়। দাম দেখেতো আর শিল্পের মূল্য নির্ধারণ হয় না। আর যারা তা করেন, তারা ঠিক করেন কি?

নন্দন-ভূমে একটা বিষয় খুব স্পষ্ট বলে মনে হয়- শিল্পীর শিল্পকর্মের যথার্থ মূল্যায়ণ হওয়া দরকার, এবং সেখানে কোনো মা চলবে না। মুখ চাওয়া-চাওয়ির ব্যাপার শিল্পের অমর্যাদাকে বাড়িয়ে তোলে। পিঠ চাপড়া- চাপড়ির বিষয় যখন শিল্পাঙ্গনে প্রবেশ করে, তখন শিল্পের নিজস্ব সংস্কৃতি মুখ থুবড়ে পড়ে। যিনি যথার্থ শিল্পী তিনি নিশ্চয়ই একথা স্বীকার করবেন। তবে মজার বিষয় হলো যাঁরা শিল্পচর্চার প্রাণ-কেন্দ্রে আসন পেতে বসেছেন তাঁরা মাঝে-মধ্যে বিষয়টি ভুলে যান। শিল্পকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে কঠোর হাতে শিল্পকর্ম নির্বাচন করা দরকার।

এমনকি যারা প্রচারের আলোতে যেতে পারেননি তাঁদের বিশেষ উদ্যোগে খুঁজে বের করতে হবে, এবং তাঁদের উন্নত শিল্পকর্মের যথার্থ মূল্যায়ণ করতে হবে। ভোটের জন্যে যদি বাড়ি বাড়ি লোক যেতে পারে তবে কেন মহৎ কর্মে সরকারের লোক নিয়োজিত হবে না? পোলিও রোগকে নির্মূল করতে যদি কোটি কোটি টাকা ব্যয় হতে পারে, তবে কেন শিল্পের অসুস্থতা দূর করতে হাজার হাজার টাকা ব্যয় হবে না?

এ কথা আপনাদের মানতেই হবে এখনো গাঁয়ের অনেক সুশিল্পী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে সারা জীবন ধুঁকে ধুঁকে শিল্পকর্ম বুকে নিয়ে রাত্রি যাপন করেন। এই অন্ধকারের রাত শেষ হোক এই প্রস্তাব রাখাটা অমূলক নয়। বিড়ি খেলে, সিগারেট খেলে শরীরের ক্ষতি হয়। এমনকি সিগারেট যে খাচ্ছে তার পাশে যে থাকে তারও ক্ষতি হয়-একথা ভেবেই তো জরিমানা, শাস্তির ব্যবস্থা। আমি বলি কী এমনও তো হয়, একজন বিখ্যাত সরকারি কর্মীর মন খারাপ একজন আদর্শ শিল্পীর ধুঁকে ধুঁকে মরার দৃশ্য দেখে। অনেক সময় ঐ সরকারি কর্মীর কাজেও মন বসে না ঐ কথা ভেবে। এটা কি দেশের ক্ষতি নয়? শুধু মফস্বল কেন, শহরেও এরকম আছে। কেউ কি জোর গলায় বলতে পারেন এ কথাগুলো বাজে কথা?

আর যদি বাজে কথাই ভাবেন তবে বলি কী, শিল্প সংস্কৃতির দপ্তরগুলো উঠিয়ে দিলে সরকারের অনেক টাকা বেঁচে যাবে। যারা শিল্পাঙ্গনে আছেন তারা সচেতন না হলে শিল্পীও মরে শিল্পও মরে। একটা মন্ত্র উচ্চারণ করি শুনুন। আমরা কি এতই গরিব? দেশের কি কিছু কম আছে? শুধু একটু মানসিকতা বদলাতে হবে।

এক সময় জীবনানন্দ দাশকে দেশের মানুষ অবজ্ঞা করেছিল। তাঁর যথার্থ মূল্য 'আমরা দেইনি, দূরদৃষ্টির অভাবে মহান কবির সঠিক মূল্যায়ণ আমরা করিনি সেদিন। অথচ ভাবলে গা শিউরে ওঠে তিনিই লিখেছেন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'রূপসী বাংলা', 'বেলা-অবেলা-কালবেলা'। জীবনানন্দ এক চুম্বক কবি। তিনি অতি সাধারণ পাঠককেও আবিষ্ট করে ফেলেন নিজস্ব আকর্ষণে। তার কবিতা সমস্ত মন-প্রাণ-হৃদয় দিয়ে শুনতে হয় বুঝতে হয়। শব্দ বসিয়ে বসিয়ে আন্তরিকতার মশলায় তিনি সৃষ্টি করেন কবিতার বৃহৎ রাজহর্ম্য। অগুনতি দরজা জানালায় অগণন দৃশ্যপট খেলা করে যায়। কবিতা পাঠের সংখ্যা বেড়ে যায়, একটা কবিতা যত বেশিবার পড়া যায়, তত অর্থ বদলে বদলে উপলব্ধির দরজার সংখ্যাও বেড়ে ওঠে।

শব্দ-মায়া জীবনানন্দের কবিতার একটা বড় দান। মানুষের প্রতি মানুষের যেমন একটা মায়া জন্মে তেমনি জীবনানন্দের কবিতার শব্দ সুপাঠককে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে। একটা পঙ্গু ছেলের প্রতি মায়ের যেমন স্নেহের অফুরান ভাণ্ডারটি উন্মুখ থাকে আর পাঁচটি সুস্থ সন্তানের মতো তেমনি অতি সাধারণ গ্রাম্য শব্দের প্রতি জীবনানন্দের ভালোবাসা

ছিল অকৃত্রিম। সমসাময়িক কবি-সাহিত্যিকরা যে শব্দ ব্যবহার করতে পারেননি তথাকথিত সাহিত্যের কৌলিন্যের জন্যে, জীবনানন্দ তা পেরেছিলেন। অতি গ্রাম্য সাধারণ মুখের কথা, শব্দরা তাঁর কবিতায় অনায়াসে জায়গা করে নেয়। তৎসম শব্দের সাথে মিশিয়ে ফেলেন দিশি শব্দ এমনকি তথাকথিত স্ল্যাং শব্দও। শব্দতো স্ল্যাং হতে পারে না। প্রয়োগের মুন্সিয়ানায় সমস্ত শব্দই মূর্তিময়ী হয়ে ওঠে। কবিতা এবং গদ্যের শব্দের মধ্যে যে কোনো পার্থক্য নেই, তা তিনি প্রয়োগের চারুবিন্যাসে বুঝিয়ে দিলেন,

> হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠ রোগী চেটে নেয় জল,
> অথবা সে হাইড্র্যান্ট হয়তো বা গিয়েছিল ফেঁসে।
> এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে।
> একটি মোটর কার গাড়লের মতো গেল কেশে
> অস্থির পেট্রল ঝেড়ে-সতত সতর্ক থেকে তবু
> কেউ যেন ভয়াবহভাবে প'ড়ে গেছে জলে।
> তিনটি রিকশ ছুটে গেল শেষ গ্যাস ল্যাম্পে মায়াবীর মতো জাদু বলে।[৬]

চিত্রশিল্পী সুনীল দাসের ঘোড়ার কথা বলতে বলতে সমাজের প্রয়োজনের বৃত্তে একটা পাক দেওয়া হলো। এবার সেই বৃত্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে জীবনানন্দ দাশ-এর *সাতটি তারার তিমির* কাব্য গ্রন্থের 'ঘোড়া' কবিতাটায় এসে উপনীত হলাম। ঘোড়া তো গতির কথা বলে। সাহাবুদ্দিনের গতিময় চিত্রকলাও তো তাই। ঘোড়ার গতিময়তা জীবনের গতিময়তাকে প্রকাশ করে। এই ঘোড়ারও তো পরিবর্তন আছে। ঘোড়া পরিবর্তিত হতে হতে যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। যান্ত্রিক দ্রুততা স্মরণ করিয়ে দেয় অতীতের পশুশক্তির কথা। এমন একদিন ছিল, যেদিন দুচাকার দ্রুত গাড়ি বলতে বোঝাতো ঘোড়ার গাড়ি। অথচ আজ, সে গতির দ্রুততার কথা মাপতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। তবুও শিল্পী ঘোড়াকে চিত্রিত করেন। ঘোড়ার অনুষঙ্গে টেনে আনেন আমাদের যান্ত্রিক জীবন। মানুষের মধ্যে আর যে মানুষটি আছে সেই মানুষটির সরলতা প্রকাশ করার জন্যে ঘোড়াই সম্বল হয় কখনও কখনও। এই শোভন লোভনীয় বোধ জীবনানন্দ 'ঘোড়া' কবিতায় বোঝানোর চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয়। তিনি লিখছেন–

> আমরা যাইনি ম'রে আজো-তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়,
> মাহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে,
> প্রস্তর যুগের সব ঘোড়া যেন এখনও ঘাসের লোভে চরে
> পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর 'পরে।
> আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে একভিড় রাত্রির হাওয়ায়;
> বিষণ্ন খড়ের শব্দ ঝ'রে পড়ে ইস্পাতের কলে,
> চায়ের পেয়ালা ক'টা বেড়ালছানার মতো-ঘুমে-ঘেয়ো
> কুকুরের অস্পষ্ট কবলে
> হিম হয়ে নীড়ে গেল ও পাশের পাইস-রেস্তরাঁতে,

প্যারাফিন লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে;
এইসব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে।[৭]

সন্দেহের জীবনাচরণ আজকের শিল্পী-কবিদের নৈমিত্তিক ঘটনা। শিল্পী, শিল্পীকে প্রতারণা করে, হিংসে করে। প্রেমিকাকে প্রেমিক সন্দেহ করে। প্রেমিকাকে প্রেমিক গণ্ডী বেঁধে দেয়, গণ্ডীর বাইরে গেলে বুঝি লুটেরা রাবণ এসে লুফে নিয়ে যাবে। প্রেমিকাও প্রেমিককে তাই করে। এইভাবে জীবন সংকীর্ণ হয়। সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। আমরা শুধু বিবাহের সূত্রে যে আত্মীয়গুলো হয় তাদের চিনি; আর চিনি নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের মধ্যের মানুষগুলোকে। নামকরা শিল্পী উঠতি শিল্পীকে সাহায্য করার কথা ভুলে যান। বড় কবি কবিতাপ্রেমি পাঠককে প্রশ্রয় দিতে চান না। প্রশ্রয় দিলে বুঝি সে-ও কবি হয়ে যাবে। প্রেমের ঘাটতি রয় বলেই ভালোবাসার মধ্যে একটা ঘোলাটে ব্যাপার আছেই। 'আকাশলীনা' কবিতায় করির স্পষ্ট উচ্চারণ,

সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি,
বোলো নাকো কথা ওই যুবকের সাথে;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা;
নক্ষত্রের রুপালি আগুন ভরা রাতে;
ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার;
দূর থেকে দূরে-আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেয়ো নাকো আর।
কী কথা তাহার সাথে? তার সাথে!
মৃত্তিকার মতো তুমি আজ
তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে।
আকাশের আড়ালে আকাশে
সুরঞ্জনা, তোমার হৃদয় আজ ঘাস;
বাতাসের ওপারে বাতাস
আকাশের ওপারে আকাশ।[৮]

কবির জীবন, শিল্পীর জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে কতিপয় মাথামোটা অর্থবান লোকের জন্যে। কেউ বা বেশি পড়াশোনা শেষে ভাবেন তিনিই বুঝি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হনু। শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় যে শিল্পের মর্মোদ্ধার সম্ভব নয় তা অনেকেই বুঝতে চান না। শিল্পের অন্তরে প্রবেশ করতে হলে নত হাতে হয়। কার কাছে নত? প্রকৃতির কাছে, শিল্পের কাছে, শিল্পীর কাছে। জীবনানন্দ দাশ যা বুঝতেন, যে শিল্প সৃষ্টি করতেন, তা অনেক অধ্যাপক পণ্ডিতেরা বুঝতেন না। বোঝা মানেই তো শব্দের অর্থোদ্ধার নয়। বোঝা মানে উপলব্ধির দরজায় প্রদীপ জ্বালানোর মতা। এই মতা অধিকাংশ অর্থবান-পড়ুয়ার নেই

ব'লেই জীবনানন্দ দাশ যন্ত্রণা প্রকাশ করেছেন 'সমারূঢ়' কবিতায়–

বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা-
বলিলাম স্লান হেসে; ছায়াপিণ্ড দিলো না উত্তর,
বুঝিলাম সে তো কবি নয়- সে যে আরূঢ় ভণিতা :
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের 'পর
ব'সে আছে সিংহাসনে কবি নয় অজর, অর
অধ্যাপক, দাঁত নেই-চোখে তার অক্ষম পিচুটি,
বেতন হাজার টাকামাসে-আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁট;
যদিও সে-সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিল-হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিলো লুটোপুটি।[৯]

একজন চিত্রশিল্পী একজন চাষি। তিনি চাষ করেন মানব জমিন। মানুষের যে চিত্তবৃত্তি, সেই চিত্তবৃত্তির অমোঘ টানে শিল্পী শিল্পকর্ম করেন। যে শিল্পী চিত্তে হাল চালাতে পারেন, হাল ফেরাতে পারেন তিনি যথার্থ শিল্পী। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা যাক। কৃষক চাষ করেন জমি। জমিতে তিনি হাল-লাঙল দেন। লাঙল ঠিকমতো চালাতে না পারলে ভালো চাষ হয় না। শিল্পীও তেমনি, শিল্পের হাল-লাঙল চলনায় পারদর্শী না হলে মানুষের চিত্তজমি কর্ষিত হয় না। সে জমিতে ভালো শিল্পের ফসল হয় না।
কৃষকের বৃত্তি পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এই পাঁচটি বিষয়কে কেন্দ্র করে তার জীবনের বৃত্তটি পরিপূর্ণ হয়। বিষয় পাঁচটি হ'ল–

১. জীবন
২. জমি
৩. চাষ
৪. বীজ এবং
৫. ফসল

জীবনের উৎকর্ষের জন্য কৃষক জমি চাষ করেন, বীজ বোনেন, ফসল ফলান। কবিও তাই করেন, চিত্র শিল্পীও তাই করতে বাধ্য। কৃষক প্রথমে জমি নির্দিষ্ট করেন, কোন জমিতে আজ তিনি কী কাজ করবেন। জমি নির্দিষ্ট হলে তিনি সেখানে গিয়ে আগাছা পরিষ্কার করেন। শুরু হয় চাষ। চাষ শেষে বীজ বোনেন, চারা লাগান। তারপর সেবা শুশ্রূষার পর ফসল ঘরে তোলার পালা। একটি জমিতে নানা ফুল ফোটানোর মতো, কবিরাও একই বিষয় নিয়ে নানাভাবে নানা অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন কবিতায়। ধরে নেই ভালোবাসা একটি বিষয়। এ বিষয় নিয়ে অভিব্যক্তির শেষ নেই, উপলবন্ধিও ফুরায় না। *ফিরে এসো, চাকা* কাব্যের একটি কবিতায় কবি বিনয় মজুমদার ব্যক্ত করলেন,–
ভালোবাসা দিতে পারি, তোমরা কি গ্রহণে সক্ষম?

লীলাময়ী করপুটে তোমাদের সবই ঝ'রে যায়–
হাসি, জ্যোৎস্না, ব্যথা, স্মৃতি, অবশিষ্ট কিছুই থাকে না।
এ আমার অভিজ্ঞতা। পারাবতগুলি জ্যোৎস্নায়
কখনো ওড়ে না; তবু ভালোবাসা দিতে পারি।
শাশ্বত, সহজতম এই দান - শুধু অঙ্কুরের
উদ্গমে বাধা না দেওয়া, নিষ্পেষিত অনালোকে রেখে
ফ্যাকাশে হলুদবর্ণ না ক'রে শ্যামল হতে দেওয়া।
এতই সহজ, তবু বেদনায় নিজ হাতে রাখি
মৃত্যুর প্রস্তর, যাতে কাউকে না ভালোবেসে ফেলে ফেলি।
গ্রহণে সম নও। পারাবত, বৃক্ষচূড়া থেকে
পতন হলেও তুমি আঘাত পাও না, উড়ে যাবে।
প্রাচীন চিত্রের মতো চিরস্থায়ী হাসি নিয়ে তুমি
চ'লে যাবে; ত নিয়ে যন্ত্রণায় স্তব্ধ হব আমি।[১০]

আবার কবি শঙ্খ ঘোষ ভালোবাসার মধ্যে প্রতিহিংসার শর যোজনা করলেন। এই প্রতিহিংসার মধ্যে উত্তাপ আছে, শরীর আছে, আবার আছে মিলিত হওয়ার যথেষ্ট তেজ। 'প্রতিহিংসা' কবিতায় তিনি সে উপলব্ধি প্রকাশ করলেন,

যুবতী কিছু জানে না, শুধু
প্রেমের কথা ব'লে
দেহ আমার সাজিয়েছিল
প্রাচীন বন্ধলে।
আমিও পরিবর্তে তার
রেখেছি সব কথা; শরীর ভরে ঢেলে দিয়েছি
আগুন প্রবণতা।[১১]

বুঝতে বাকি থাকে না, জমি এক অথচ আলাদা আলাদা ফসল। বিষয় এক উপলব্ধি আলাদা, এভাবেই তো একই বিষয়ের বহুমাত্রিকতায় আমরা আপ্লুত হই।

কুম্ভকার মাটি সংগ্রহের জন্যে জমিতে যান। উপযুক্ত মাটি খুঁজে এনে, মাটির পাত্র করার জন্যে মাটিকে উপযোগী করে তোলেন। তারপর চাকার উপর মাটি রেখে শৈল্পিক চক্র ঘূর্ণনে, শিল্পের যাদু স্পর্শে সৃষ্টি হয় সুদর্শন পাত্র-বাহার। অপার মুগ্ধতায়, প্রাণ ঢেলে দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে কুম্ভকারই হয়ে ওঠেন এক একটি মৃৎপাত্র। চিত্রশিল্পীও তাঁর চিত্রের জন্যে জমি খোঁজেন। সেই জমিতে চলে তুলির চাষ, রঙের কর্ষণ। তারপর উপযুক্ত রঙ-বীজ বপন করেন, সুন্দর ফসল হয়ে ওঠে মনোগ্রাহী। ছবি আঁকলেই তো আর তা শিল্পের অঙ্গনে ঠাঁই পায় না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক,–

একজন চিত্রশিল্পী ভাবছেন কাণ্ডজ্ঞানহীন তথাকথিত শিক্ষকের ছবি আঁকবেন। শুরু হলো

কর্মটি। অঙ্কন শেষে তিনি দেখলেন ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত শিক্ষকের হাতে একটি বই। সামনে কিছু ছাত্র-ছাত্রী বেঞ্চিতে বসে আছে। এ দেখে কি কাণ্ডজ্ঞানহীন শিক্ষককে বোঝা যাবে? না, যাবে না। কী উপায়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন শিক্ষকের ছবি আঁকতে হবে, যা তিনি ভেবে পাচ্ছেন না। তিনি গভীর ভাবনায় ডুবে গেলেন। শুরু হলো ভাবনার চাষ। বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর, ঐ একই বিষয়ের ওপর নতুন আর একটি শিল্প কর্ম সৃষ্টি করলেন। এটিতে শিক্ষকের দেহ তৈরি হয়েছে ফাঁপা পাইপ দিয়ে। অবিকল বোঝা যাচ্ছে একটা চোঙা দিয়ে সৃষ্টি শিক্ষকের শরীরের চিত্র। পুস্তক হস্তে, সামনে উপবিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী।

এভাবেই তো শিল্পী-কবি প্রতিনিয়ত চাষের কর্মে কৃষক সেজে থাকেন। চাষ প্রক্রিয়া সঠিক না হলে উন্নত ফসল ফলে না কখনো। একই সাধনায় চিত্র ও কবিতার সম্পর্কযুক্ত আনন্দধারা বয়ে চলে জগৎ জুড়ে। কবি হয়ে যান শিল্পী, শিল্পী হয়ে ওঠেন যথার্থ কী?।

তথ্যসূত্র :

১. প্রেমেন্দ্র মিত্র; 'আমি কবি যত কামারের'; 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা'; দে'জ পাবলিশিং; ষষ্ঠ সংস্করণ: মাঘ, ১৪০৭; কলকাতা; পৃষ্ঠা-২৫
২. প্রেমেন্দ্র মিত্র; 'আমি কবি যত কামারের'; ''প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা'; দে'জ পাবলিশিং; ষষ্ঠ সংস্করণ: মাঘ, ১৪০৭; কলকাতা; পৃষ্ঠা-২৫
৩. বুদ্ধদেব বসু; 'মোহমুক্ত'; 'কবিতাসংগ্রহ (প্রথম খণ্ড); (সম্পা) নরেশ গুহ; দে'জ পাবলিশিং; দ্বিতীয় সংস্করণ : পৌষ, ১৪০০; কলকাতা; পৃষ্ঠা-৫৩
৪. বুদ্ধদেব বসু; 'মোহমুক্ত'; 'কবিতাসংগ্রহ (প্রথম খণ্ড); (সম্পা) নরেশ গুহ; দে'জ পাবলিশিং; দ্বিতীয় সংস্করণ : পৌষ, ১৪০০; কলকাতা; পৃষ্ঠা-৫৩
৫. বুদ্ধদেব বসু; 'নিজের কবিতার প্রতি কাব্যের তিন নম্বর কবিতা'; 'কবিতাসংগ্রহ (প্রথম খন্ড); (সম্পা) নরেশ গুহ; দে'জ পাবলিশিং; দ্বিতীয় সংস্করণ: পৌষ, ১৪০০; কলকাতা; পৃষ্ঠা-২৬২
৬. জীবনানন্দ দাশ; 'রাত্রি'; 'সাতটি তারার তিমির'; 'জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ'; (সম্পা) দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়; ভারবি; প্রথম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ: আশ্বিন, ১৪০৩; কলকাতা; পৃষ্ঠা-২৩২
৭. জীবনানন্দ দাশ; 'ঘোড়া'; 'সাতটি তারার তিমির'; 'জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ'; (সম্পা) দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়; ভারবি; প্রথম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ: আশ্বিন, ১৪০৩; কলকাতা; পৃষ্ঠা-২২৩
৮. জীবনানন্দ দাশ; 'আকাশলীনা'; 'সাতটি তারার তিমির'; 'জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ'; (সম্পা) দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়; ভারবি; প্রথম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ: আশ্বিন, ১৪০৩; কলকাতা; পৃষ্ঠা-২২৩
৯. জীবনানন্দ দাশ; 'সমারূঢ়'; 'সাতটি তারার তিমির'; 'জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ'; (সম্পা) দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়; ভারবি; প্রথম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ: আশ্বিন, ১৪০৩; কলকাতা; পৃষ্ঠা-২২৪
১০. বিনয় মজুমদার; '১৮মে ১৯৬২'; 'ফিরে এসো, চাকা'; অরুণা প্রকাশনী; চতুর্থ মুদ্রণ: শ্রাবণ, ১৪১১; কলকাতা; পৃষ্ঠা-৪৬
১১. শঙ্খ ঘোষ; 'প্রতিহিংসা'; 'শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা'; দে'জ পাবলিশিং; দ্বাবিংশ সংস্করণ: এপ্রিল, ২০১৯; কলকাতা; পৃষ্ঠা ৪৩

এনইউবি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা
(Peer-Reviewed Journal)
ISSN : 2710-4451
বাংলা বিভাগ
নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২২

গীতাঞ্জলি (১৯১০) রবীন্দ্র কাব্যসত্তার মানসভূমি

আল মাকসুদ*

সার-সংক্ষেপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা কবিতায় সর্ববিচারেই একজন সর্বগুণনিধি কবি। তাঁর কাব্যসত্তার সমগ্রতাকে স্পর্শ করে আছে *গীতাঞ্জলি* (১৯১০)। তাঁর মানসপ্রবণতাকে ঈশ্বর যেভাবে গড়েছিলেন তাতে মরমি সুরের আভাস বারবার স্পষ্ট হয়েছে। এ বোধ তাঁর শিল্পচৈতন্যের শেষলগ্নে এসেও চেতন-অবচেতনে ম্লান হয়নি একটুও। তিনি শেষ অব্দি ধ্যানমগ্ন ঈশ্বরপ্রেমী কবি হিসেবেই নিজেকে চিহ্নিত করেছেন। এখানে তিনি নিঃসঙ্গ একাচারী এক ব্যর্থতারহিত স্বর্গমর্ত্যপিয়াসী আকুল ঋষি। বাংলা গীতাঞ্জলি কবির একান্ত ভাবনার, আত্মনিবেদনের কাব্য–সর্বোপরি আধ্যাত্মিক রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরাশ্রীয় হয়ে ওঠার কবিতাগ্রন্থ এবং পরবর্তী কাব্যচেতনার মনোভূমির পূর্বাপর স্মারক হিসেবেও চিহ্নিত গীতাঞ্জলি কাব্য, এই সত্যের উন্মোচন এখানে বিধৃত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য অভিযাত্রায় যখন *গীতাঞ্জলি* সংযুক্ত হয়, তখন কবির বয়স ঊনপঞ্চাশ। পরিণত বয়স। এবং রবীন্দ্র কাব্যসাধনার মধ্যস্তর (১৯০১-১৯১৪)। কবিতাগ্রন্থ হিসেবে চব্বিশতম। এ কাব্যে কবি ভূমিকার শিরোনাম দিলেন 'বিজ্ঞাপন'। এটিও রবীন্দ্রভাবনার নিত্য চমকের চিহ্নমাত্র। বিজ্ঞাপনের ভাষাটা ছিল এমন :

> 'এই গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি গান পূর্বে অন্য দুই-একটি পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে যে-সমস্ত গান পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য থাকা সম্ভবপর মনে করিয়া তাহাদের সকলগুলোই এই পুস্ত কে একত্রে বাহির করা হইল।' (২০১১ : খণ্ড-৬, ১১)।

* সহকারী অধ্যাপক (বাংলা), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

*গীতাঞ্জলি*তে গ্রন্থিত হয়েছে ১৫৭টি কবিতাগান। *গীতাঞ্জলি*কে কবি যেমন গানের বা গীতিকা সংকলন বলেও কবিতাগ্রন্থের বাইরে বিবেচনা করেননি, তেমনি রবীন্দ্রসমালোচকরাও কেউ-ই এটিকে কবিতাগ্রন্থ ভিন্ন অন্য কিছু অভিধা দেননি। তবে গান ও কবিতা একই বিষয় কি না তা নিয়ে বিতর্ক আছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন : '[...] কবিতা ও সংগীতে আর কোনো তফাৎ নাই, কেবল ইহা ভাবপ্রকাশের একটা উপায়, উহা ভাবপ্রকাশের আর-একটা উপায় মাত্র।' (২০১২ : খ. ১৫, ৭৭)। বাংলা কবিতার উৎস বিচারে রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য হয়ে ওঠেন একইসঙ্গে আধুনিক ও রোমান্টিক কবি হিসেবে। কারণ তো ওই একটাই–মাইকেল পরবর্তী বাংলা কবিতাকে অধুনামুখী করার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই সার্থক রূপকার। এই সার্থকতার পেছনে যে কাব্যবোধ সঞ্চরমান ছিল তাকে খুঁজে বের করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। বিশ্বপাঠের পাশাপাশি প্রাচ্যের ঔপনিষদ পাঠও তাঁকে কবি করে তুলেছে। সেখানে যেটি উল্লেখ করার বিষয়। তা হলো ক্রমবিবর্তন। এই বিবর্তন তাঁর আধুনিক মননশাসিত জীবনবোধের কারণে ঘটেছে। কবি স্বয়ং ছিলেন নিজের কবিতার সমালোচক। প্রায় প্রতিটি কবিতাগ্রন্থের ভূমিকায় আত্মচিন্তা ও কাব্যপ্রকৌশল পরিবর্তনের কথা বলেছেন। *সন্ধ্যাসংগীত* (১৮৮২) থেকে *মানসী* (১৮৯০) পর্যন্ত কবির উচ্চারিত শব্দের যে বিবর্তন তাতে অনুকরণ প্রিয়তা পরিহার করে স্বকীয় ভাবপ্রকাশে স্বোপার্জিত একজন হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। এখানে যে সত্যটি উন্মোচিত হয় তাকে বলতে পারি কবিত্বশক্তির অন্তঃপ্রেরণা ও স্বতন্ত্রমুখী অভিযাত্রায় কবির আত্মবিশ্বাস। কবির কথা :

> আমাদের পরিবারের বন্ধু কবি বিহারীলালকে ছেলেবেলা থেকে জানতুম এবং তাঁর কবিতার প্রতি অনুরাগ আমার ছিল অভ্যস্ত। তাঁর প্রবর্তিত কবিতার রীতি ইতিপূর্বেই আমার রচনা থেকে সম্পূর্ণ স্খলিত হয়ে গিয়েছিল। বড়োদাদার স্বপ্নপ্রয়াণের আমি ছিলুম অত্যন্ত ভক্ত, কিন্তু তাঁর বিশেষ কবিপ্রকৃতির সঙ্গে বোধ হয় মিল ছিল না, সেইজন্য ভালো লাগা সত্ত্বেও তাঁর প্রভাব আমার কবিতা গ্রহণ করতে পারেনি। (২০১২: খ. ১, ১৫৯)।

রবীন্দ্রনাথের ক্রমগতিকে চিহ্নিত করতে গেলে এটুকু পাওয়া যায়– 'এই-যে জগৎ মাঝে হেরি আমি,/ মহাশক্তি জগতের স্বামী,/ এ কি তোমার অনুগ্রহ?/ হে বিধাতা কহো মোরে কহো। (অনুগ্রহ, সন্ধ্যাসঙ্গীত)। যদিও এই অনুগ্রহ তিনি চাননি। এই কবিতাতেই বলেছেন, 'হে দেবতা, অনুগ্রহ হতে/ রক্ষা করো অভাগা কবিরে, [...] (প্রাগুক্ত)'। ২১ বছর বয়সে কবির যে জিজ্ঞাসা মহাশক্তিধরের কাছে ছিল– তা ৮০ বছর বয়সে এসে প্রকাশ পেয়েছে এভাবে– 'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে/ সে পায় তোমার হাতে/ শান্তির অক্ষয় অধিকার'। (হায়াৎ মামুদ, ২০১১ : ৮০)। ছলনাময়ী স্রষ্টার ছলনাকে

সইতে পারার মাঝেই রয়েছে ঈশ্বরভক্তির পরম প্রাপ্তি। তা না হলে 'শান্তির অক্ষয় অধিকার' থেকে বঞ্চিত হতে হয়।। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্ভবত 'শান্তির অক্ষয় অধিকার' থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাননি। আর মধ্য বয়সে (৪৯ বছর বয়সে) লিখেছিলেন? 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার/ চরণধুলার তলে।/ সকল অহংকার হে আমার/ ডুবাও চোখের জলে।' (১, গীতাঞ্জলি)। বয়সের এই তিন পর্যায়ে কবির বিস্তর পরিবর্তন পরিবর্ধন পরিযোজন হয়েছে। কিন্তু মূল চিন্তনবিন্দু নড়চড় হয়নি খুব একটা। তা হলো প্রবল ঈশ্বরের কাছে আত্মজিজ্ঞাসা ও সমর্পন। এ ক্ষেত্রে *গীতাঞ্জলির* সুর ও বাণীর সঙ্গে অপরাপর কাব্যের মিল-অমিল উভয়ই লক্ষ করার মতো।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বখ্যাতির প্রকাশ্য স্মারক Gitanjali (Song Offerings)'র ১০৩টি কবিতা (গান)-এর মাঝে ৫৩টিই হচ্ছে *গীতাঞ্জলি* থেকে সংকলিত। এখানেও বাংলা *গীতাঞ্জলি* বিষয়ে কবির ব্যক্তিক পক্ষপাতিত্ব চোখে পড়ার মতো। সঙ্গীতকেই তিনি বিশ্বদরবারে উপস্থাপনের যোগ্য ভাবলেন। এখানে একই সঙ্গে যুক্ত হলো কবির প্রবল ঈশ্বরবিশ্বাস। যদিও এ বিশ্বাসকে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন:

'[...[ঈশ্বরের সঙ্গে কবির সম্পর্কটা একান্তই ব্যক্তিগত; তাতে আস্থা, আশা, নিবেদন, ভক্তি, এমনকি সংশয়ও রয়েছে। ঈশ্বর কখনো নিকটজন, কখনো তিনি উপস্থিতি, কখনো-বা অভিজ্ঞতা।' (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ২০১৬ : ২২২)।

তিনি প্রাচ্যের একজন অনড় বিশ্বাসী ও মরমি কবি হিসেবেও নিজেকে পাশ্চাত্যের সে সময়ের অস্থির মানুষের কাছে স্বস্তির বার্তা নিয়ে উপস্থাপিত হলেন। সুইডিশ একাডেমির দানপত্রে লেখা ছিল : finest poemes of an idealistic tendency। আদর্শবাদিতা নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রচেতনার শুরু ও শেষ কথা। এটি যদি হয় এক ধরনের রক্ষণশীলতা তাতেও ক্ষতি নেই। কারণ রবীন্দ্রনাথ যে অধ্যাত্মবোধকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধারণ করেছেন তাতে যে বিশ্বাসের সুর স্বনিত হয়– তা অনেকটাই ঈশ্বরবিশ্বাসী রক্ষণশীল প্রাচ্য ঋষিরই কথা। বাংলা *গীতাঞ্জলি* থেকে যে ৫৩টি গান তিনি Song Offerings-এ সংযুক্ত করেন, সেটিও তাঁর শুদ্ধচিন্তার ও ঐশ্বরিক ভাবচেতনারই প্রতিধ্বনি। গানই বস্তুত কবির অর্ন্তজাত অভিব্যক্তির নির্যাস এবং গানই কবিতা। অন্যদিকে এটিও সত্য, এ কাব্যে লোক ও লোকান্তরের সমন্বিত রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। বেগম আকতার কামাল যেভাবে বলেছেন : 'তাঁর *গীতাঞ্জলি* একইসঙ্গে *উপনিষদ*-প্রাণিত ও কৃষিসংস্কৃতির লোকায়ত ঐতিহ্য-সম্ভূত সৃষ্টি'। (২০১৯ : ১৪)।

বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের যে সব কবিতায় গীতিময়তা প্রাধান্য পেয়েছে– তাতে গন্ধ শুঁকার বা ঘ্রাণ আস্বাদের অপরিমেয় আনন্দটা পাওয়া সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। *গীতাঞ্জলি* তেমনই ঘ্রাণ আস্বাদনের আবেদনগ্রাহী একটি কাব্য। এমন বিষয়বোধকে বিবেচনায়

রেখেই সম্ভবত সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন :

> রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিবেচনার অন্য একটি উপায় হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের অপরিমিত গানের সম্ভারকে তার কবিতার সঙ্গে সম্পর্কিত করে পরীক্ষা করা। সুরে এবং শব্দে তাঁর গানগুলির মধ্যে তিনি তাঁর কবি-হৃদয়কে যেভাবে উন্মোচিত করেছিলেন অন্য কোনও সৃষ্টির মধ্যে তিনি নিজেকে সেভাবে উন্মোচিত করেন নি। [...] (সৈয়দ আলী আহসান, ১৯৯১ : ০৮)

শ্রী প্রমথনাথ বিশি কিন্তু অন্য কথা বলেন। ইংরেজি *গীতাঞ্জলি* চয়নিকাগ্রন্থ; আর বাংলা *গীতাঞ্জলি* রবীন্দ্রপ্রতিভার উপশাখা। তিনি বলেন : '*গীতাঞ্জলি* সম্বন্ধে আমি নীরব। তার কারণ আমি রবীন্দ্রপ্রতিভার মূলধারার পরিচয় দিতে বসিয়াছি, উপশাখার পরিচয় দিতে বসি নাই; তেমন উপশাখা রবীন্দ্রপ্রতিভায় প্রচুর [...]' (প্রমথনাথ বিশি, ১৪২১ : ৩)

খুব সঙ্গত কথা। *গীতাঞ্জলি* যদি উপশাখা হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও সঙ্গীত নিয়ে যে ভাবনা আমৃত্যু ক্রিয়াশীল ছিল– তা অনেকটাই ফিকে হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ কি সত্যিই *গীতাঞ্জলির* ভাবচেতনার নিরত্যয় বাসনা থেকে বেরোতে পেরেছিলেন অথবা বেরোতে চেয়েছিলেন আমি বোধ করি না। '[...] কইতে কী চাই, কইতে কথা বাধে;/ হার মেনে যে পরান আমার কাঁদে;/ আমায় তুমি ফেলেছ কোন্ ফাঁদে/ চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি!'। (২২, গীতাঞ্জলি)। এই যে রাবীন্দ্রিক ভাবকল্প, এখানেও কি রবীন্দ্রনাথ আত্মসমর্পণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ জানেন তিনি মূলত সুরের জালেই আবদ্ধ। এই মেলোডি রবীন্দ্রকাব্যের মূল সুর– যা তিনি গীতাঞ্জলিতে উপুড় করে দিয়েছেন। এই কাব্যের হৃদয়াস্থান নিয়ে রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ আবু সয়ীদ আইয়ুবের একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি স্মরণ করি :

> 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি' (যা ভাবের গভীর ঐক্যে একই কাব্যগ্রন্থ, তার তিন খণ্ডের তিনটে স্বতন্ত্র নাম আলোচনার পক্ষে অসুবিধাজনক, অতঃপর বর্তমান লেখাতে সাধারণভাবে গীতাঞ্জলি বলতে তিনখানা বই-ই বোঝাবে) স্পষ্টতই ঈশ্বরপ্রেমের কবিতা বা গান। এর অধিকাংশ গান শুনে আমি মুগ্ধ হই, এমন-কি সুর বাদ দিয়ে শুধু কবিতারূপে পাঠ করলেও আমার মন গভীরভাবে সাড়া দেয়। প্রেমের অভিজ্ঞতা আমার নেই এমন কথা বলবো না। কিন্তু ঈশ্বর-বিষয়ক যে-কোনো প্রকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমি বঞ্চিত। শব্দ (authority) প্রমাণ হিসেবে আমার কাছে একেবারে অগ্রাহ্য, শুধু অগ্রাহ্য নয়, অশ্রদ্ধেয়। এবং দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তার পথে-বিপথে যতো এগিয়েছি, ঈশ্বরে বিশ্বাস আমার ততোই ক্ষীণ হয়েছে; অবশেষে আজ প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে পৌঁছে বাল্যকালের পরম আশ্রয়দাতা, পরম কল্যাণময়, অনন্ত শক্তিধর, সকল দুঃখতাপহর কোনো বিশ্ববিধান কর্তাকে তো আর কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ যে ব্যক্তিস্বরূপ ঈশ্বরকে গ্রহণ করতে আমার মনের প্রতিটি কক্ষে প্রবল প্রতিরোধ, সেই ঈশ্বরপ্রেমে আদ্যোপান্ত অনুরঞ্জিত কাব্যকে হৃদয়ে স্থান দিতে একটুও বাধে না। (আবু সয়ীদ আইয়ুব, ২০১৩ : ৫৬)।

হ্যাঁ, এখানে হয়তো কবিতার বা কাব্যের শিল্পমূল্যের কথা উহ্য; কিন্তু এটা তো সত্য? কাব্যের বিষয়বস্তুর প্রতি তাঁর দুর্বলতা অকপটভাবে স্বীকৃত এখানে। কবির ঈশ্বর বিশ্বাস যদি *গীতাঞ্জলি*কে রবীন্দ্রকাব্য সৃষ্টির উপশাখা করে তোলে, তাহলে রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গানকে রবীন্দ্রচেতনার মৌলবিশ্বাস থেকে বাদ দিতে হয়; যা কখানোই কাম্যও নয়, সম্ভবও নয়। এ প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি :

> আর গান। সেও তাঁর আর-এক অক্ষর নির্ভরতা। একবার অনতিবয়সী এক মাস্টারমশাই তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি নিশ্চয় যে ঈশ্বর আছেন? রবীন্দ্রনাথ বললেন, না, তবে নতুন কোনো গানের সুর যখন প্রাণে লাগে তাঁকে টের পাই। "গান যখন সম্পূর্ণ জাগে মনের মধ্যে, তখন চিত্ত অমরাবতীতে গিয়ে পৌঁছায়"। শেষ বয়সে লিখেছেন অমিয়চন্দ্রকে, "এখন দুটো পাকা ঠিকানা পেয়েছি আমার বান প্রস্থের, গান আর ছবি।" (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, ২০১৬ : ৬২)।

রবীন্দ্রপ্রতিভায় ইংরেজি *গীতাঞ্জলি* চয়নিকাগ্রন্থ তাতে কোনো সংশয় নেই; কিন্তু বাংলা *গীতাঞ্জলি* উপশাখা এমন মন্তব্যে দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ থেকে যায়।
এবং আমি মনে করি *গীতাঞ্জলি*'র কবিতা নিয়ে আলোচনার পূর্বাহ্নে *গীতাঞ্জলি* প্রকাশের সময়কে চিনে নেওয়া উচিত। এতে কবির অভীপ্সাকে অনুধাবনযোগ্য করে তোলা যাবে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সেই সময়টাকে একটি নিজস্ব সংবীক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রকাশের চেষ্টা করতে গিয়ে সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যকে পাঁচটি ভাগে চিহ্নিত করেছেন– যা তুলনামূলকভাবে সুগ্রাহ্য। তা হলো :

> ১. উচ্ছ্বাস-যুগ ২. প্রকৃতি-মানব-রস-শিল্প-যুগ ৩. ভগদ্বরসলীলা-যুগ ৪. কাব্য-দর্শন-তত্ত্ব-যুগ ৫. ঔপনিষদিক যুগ বা আত্মোপলব্ধি-যুগ (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ১৪২২ : ৮৬-৮৭)। এবং এই চিহ্নায়নকাল পর্বের তৃতীয় পর্ব হলো গীতাঞ্জলি'র সময়। এ সময়কে শ্রী ভট্টাচার্য মূল্যায়ন করেছেন এভাবে :
> ৩. ভগদ্বরসলীলা-যুগ : 'নৈবেদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া 'খেয়া'র মধ্য দিয়া 'গীতালি' পর্যন্ত এই যুগটি প্রসারিত হইয়াছে। এইটি কবির সহিত ভগবানের অতীন্দ্রিয় লীলার যুগ। এখানে প্রকৃতি ও মানব পিছনে পড়িয়াছে, কবি ভগবানের বিচিত্র অনুভূতিকেই তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তু করিয়াছেন। (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ১৪২২ : ৮৬)

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে পারি :

ক. আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে। (১, গীতাঞ্জলি)

খ. প্রভু, তোমার লাগি আঁখি জাগে;
দেখা না পাই

পথ চাই,
সেও মনে ভালো লাগে। (২৮, গীতাঞ্জলি)

গ. এই করেছ ভালো, নিঠুর,
এই করেছ ভালো।
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো। (৯১, গীতাঞ্জলি)

ঘ. যা পেয়েছি, যা হয়েছি
যা-কিছু মোর আশা।
না জেনে ধায় তোমার পানে
সকল ভালোবাসা।
মিলন হবে তোমার সাথে,
একটি শুভ দৃষ্টিপাতে,
জীবনবধূ হবে তোমার
নিত্য অনুগতা;
মরণ আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা। (১১৬, গীতাঞ্জলি)

রবীন্দ্রনাথের শেষ উপলব্ধি ছিল– 'আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন' (১১, শেষ লেখা)। কেন একটি অপরিমেয় সৃষ্টিশীল জীবন শেষ লগ্নে এসে জীবনকে দুঃখের তপস্যা বলেন? কারণ তিনি জানেন, এক অবিনশ্বর সত্তার চরণে নিজেকে নিবেদিত প্রাণের দুঃখ সাধনা ছাড়া আর কী থাকতে পারে? রবীন্দ্রনাথ কোনো অরগ্যানিক টোটালিটি বা জৈবিক সমগ্রতাকে প্রাধান্য দেননি। তিনি দিয়েছেন মর্মের ভেতরে বাস করা চেতন-অবচেতন মনে জাগরূক অন্য কোনো এক জৈবসত্তাকে। আবার তার কোনো আকার দেয়া কঠিন। কারণ কবি দেখেছেন চেষ্টার আত্ম-আশ্রিত গোপন সাধনার মধ্য দিয়ে এই সত্যকে– যা পূর্বে একবার উল্লেখ করেছি। 'কইতে কী চাই, কইতে কথা বাধে;/হার মেনে যে পরান আমার কাঁদে/ আমায় তুমি ফেলেছ কোন ফাঁদে/ চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি! (১১, গীতাঞ্জলি)। উচ্ছ্বাস নেই, প্রাবল্য নেই, ধীর মন্থর অথচ কী তীব্র, কী তীক্ষ্ণ মর্ম বেদনায় যেন তিনি বলে যেতে চান তাঁর স্বচেতনার নির্বন্ধ কথাগুলো। যুক্তির মারপ্যাঁচ নেই, সরল অভিব্যক্তিতে ভাবকল্পনার অতীন্দ্রিয় ভুবনে চলে যান তিনি।
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে রবীন্দ্রকাব্যের দ্বিতীয় পর্যায় 'প্রকৃতি-মানব-রস-শিল্প-যুগ'। যেখানে আমরা পাই ভিন্ন এক রবীন্দ্রনাথকে। এ পর্বের উল্লেখযোগ্য তিনটি কাব্য যথাক্রমে *মানসী* (১৮৯০), *সোনার তরী* (১৮৯৪), *ক্ষণিকা* (১৯০০)। এখানে কবি

প্রেমিক এবং প্রকৃতিমুগ্ধ দার্শনিক। কিন্তু কবির জীবনচিন্তার আড়ালে বাস করা অধরা ঈশ্বরের সাধনা এখানেও প্রচ্ছন্ন নয়, প্রকটই বলা যায়। *মানসী*'র 'সংশয়ের আবেগ' কবিতায় বলেন– 'বাসনার তীব্র জ্বালা দূর হয়ে যাবে,/ যাবে অভিমান–/হৃদয়দেবতা হবে, করিব চরণে/ পুষ্প-অর্ঘ্য দান'। আর, সোনার তরী'র 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় বলেন– 'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে/ হে সুন্দরী?/ বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।/ যখনই শুধাই, ওগো বিদেশিনী,/ তুমি হাস শুধু মধুরহাসিনী–/ বুঝিতে না পারি, কী জানি কী আছে/ তোমার মনে।' প্রশ্ন হচ্ছে– কে এই 'হৃদয়দেবতা'? কে এই 'সুন্দরী-মধুরহাসিনী'? কবির প্রেমিকা? জীবনদেবতা? নাকি জীবনের মধ্যগগনে এসে গীতাঞ্জলিতে বিধৃত কবির আত্মসমর্পিত বাণীর এই শাশ্বতসত্তাই তার সব? 'যা দিয়েছ আমার এ প্রাণ ভরি/ খেদ রবে না এখন যদি মরি।/ রজনীদিন কত দুঃখে সুখে/ কত যে সুর বেজেছে এই বুকে,/ কত বেশে আমার ঘরে ঢুকে/ কত রূপে নিয়েছ মন হরি,/ খেদ রবে না এখন যদি মরি' (১৩৯, গীতাঞ্জলি)।' কিংবা 'যাবার দিনে এই কথাটি/ বলে যেন যাই?/ যা দেখেছি যা পেয়েছি/ তুলনা তার নাই'। (১৪২, গীতাঞ্জলি)। অথবা 'তোমার দয়া যদি/ চাহিতে নাও জানি/ তবুও দয়া করে/ চরণে নিয়ো টানি'। (১৪৬, গীতাঞ্জলি)। এটা খুবই স্পষ্ট রবীন্দ্রনাথ নিজেকে আড়াল করতে চেয়েও আড়াল করতে পারেননি; কারণ তিনি এক অবিনশ্বর সত্তার ধ্যান থেকে নিজেকে কখনো মুক্ত করতে সক্ষম হননি। বলাবাহুল্য, তাঁর এই না পারা কিংবা অধরাধ্যান তাঁর কাব্যসাধনার মূলসূত্র আবিষ্কারের প্রেক্ষণকণা।

আমরা যদি তাঁর পরবর্তী কাব্যসৃজন সরণির দিকে দৃষ্টি দেই, তাহলে দেখব। এক *বলাকা* (১৯১৬) ছাড়া *গীতাঞ্জলি* থেকে জন্মদিনে (১৯৪১) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বাঁক বদলে খুব একটা বৈচিত্র্যময় ফারাক নেই। তবে হ্যাঁ, *পুনশ্চ* (১৯৩২) *শ্যামলী* (১৯৩৬)তে কবিতার বিষয় ও প্রাকরণিক ভঙ্গির নতুন ফর্ম আমরা লক্ষ করি, কিন্তু রাবীন্দ্রিক গন্তব্য সেটা নয়। বরং, *স্মরণ, পূরবী, রোগশয্যায়, জন্মদিনে, শেষলেখা* ইত্যাদি কাব্যে কবির ভাবোচ্ছ্বাস আর গতির ধরণ প্রায় এক। যার সঙ্গে *গীতাঞ্জলি*'র ভাবচেতনার মিল পাওয়া যায়। এ সময়ের রচনাকে নিয়ে বক্তব্য হচ্ছে :

> জীবনের শেষ বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪০ অব্দের মাঝামাঝি হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কয়েক মাসে এইগুলি রচিত হয়। এই খানে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনার ও তাঁহার ধর্মবোধের শেষ অবদান, তাঁহার শেষ কথা, তাঁহার চরম ও পরম উপলব্ধির বাণী। (অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, ১৪২৪ : ১১৭)।

এ ভাবচেতনার আন্তঃঐক্যের মৌল কারণ একটি সুস্থির মোহনার দিকে অগ্রসরমান চৈতন্যের অবিচল রবীন্দ্রনাথের বৈশ্বিক *সোনারতরীর* দর্শনঋদ্ধ মাঝি হয়ে ওঠার দুর্মর

বাসনা। হয়তোবা এখানে তিনি মহাজাগতিক শাশ্বত সৌন্দর্যের প্রকাশ্য পূজারিই শুধু নন, একজন একনিষ্ঠ সাধক; যার অনুধ্যানে কবিতা গানের সুরে ঝংকৃত হয়ে ধ্যেয় কারো কাছে সতত ধাবমান। রবীন্দ্রনাথ তো বহু পরিক্রমার মধ্য দিয়ে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায়মান দীর্ঘশ্বাস নিয়ে এগিয়ে গেছেন। তাঁর থেমে যাওয়ার প্রবণতা ছিল না– ছিল অবিরাম সম্মুখগামী হওয়ার সুতীব্র বাসনা। এটাকে লক্ষ্যমুখী অভিযাত্রাও বলতে পারি। এখানে কবি নিরাসক্ত আবার পুনঃপুন রূপান্তরিত হওয়ার মায়াবাদী চেতনায় আচ্ছন্ন। এই অধ্যাত্মবোধ থেকে কবি বেরিয়ে আসতে পারেননি কখানো। বরং জীবনের শেষ প্রান্তে কবির আকুতি ছিল এমন : '[...] মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া/ হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার'। (২০১২ : খ- ১৩, ১১৫)। কিন্তু গীতাঞ্জলিতে কবির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের ভাষা চিত্রায়িত হয়েছে এভাবে : '[...] দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে/ নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,/ দুঃখে যেন করিতে পারি জয়'(৪, গীতাঞ্জলি)। কিংবা 'অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে/ নির্মল করো উজ্জ্বল করো,/ সুন্দর করো হে'। (৫, গীতাঞ্জলি)।

গীতাঞ্জলি যদি না লিখতেন রবীন্দ্রনাথ? তাহলে রবীন্দ্রমানসের ধ্রুবতা আর ঐশ্বরিক ভাবনা প্রতীচ্য পাঠক দূরের কথা, প্রাচ্য পাঠকের কাছেও উন্মোচিত হতো কি না সন্দেহ। সুরের বৈভবে রবীন্দ্রনাথের যে অভিগমন তাতে *গীতাঞ্জলি* হয়ে ওঠে পরিণত বয়সের পরিণত কথামালা। 'পরবর্তী সৃষ্টিকাজে *গীতাঞ্জলির* অন্তঃপুর যেমন কিছুটা উন্মোচিত তেমনি ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে তাঁর মৌলভাবকল্পগুলোর বিমূর্ততা থেকে বাস্তবে সুকঠিন সত্যে পরীক্ষিত ও মূর্ত হওয়ার কথকতা'। (বেগম আকতার কামাল, ২০১৪ : ৯৬)। এ প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান সৈয়দের মত :

> [...] গীতাঞ্জলি সম্পর্কে বাঙালি পাঠকের একটু উন্নাসিকতা আছে। তাঁরা মনে করেন, নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত এই বই রবীন্দ্রনাথের যথার্থ প্রতিভূ নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের কোনো একটি বইকে তাঁর প্রতিভূ-রচনা বলা চলে? চলে না। আমার বিবেচেনায়, গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রকাব্যধারার শ্রেষ্ঠ বই। যেমন : মানসী, সোনার তরী, খেয়া, বলাকা বা ক্ষণিকা। আর এই মহান কাব্যগ্রন্থের উৎস তাঁর ব্যক্তিজীবনের বিপর্যয়ের দিনগুলি। (২০১১ : ৪৭)।

বলাবাহুল্য, আবদুল মান্নান সৈয়দ যে *গীতাঞ্জলির* কথা এখানে উল্লেখ করেছেন, তা ইংরেজি *গীতাঞ্জলি*। কিন্তু সেটি তো ঋদ্ধ মূলত ১৯১০ সালে প্রকাশিত বাংলা *গীতাঞ্জলির* কবিতা দ্বারাই। *গীতাঞ্জলি* সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু'র (১৯০৮-১৯৭৪) মূল্যায়ন :

> [...] গীতাঞ্জলি'র সবগুলি রচনা পরস্পর সম্পর্ক-সম্পৃক্ত, একই প্রেরণা ও মনোভাব থেকে সঞ্জাত; এই তন্ময় সংলাপকে ব্যহত করে না কোনো নীতিকথা অথবা

> কৌতুক-রচনা। অনেকগুলি সমান্তর পথ অবশেষে এখানে এসে মিলিত হ'লো : প্রকৃতি ও মানবজীবন, নারী ও কবিতা। স্বদেশ, দুঃখ, মৃত্যু ও ভগবান–এই সব সূত্র, যা এতকাল বিচ্ছিন্ন অথবা আংশিকভাবে মুক্ত অবস্থায় দেখা দিয়েছে, তার সম্পূর্ণ সমন্বয় ঘটলো, একবার এবং শেষবারের মতো, 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি'র কাব্যপর্যায়ে। তিনটি নাম, কিন্তু একটিই কাব্য, বক্তব্যে ও শৈলীতে অভিন্ন, পরস্পর পরিপূরক ও সমর্থক। (বুদ্ধদেব বসু, ২০১৮ : ৭১)।

বলতে পারি *শ্যামলী* (১৯৩৬) কাব্যের 'আমি' কবিতায় কবির ইচ্ছায় প্রিজম্যাটিক বিন্যাসে ফুটে ওঠার রূপকল্পটিকে ঐশ্বরিক চেতনার প্রতিবিম্ব। 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ/ চুনি উঠল রাঙা হয়ে।/ আমি চোখ মেললুম আকাশে,/ জ্বলে উঠল আলো/ পুবে পশ্চিমে।/ গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'–/ সুন্দর হল সে।' কেননা কবির 'আমি' মূলত কে?তা তিনি এ কবিতাতেই ব্যক্ত করেছেন : '[...] ও দিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা/ মানুষের সীমানায়,/ তাকেই বলি 'আমি'। (আমি, শ্যামলী)। কবির এই আত্মপ্রতীতির মানসভূমি *গীতাঞ্জলি*তে খোঁজে পাওয়া যায়? '[...] কেমন খেলা হল আমার/আজি তোমার সনে।/ পেয়েছি কি খুঁজে বেড়াই/ ভেবে না পাই মনে।/ আনন্দ আজ কিসের ছলে/ কাঁদিতে চায় নয়নজলে,/ বিরহ আজ মধুর হয়ে/ করেছে প্রাণ ভোর। (৪২, গীতাঞ্জলি)।

১৩১৭ সালের ২৬ শ্রাবণে লেখা *গীতাঞ্জলি*'র শেষ কবিতার অব্যবহিত পূর্ব কবিতায় (১৫৬ সংখ্যক কবিতা) যেভাবে কবির শেষ অনভূতি প্রকাশ পেয়েছে, সেখানে রবীন্দ্রবিভা পূর্ণতা পেয়েছে :

> শেষের মধ্যে অশেষ আছে,
> এই কথাটি, মনে
> আজকে আমার গানের শেষে
> জাগছে ক্ষণে ক্ষণে। [...]

তিনি শেষের ভেতর অশেষকে কামনা করেছেন?কারণ তিনি জানেন কেউ একজন তাকে অশেষ করেছেন। এবং সেই কেউ তার আপন সত্তা। আত্মপ্রাণের সকল ধ্যানের আরাধ্য প্রিয়তম । *গীতিমাল্যে* তার সুর শুনতে পাই :

> আমারে তুমি অশেষ করেছ
> এমনি লীলা তব।
> ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছে
> জীবন নব নব। [...] (২০১১ : খ.-৬, ১২৩)।

আবার জীবনের শেষ উচ্চারণ :

> [...] অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে

> সে পায় তোমার হাতে
> শান্তির অক্ষয় অধিকার। (হায়াৎ মামুদ ২০১১ : ৮০)

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত নিয়ে রবীন্দ্রনাথের *গীতাঞ্জলি*'র বোধ-বাসনার যে প্রভাব পাওয়া যায়, তাতে মনে করি, রবীন্দ্রনাথ *গীতাঞ্জলি*তে যে আনন্দরস ও কাব্যধ্যানকে উচ্চকিত করেছেন তাই-ই মূলত ঋষি রবীন্দ্রনাথের কাছে কবিতার বিস্তীর্ণ ক্যানভাসে জিয়নকাঠি হিসেবে কাজ করেছে আমৃত্যু।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যবিচারে বাংলা *গীতাঞ্জলি* ঘুরেফিরে আসবেই। এতে কোনো সংশয় তৈরি হয় না এবং এখানে ঋষি ও কবি রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতার্থে নিত্য বিরাজমান। বলা অসংগত নয় তাঁর ঋষিত্বকে তিনি জীবনভর উপভোগ করেছেন, অন্যরা তাঁর ঋষিত্বকে সম্মান দেখিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বলতে হবে রবীন্দ্রনাথের মানসসত্তার আড়ালে যে মানুষটি সদাসক্রিয় ছিলেন তিনি হচ্ছেন, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দৃষ্টান্ত :

> ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থ পর্যটনকারী পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ কৈশোরেই উপনিষদ-দীক্ষা পেয়েছিলেন যা আমৃত্যু তাঁকে প্রাণিত করেছে। উপনিষদের বাণী তাঁর চৈতন্যে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ও ক্রিয়াশীল থেকেছে, তাঁর চিত্তসংকটে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে। (বেগম আকতার কামাল, ২০১৯ : ১১-১২)।

কবিতাই কবির শেষ আশ্রয়, কবিতার মাঝেই কবি তাঁর অধরা স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের তপস্যা করেছেন। তার সত্যতা সপ্রমাণিত হয়, কবির অন্তিম মুহূর্তে কবিতার নানা পঙ্‌ক্তি উচ্চারণ এবং পরবর্তীতে যা তাঁর *শেষ লেখা* (১৯৪১) কাব্যে গ্রন্থিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে অন্তর্দৃষ্টির আলোয় উচ্চকিত ছিলেন তা নিঃসন্দেহে অধ্যাত্মবোধ। এই অধ্যাত্মবোধ থেকে তিনি নিজেকে মৃত্যু অবধি মুক্ত করতে চাননি। বরং সেই বোধ ক্রমশ গাঢ় হয়েছে। তিনি খুঁজতে চেয়েছেন শেষ পরিণাম, নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছেন অবিনশ্বর সত্তার মুগ্ধ পদতলে নিঃসঙ্কোচে, নির্দ্বিধায়; তাঁর উচ্চারণ : '[...] যা-কিছু মোর সঞ্চিত ধন/ এতদিনের সব আয়োজন/ চরম দিনে সাজিয়ে দিব উহারে–/ মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে'। (২০১১ : খ.-৬, ৭৬)। ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই রোগশয্যায় (১৯৪০) এসে : '[...] হে প্রভাতসূর্য, / আপনার শুভ্রতম রূপ/ তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেরিব উজ্জ্বল,/ প্রভাতধ্যানেরে মোর সেই শক্তি দিয়ে / করো আলোকিত;/ দুর্বল প্রাণের দৈন্য / হিরণ্ময় ঐশ্বর্যে তোমার / দূর করে দাও,/ পরাভূত রজনীর অপমান-সহ'। (২০১২ : খ.-১৩, ১৭)। অন্যদিকে?'সেদিন আমার জন্মদিন।/ প্রভাতের প্রণাম লইয়া/ উদয়দিগন্ত-পানে মেলিলাম আঁখি,/ দেখিলাম সদ্যস্নাত ঊষা/ আঁকি দিল আলোকচন্দলেখা/ হিমাদ্রির হিমশুভ্র পেলব ললাটে'। (২০১২ : খ.-১৩,

৬০)। কিংবা 'শুধু সুর, শুধু নৃত্য, বেদনার কলকোলাহল;/ শুধু এ সাঁতার।[...] অজানা সম্মুখে ধায়, কোথা তার শেষ/ কে জানে উদ্দেশ'। (২০১২ : খ.-১৩, ৬৪)। জন্মদিনে প্রভাতের প্রণাম গ্রহণ আর অজানা সম্মুখে ধেয়ে চলা জীবন সংশয়িত মনোভাবের প্রকাশমাত্র। যে কারণে তাঁকে এ কাব্যের তিরিশ বছর আগে লেখা গীতাঞ্জলি (১৯১০)তে বলতে শুনি : 'চাই গো আমি তোমারে চাই/ তোমায় আমি চাই–/এই কথাটি সদাই মনে/ বলতে যেন পাই।/ আর যা কিছু বাসনাতে ঘুরে বেড়াই দিনে রাতে/ মিথ্যা সে-সব মিথ্যা, ওগো/ তোমায় আমি চাই'। (৮৮ গীতাঞ্জলি)। কবি যাকে নিবেদন করে আত্মস্বস্তি অনুভব করেন? সে তো তাঁর পরমসত্তা; 'আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি/ রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী' (১০১ গীতাঞ্জলি) এই-ই রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম উচ্চারণ। এই উচ্চারণদীপ্তি তাঁকে আলো দেয়, দেয় বাঁচার অভিপ্রায়। কিন্তু যখনই খুঁজে না পান কোনো উদ্দেশ? তখনই এটা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক, তাঁর চাওয়া, তাঁর অভিপ্রায় বলা হয়ে গেছে এভাবে–'চাই গো আমি তোমারে চাই।'–এই তোমাকে চাওয়ার মাঝে কবির শক্তি ও ভক্তি উভয়ই বিরাজমান। এটা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বহুক্ষেত্রেই পারম্পর্য রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বিপুল সৃষ্টির স্রষ্টার পক্ষে এটাই হয়তো অনিবার্য নিয়তি। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ কবিতায় বহু বৈচিত্র্যের সম্মেলন ঘটালেও একটি লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন। সেখানে তিনি নির্ভেজাল ঋষি, পরম স্রষ্টার সান্নিধ্যপিয়াসি স্থিতধী মহাপুরুষ। এই ঋষিত্ব তাঁর চেতন-অবচেতন মনে সবসময়ই সক্রিয় ছিল বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথ আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে নিজেরই দ্বারস্থ হয়েছেন। এতে লাভ হয়েছে, উত্তরটা জুতসই হয়েছে। একটি কাব্যে যে প্রশ্ন আছে অন্যকাব্যে অথবা সেই কাব্যেই তার উত্তরও সন্ধান করলে পাওয়া যায়। উপলব্ধির নৈপুণ্য ও বৈচিত্র্য ছিল বলেই তিনি *গীতাঞ্জলি*তে এসে তাঁর সরল অথচ সবচেয়ে আধ্যাত্মিক বাণী নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। কোথাও তাঁকে বাধাগ্রস্ত হতে হয়নি। সমালোচিত হয়েছেন ধর্মপ্রচারক হিসেবেও। তিনি টলে যাননি; সরেও যাননি স্বচিন্তার প্রচার থেকে। পার্থিবতা তাঁকে স্পর্শ করেছে অপার্থিবতাকে ভেতরে স্থান দিয়ে। এখানেই তিনি ভিন্ন হয়ে যান অন্যদের থেকে। তাঁর কাব্যকিরণ নিঃসন্দেহে জীবনবিচ্ছিন্ন ঈশ্বরস্থতি নয়; জীবনকে ঘিরেই জীবনের কথা বারবার ফুটে ওঠেছে; তিনি বিশ্বাস করতেন– 'জীবনে আজো যাহা/ রয়েছে পিছে,/ জানি হে জানি তাও / হয়নি মিছে'। (১৪৭ গীতাঞ্জলি)। তাঁর প্রতীতি এমনই–'শেষের মধ্যে অশেষ আছে,/ এই কথাটি, মনে/ আজকে আমার গানের শেষে/ জাগছে ক্ষণে ক্ষণে' (১৫৬ গীতাঞ্জলি)। শেষের মাঝে অশেষকে খুঁজে পাওয়ার যে আত্মতৃপ্তি, সেটা তাঁর পূর্বাপর কাব্যে সুপরিস্ফুট হয়েছে। এই বিশ্বাসের মন্ত্রপাঠে তাঁর কোনো সংশয় ছিল না, ছিল আকর্ষণ। সেই আকর্ষণে তিনি নিরন্তর ছুটে বেড়িয়েছেন।

এবং বলতে হবে তিনি যেভাবে গন্তব্যে পৌঁছুতে চেয়েছেন তা তিনি তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তিতে ছড়িয়ে দিয়েছেন; এবং ছড়িয়ে দেওয়া সেই পঙ্‌ক্তিগুচ্ছ *গীতাঞ্জলি*'র পরতে পরতে লুকিয়ে আছে *গীতাঞ্জলি*'র উর্বর ভূমিতে দাঁড়িয়েই রবীন্দ্রনাথ আনুপূর্বিক কবি রবীন্দ্রনাথ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় (১৪২৪), কবিগুরু, (রবীন্দ্র-কাব্যের মূলসূত্র), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
২. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৬), সম্পাদিত, আধুনিক কবিতার ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
৩. আনিসুজ্জামান (২০১৬), GITANJALI গীতাঞ্জলি, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা
৪. আবু সয়ীদ আইয়ুব (২০১৩), আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, দি ইউনিভার্সেল একাডেমি, ঢাকা
৫. আবদুল মান্নান সৈয়দ (২০০১), রবীন্দ্রনাথ, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা
৬. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৪২২), রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা
৭. প্রমথনাথ বিশি (১৪২১), রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা
৮. বুদ্ধদেব বসু (২০১৮), কবি রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
৯. বেগম আকতার কামাল (২০১৪), রবীন্দ্রনাথ যেথায় যত আলো, অবসর, ঢাকা
১০. – (২০১৯), রবীন্দ্রকবিতার বাতায়ন, কথাপ্রকাশ, ঢাকা
১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১), খণ্ড–১, রবীন্দ্রসমগ্র, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা
১২. – (২০১১), খণ্ড-৬, রবীন্দ্রসমগ্র, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা
১৩. – (২০১১), খণ্ড-১০, রবীন্দ্রসমগ্র, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা
১৪. – (২০১২), খণ্ড-১৩, রবীন্দ্রসমগ্র, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা
১৫. – (২০১২), খণ্ড-১৫ রবীন্দ্রসমগ্র, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা
১৬. সৈয়দ আলী আহসান (১৯৯১), রবীন্দ্রনাথ কাব্যবিচারের ভূমিকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা
১৭. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০১৬), রবীন্দ্রনাথ কেন জরুরি, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা
১৮. হায়াৎ মামুদ (২০১১), রবীন্দ্রনাথ : কিশোর জীবনী, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

এনইউবি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা
(Peer-Reviewed Journal)
ISSN : 2710-4451
বাংলা বিভাগ
নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২২

নজরুলের কবিতা ও প্রবন্ধ: সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন*

সার-সংক্ষেপ: কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তাঁর দর্শনের ফলে ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্ত হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্রের (ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান) জন্ম হয়। কাব্য তথা সাহিত্যের শক্তি অস্ত্রের চেয়েও বেশি, তা তিনি বৃটিশ রাজ দরবারে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়ে প্রমাণ করেছেন। তিনি সাহিত্য ও রাজনীতির সমন্বয় করে জাতীয় জাগরণের সৃষ্টি করেন। জাগরণের প্রধান শর্ত হলো একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলের মানুষের আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করে তা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করা। কাজী নজরুল ইসলাম সে পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে হিন্দু-মুসলিম বিভাজনকে চিহ্নিত করেছেন। সে বিভাজনকে দূর করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শক্তিকে সহজে পরাজয়ের রাস্তা তিনি তৈরি করেছেন। এ রাস্তাতে রয়েছে তাঁর বিদ্রোহী সত্তা। নজরুলের বিদ্রোহী সত্তার দার্শনিক দিক এ গবেষণা পত্রে আলোকপাত করা হয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ভারতীয় উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের বিরুদ্ধে লড়াকু সৈনিক ছিলেন। তাঁর মানস-প্রকৃতি সংবেদনশীল ও সহজগ্রাহী এবং প্রচণ্ড বোধশক্তি সম্পন্ন। অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার সাহায্যে তিনি যুগধর্মকে গ্রহণ করেছেন এবং যথার্থ প্রতিবিম্ব করেছেন। সমাজ উৎকণ্ঠিত, উৎসাহিত, উজ্জীবিত ও উদ্বেল হয়েছে অধিকার প্রতিষ্ঠার নেশায়। "জাতীয় চেতনার মোহময়ী প্রকাশ বিংশ শতকের প্রথমার্ধে কেবল নজরুল পেরেছিলেন" (খান,২০০০:৯)। প্রাসঙ্গক্রমে মহাকবি গ্যাটে সম্পর্কে আজহারউদ্দীন খানের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য [কেননা] "Goette was the internal life of the nineteenth century. নজরুলের মধ্যেও তেমনি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের জাতীয় আকুতির জীবন্ত আলেখ্য ফুটে উঠেছে" (আজহারউদ্দীন খান, পৌষ ১৩৬৫:১৭৩)।

অতএব, স্বদেশ ও সমাজের প্রতি কবি-সাহিত্যিকদের দায়বদ্ধতার কথা বিবেচনা করলে নজরুল যুগের চরিত্র-ধর্ম, দর্শন, সমাজের অসংগতি উপলব্ধি, পরাধীন সমাজের শাসন-শোষণের রূপ বিচার করে লেখায় বিদ্রোহের রূপ দিয়েছেন। প্রচণ্ড স্বদেশ প্রেমের কারণে ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-বিপ্লবকে আহ্বান করেছেন নির্ভীকভাবে–

"বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদনের পরে নজরুলেরই ছিল সবচেয়ে নাটকীয় জীবন; উজ্জ্বল, উদ্দাম জীবন-নাট্যেও মধ্যপথেই ট্রাজিডির ঘন অন্ধকারও মধুসূদনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। নজরুলের ব্যক্তিত্ব বরাবরই চড়া রঙের বিশেষভাবে পরিদৃশ্যমান" (বিশ্বাস, ২০২১)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সৈনিক জীবন থেকে ফিরে এসে নজরুল দেশ-সমাজ-ধর্ম নিয়ে নানা আঙ্গিকে ভাবতে থাকেন এবং বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এদেশের মানুষের দুর্দশা লাঘবের উপায় নিয়ে ভাবলেন। উনিশ শতকের শেষ দশকে বৃটিশ বিরোধী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটলেও তা সম্প্রদায়িক তথা হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের কারণে ঔপনিবেশিক শক্তিকে আঘাত করতে সক্ষম হয়ে উঠতে পারেনি। সব বিভাজন ও মতকে দূর করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করেন কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতায়।

প্রায় একটি বিষয় নজরুলের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়, যা অনেকটা মিথ হয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠিত মিথটি হলো, নজরুল বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেন তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতার জন্য। কিন্তু এ ধারণাকে সত্য হিসেবে মেনে নিলে নজরুল প্রকৃত বিদ্রোহী সত্তার প্রতি বিচার করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আহমদ রফিকের মূল্যায়ন যথাযথ। তার মতে–

> বস্তুত এইরূপ 'বিদ্রোহী' কবিতার অহমনোধের মুক্তিতেই তার দায় শেষ করেননি, পরিচয় সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং অই গণ্ডি ভেঙে তার যাত্রা একাধিক মাত্রায়। তাই দেখতে পাই, নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা এর একাধিক অনুসত্তার বৈচিত্র্য নিয়ে এক সমন্বিত রূপে পরিস্ফুট। ...নজরুল-মানসে বিদ্রোহের রূপ নানামূখী পথে বিকশিত হওয়া সত্ত্বেও এর প্রধান বিস্ফোরক লক্ষ্য ছিলো স্বদেশে বিদেশী শাসন ও আধিপত্যবাদের অবমান, তা সেই লক্ষ্য যে-পথেই অর্জিত হোক না কেন। সেই সঙ্গে ছিল অহম্-বোধের প্রাচীর-ভাঙ্গা মুক্তি, সামাজিক বৈষম্য ও সম্প্রদায়গত বিভেদের অবসান এবং নারী-স্বাধীনতা ও নারী জাগরণ ইত্যাদি বিষয়" (রফিক, ২০০১:২৩৪)

'বিদ্রোহী' কবিতা বিগত একশত বছরে নানাভাবে মূল্যায়ন হয়েছে এবং এর আবেদন নিয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ প্রতিনিয়ত হচ্ছে। এ গবেষণাপত্রে কাজী নজরুল

* সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজি বিভাগ,
নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ।

ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতায় অসাম্প্রদায়িক চেতনার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ জাতি তৈরি করে বৃটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের রূপরেখা প্রণয়ন ও শতবর্ষ পরেও পৃথিবীর সব শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে নজরুলের বিদ্রোহের প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতা ও প্রবন্ধকে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে যেখানে ঔপনিবেশিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের বিরুদ্ধে অবস্থান ও দর্শন ফুটে উঠেছে। এ যাচাইয়ে উত্তর-উপনিবেশবাদ তত্ত্বের প্রয়োগ করা হয়েছে। উত্তর-উপনিবেশবাদের প্রয়োগের ক্ষেত্রে দু'টি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে গবেষণাপত্রের লক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্তে। প্রশ্নগুলো হচ্ছে: এক, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য তৈরিতে 'বিদ্রোহী' কবিতায় ও প্রবন্ধে তিনি কোন কৌশল অবলম্বন করেছেন?; দুই, উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এ কবিতায় ও প্রবন্ধে আন্দোলনের কৌশল কী ছিল?

এ গবেষণাপত্রটি কোয়ালিটিটিভ রিচার্স। এখানে প্রাথমিক উপাদান হিসাবে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার পাশাপাশি আরো বেশ কয়েকটি কবিতা ('কাণ্ডারি হুঁশিয়ার!', 'রাজা-প্রজা', 'চোর-ডাকাত', 'মানুষ', 'সাম্যবাদী', 'সব্যসাচী', 'প্রলয়োল্লাস', 'রক্তাম্বরধারিনী মা', 'কোরবাণী', 'মহররম', 'কামাল পাশা', 'আগমনী', 'কুলি-মজুর', 'পথের দিশা', 'সব্যসাচী', 'বনগীতা', ও 'জুলফিকার') এবং প্রবন্ধকে ('ছুৎমার্গ', 'ধূমকেতু', 'যুগবাণী', 'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ', 'মন্দি-মসজিদ', 'মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা', 'আমরা লক্ষীছাড়ার দল', ও 'বাঙালির বালা') ব্যবহার করা হয়েছে। 'বিদ্রোহী' কবিতাকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের জন্য এসব কবিতা ও প্রবন্ধ পাশাপাশি (simultaneously) পাঠ করা হয়েছে। কেননা, এসব কবিতা ও প্রবন্ধ 'বিদ্রোহী' কবিতার পরিপূরক। সহায়ক উপাদান হিসেবে নজরুলের সাহিত্য কর্মের ওপর রচিত বই, জার্নাল আর্টিক্যাল, সাহিত্য পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও ব্লগে প্রকাশিত রচনার পাশাপাশি উত্তর-উপনিবেশবাদ বিষয়ক রচনাবলীকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। 'ভূমিকার' পাশাপাশি এ গবেষণাপত্রে 'উপনিবেশবাদ ও উত্তর-উপনিবেশবাদ'-র স্বরূপ, ও এর বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। চূড়ান্তভাবে তাঁর কবিতায় উপনিবেশবাদ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাবিরোধী মনোভাবের বিশ্লেষণ ও শতবর্ষ পরে এর আবেদন তুলে ধরা হয়েছে।

উপনিবেশবাদ ও উত্তর-উপনিবেশবাদ

উত্তর-উপনিবেশবাদী সমালোচনা তত্ত্বটি ১৯৯০-র দশকে সুস্পষ্ট রূপে আবির্ভূত হয়। ১৯৮৭ সালে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্ফিভাকের ইন আদার ওয়ার্ল্ডস, বিল অ্যাস ক্রফট রচিত দ্য এম্পায়ার রাইটস ব্যাক এবং ১৯৯০ সালে হোমি কে ভাবা রচিত ন্যাশন অ্যান্ড

ন্যারেশন ও ১৯৯৩ সালে এডওয়ার্ড সাঈদ রচিত কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম গ্রন্থে উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় (বেরি, ২০১৮:১৮২)। মার্কিন তাত্ত্বিক হেনরী লুই গেঁস জুনিয়র সম্পাদিত 'ক্রিটিকাল ইনকোয়ারি' জার্নালে ১৯৮৬ সালে মুদ্রিত 'রেস, রাইটিং অ্যান্ড ডিফারেন্স' প্রবন্ধটি এ সংক্রান্ত তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু সবকিছুর মূলে রয়েছে এডওয়ার্ড সাঈদের ওরিয়েন্টালিমজ। "১৯৬১ সালে প্রকাশিত ফ্রাঁন্জৎ ফেননের দ্য রিচিড অব দ্য আর্থ উত্তর-উপনিবেশবাদীদের পূর্বসূরি ধরা যায়" (বেরী, ২০১৮:১৮৩)।

ফেনন যুক্তি দেখান উপনিবেশাধীন জনগোষ্ঠীর প্রথমেই যা করা উচিত তা হচ্ছে তাদের অতীত নিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠা। কারণ শত শত বছর ধরে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা যে দেশটিকে উপনিবেশ করে তারা তার অতীত ঐতিহ্যকে অবমূল্যায়ন করে বা মনে করে দেশটির কোনো উল্লেখযোগ্য ইতিহাসই ছিল না, তারা ছিল বর্বর, অসভ্য। ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দেশের সব বর্ণের শিশুরাই এই শেখে যে, তাদের দেশের সংস্কৃতির যাত্রা শুরু ইউরোপীয়দের আগমনের পর থেকেই। ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্বে তাদের সংস্কৃতি, প্রগতি বলতে কিছুই ছিল না। তাই উত্তর-উপনিবেশবাদের পদক্ষেপ যদি হয় উপনিবেশাধীন দেশগুলোর অতীত সংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা দাবি তাহলে তার দ্বিতীয় পদক্ষেপটি হবে, উপনিবেশ যুগে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতি বিমুখ হওয়া, উপনিবেশাধীন দেশটির অতীত ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ ঘটানো, যে ঐতিহ্যকে উপনিবেশবাদীরা তাচ্ছিল্যে এড়িয়ে গেছে।

ঔপনিবেশবাদেও স্বরূপ নির্ণয় করে বদরুদ্দিন উমর বললেন,

> শ্রেণি বিভক্ত সমাজে যেখানেই সংখ্যালঘু সম্পত্তি মালিকরা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে, সেখানেই সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসিত মানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তারা সাংস্কৃতিক আধিপত্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। ...শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে সংস্কৃতিকে যতই সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা হোক, এই বলপ্রয়োগের ক্ষমতা যদি শাসক শ্রেণির না থাকে তাহলে তারা শাসনের অযোগ্য হয়। শাসন ক্ষমতা থেকে তারা উচ্ছেদ হয়ে যায়। এ কারণে বল প্রয়োগকারী সংগঠন পুলিশ, সামরিক বাহিনী ইত্যাদি সশস্ত্র শক্তি শাসক শ্রেণী ও রাষ্ট্রের এক অপরিহার্য অঙ্গ। (উমর, ২০১৪:১০)

আর সাঈদ উল্লেখ করেন, "[ঔপনিবেশিকরা] উপনিবেশিত অঞ্চলের মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তার, পুর্নগঠন এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব করে" (সাঈদ, ১৯৭৮:২৩)। অন্যদিকে গুহমজুমদারের উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য–

> ঔপনিবেশিকরা যে সব দেশে তাদের উপনিবেশ গড়েছিল সেই দেশে একচ্ছত্র ক্ষমতার দাপটে নিজেদের ভাষাকেও উপনিবেশিত মানুষকে গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। ফলে ঔপনিবেশিকের ভাষা হয়ে উঠল উপনিবেবেশের ক্ষমতার ভাষা।

> এই নিয়মেই ইংরাজি ভাষা ইংরেজদের উপনিবেশের মানুষের মধ্যে প্রচারিত হয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে ইংরাজিতে লেখা বইয়ের পাঠকও তৈরি হলো ইংরেজির উপনিবেশগুলোতে। এটাই বোধ হয় মন এবং মননকে উপনিবেশিত করার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। (গুহমজুমদার, ২০০৭:১২৭)

'বিদ্রোহী' কবিতা গণমানুষের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল সমসাময়িককালে। 'বিদ্রোহী' প্রকাশের পরবর্তী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "তরুণ সমাজ তো বিদ্রোহীর ভাষায় বাক্যালাপ শুরু করে দিল। সকলের মধ্যে সেই মনোভব- আপনারে ছাড়া কাহারে করিনা কুর্নিশ" (উদ্ধৃতি হাসান, ১৯৯৭:৬)। এমন বাক্যবানে রাজশক্তি আতঙ্কিত হয়ে গেল। কেননা, এতদিনের মসৃণ রাস্তা কন্টকাকীর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু 'বিদ্রোহী'কে নিষিদ্ধ করার সুযোগ পায়নি। এ প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মূল্যায়ন উদ্ধৃতিযোগ্য। তাঁর মতে–

> এ কবিতায় হিন্দু-মুসলমান দু'জনেরই এত পুরাণ-প্রসঙ্গ ঢুকেছে যে ব্রিটিশ সরকার সরাসরি একে রাজদ্রোহ বলে চিহ্নিত করতে পারল না। কখনো ঈষাণ-বিষাণের ওঙ্কার বাজছে, কখনো বা ইস্রাফিলের শিঙা থেকে উঠেছে রণ হুঙ্কার। কখনো বা হাতে নিয়েছে, মহাদেবের ডমরু–ত্রিশূল, কখনো বা আর্ফিয়াসের বাঁশি। কখনো বাসুকীর ফণা জাপটে ধরেছে। কখনো বা জিব্রাইলের আগুনের পাখা, কখনো চড়েছে "তাজি বোররা"কে (পক্ষীরাজ ঘোড়া) কখনো বা উচ্চৈঃশ্রাবায়। একে রাজদ্রোহ বলতে গেলে ধর্মের ওপর হাত দেওয়া হবে। (সেনগুপ্ত, ২০০০:১১৯)

সে সময়ে তাঁর কবিতাকে নিষিদ্ধ করতে না পারলেও রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয় 'ধূমকেতু' পত্রিকায় 'আনন্দময়ী আগমনে' লেখার অপরাধে। ১৯২২ সালে নিষিদ্ধ করা হয় তাঁর কবিতা। এ কবিতায় ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসকদের অসুর ও দানব হিসেবে চিহ্নিত করে 'দনুজ দলনী' দেবীকে আহ্বান করা হয়েছে পরিত্রাতারূপে।

ফরাসি বিপ্লব থেকে শুরু করে রুশ বিপ্লব সবখানে সাহিত্যিকদের ভূমিক প্রশংসনীয়। অথচ, বৃটিশ-ভারতে কাব্য তথা সাহিত্য সাধনার মূল লক্ষ ছিল তিনটি: এক, পাঠক চিত্তে আনন্দ দেওয়া; দুই, শাসকগোষ্ঠীকে তোষামোদ করা; তিন, নিজস্ব সংস্কৃতির কথা তুলে ধরা। কিন্তু জাতীয় জাগরণে কাব্য সাধনা ভূমিকা রাখতে পারে তা নজরুল উপলব্ধি করেছিলেন এবং তিনি পৃথিবীর সব ঐতিহাসিক সফল বিপ্লব সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা লাভ করেছিলেন এবং তা নিজের কবিতায় প্রতিফলিত করেছেন। ফলে সাহিত্যে রাজনীতি ও দেশাত্ববোধের ব্যবহার করে জাতীয় জাগরণ তথা জাতীয়তাবাদের পথে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। তাঁর এ চেতনা অনেক রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর চেতনায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বলেছেন, "আমরা যখন যুদ্ধে যাবো– তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন

কারাগারে যাবো, তখনও তাঁর গান গাইবো" (বসু, ২০০১:৫৪; ভৌমিক, ১৯৯৩:৪৭)। বলা হয়ে থাকে, ফরাসি বিপ্লবের অর্ধেক অবদান সে-দেশের কবি-লেখক বুদ্ধিজীবীদের। তারা যে ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন গণমানুষের ওপর, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, নজরুলের মধ্যেও দেখা যায় একই গুণের সমাবেশ।

বিষয়ে ও প্রকরণে সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমিতে নজরলের বিদ্রোহী প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে পরিস্ফুট, এবং এমন ধ্বনি-গম্ভীর যে অসতর্ক পাঠকেরও চিত্ত স্পর্শ করে, প্রাণে ঝংকার তোলে। বিদ্রোহের এই দৃশ্যময়, ধ্বনিময়, ও আবেগময় প্রকাশের কারণেই বাংলা সাহিত্যে একমাত্র নজরুলই 'বিদ্রোহী' কবি রূপে চিহ্নিত; এবং বাংলা সাহিত্যেও মহীরুহ পেরিয়েই বিদ্রোহের মর্যাদায় অভিষিক্ত। ডক্টর সুশীল কুমার গুপ্তের মতে, নজরুলের বিদ্রোহের উৎস মানবপ্রেম। তাঁর মতে–

> নজরুলের বিদ্রোহের উৎস তাঁর সুগভীর ও প্রত্যয়োজ্জ্বল মানবপ্রেম। তাই মানুষের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই বৈষম্য ও অসংগতি তাকে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়েছে। তিনি এইসব বৈষম্য ও অসংগতির স্রষ্টাদের [ইংরেজ দখলদার] বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। ...তার বিদ্রোহের মূলে স্বভাবগত অকৃত্রিম মানবপ্রেম এবং সে প্রেমের প্রকাশ তার অন্তরের নির্দেশনানুসারে। (গুপ্ত,২০১৫: ১৪৩-৪)

মানবপ্রেমের পাশাপাশি "তীব্র স্বদেশপ্রেমই সেখানে প্রধান, এবং নিয়ামক উপকরণ, যদিও এর প্রকাশ বিভিন্ন চেহারায়। এদেশে বিদেশী শাসনের প্রতি সুতীব্র ঘৃণা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ তার স্বদেশপ্রেমেরই নামান্তর, যা আবার সাধারণ সূত্র হিসাবে সর্বপ্রকার অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করেছে" (রফিক, ২০০১:২৪৩)। কারণ দেশের দারিদ্র, সর্বপ্রকার নির্যাতন-নিপীড়ন, সামাজিক বৈষম্য ইত্যাদি সবকিছুই তো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের পরিণাম। এমনকি সাম্প্রদায়িক বিভেদ বৈষম্যও। এসবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যেমন স্বাদেশিকতার পটভূমিতে ধৃত, তেমনি আবার স্বাদেশিকতার প্রয়োজনেই আহ্বান জানাতে হয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এবং যৌথ সংগ্রামের। তাঁর বিদ্রোহের সুর আরো পরিস্কার হয় অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁকে লেখা একটি চিঠিতে। তিনি স্পষ্ট করে লিখেছেন– "বিদ্রোহী'র জয়তিলক আমার ললাটে অক্ষয় হয়ে গেল আমার তরুণ বন্ধুদের ভালবাসায়। ...আমি বিদ্রোহ করেছি–বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচরের বিরুদ্ধে–যা মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন, পচা– সেই মিথ্যা-সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভণ্ডামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে।" (নজরুল ইসলাম, ২০০৭:৪৮৭)

নজরুল 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল' প্রবন্ধে তাঁর বিদ্রোহের স্বরূপ উল্লেখ করে বললেন–

> মহামারী, মারীভর, ধ্বংস আমাদের উল্লাস। রক্ত আমাদের তিলক, রৌদ্র আমাদের করুণা। এরই মাঝে আমাদের নবসৃষ্টির অভিনব তপস্যা শুরু হবে। এস আমার সূর্যতাপস তরুণের দল। সান্ধ্য-শ্মশান আর গোরস্থান আমাদের সান্ধ্য-সম্মিলনী, আলেয়া আমাদের সন্ধ্যা-প্রদীপ, মড়াকান্না আর পেচক শিবাদিরব আমাদের মঙ্গল হুলুধ্বনি। মরীচিকা আমাদের লক্ষ্য, আঘাত আমাদের আদর, মার আমাদের সোহাগ। সর্বনাশ আমাদের স্নেহ, বজ্র-মার আমাদের আলিঙ্গন। উল্কা আমাদের মালা-খসা ফুল, সাইকোন আমাদের প্রিয়ার এলোকেশ। সূর্যকুণ্ড আমাদের স্নানাগার, অনন্ত নরক-কুঞ্জ। এই অমঙ্গল অভিশাপ আর শনির জ্বালানো রুদ্র-তপস্যার প্রভাবে সকল নরকাগ্নি ফুল হয়ে ফুটে উঠবে, যেমন 'ইবরাহীমের' পরশে 'নমরুদের জাহান্নাম ফুল হয়ে হেসে উঠেছিল'। এস আমার অভিনব তরুণ তপস্বার দল। তোমাদের ধ্বংসের আহবান করছি। এস। (ইসলাম, ১৯৬৬:৬৭০-১)

নজরুলের এ ধরনের উক্তি একই সঙ্গে ধ্বংসের নেশায় মাতাল মন ও নব-সৃষ্টির সংকল্পে উদ্দীপ্ত চিত্তের স্বাক্ষর বহন করে। তাই তিনি 'মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা'য় উল্লেখ করলেন–

> স্বরাজ মানে কী? স্বরাজ মানে, নিজেই রাজা বা সবাই রাজা; আমি কারুর অধীন নই, আমরা কারুর সিংহাসন বা পতাকাতলে আসীন নই। এই বাণী যদি বুক ফুলিয়ে কোনো ভয়কে পরোয়া না করে মুক্ত কণ্ঠে বলতে পার, তবেই তোমরা স্বরাজ লাভ করবে, স্বাধীন হবে, নিজেকে নিজের রাজা বলতে পারবে, নৈলে নয়।
> কিন্তু, আসল প্রশ্ন এই, 'আমার রাজা আমি'–বাণী বলবার সাহস আছে কোন বিদ্রোহীর? তার সোজা উত্তর-যে বীর কারুর অধীন নয়, বাইরে ভেতরে যে কারুর দাস নয়, সম্পূর্ণ উদার, মুক্ত! যার এমন কোন গুরু বা বিধাতা নেই যাকে ভয় বা ভক্তি করে সে নিজের সত্যকে ফাকি দেয়, শুধু সে-ই সত্য স্বাধীন। এই অহম্-জ্ঞান আত্মজ্ঞান–অহংকার নয়, এ হচ্ছে, আপনার ওপর অটল বিরাট বিশ্বাস। ...আপনাকে চেন। বিদ্রোহের মত বিদ্রোহ যদি করতে পার, প্রলয় যদি আনতে পার তবে নিদ্রিত শিব জাগবেই, কল্যাণ আসবেই। লাথির মত লাথি মারতে পার, তা হ'লে ভগবানও তা বুকে করে রাখে। ভৃগুর মত বিদ্রোহী হও, ভগবানও তোমার পায়ের ধূলো নেবে। কাউকে মেনো না। কোনো ভয়ে ভীত হয়ো না বিদ্রোহী। ছুটাও অশ্ব, চালাও রথ, হানো অগ্নিবাণ, বাজাও দামামা-দুন্দুতি। বল, যে যায় যাক সে, আমি আছি,। বল, আমিই নতুন করে জগৎ সৃষ্টি কর। (ইসলাম, ১৯৬৬:৬৭২-৩)

১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে বাংলার পতনের পর হিন্দুরা অনেক ক্ষেত্রেই বিদেশি শক্তির আনুকল্য লাভ করেছিল এবং কোম্পানির লোকজন ও হিন্দুরা মুসলিমদের সবক্ষেত্রে একঘরে করার ক্ষেত্র তৈরি করেছিল। কিন্তু শতবর্ষ পরে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে বাঙালি-হিন্দু মুসলিম সমাজ নিজেদের পার্থক্যকে ভুলে সর্বভারতীয় আধিপত্যবাদ থেকে বৃটিশদের তাড়াতে প্রায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এক্ষেত্রে শতবর্ষে ধর্মীয়

বিভেদকে ভুলে যায় এবং পুরানো সম্পর্ক স্থাপনে মনোযোগী হয়। আবুল আসাদের মতে, 'উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষে হিন্দু-মুসলিম সমঝোতা ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের এক সুযোগ সৃষ্টি হয়। ...১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের পর বৃটিশ বিরোধী উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে হিন্দু ও মুসলমানরা অনেকখানি কাছে এসেছিল। এরপরই পটভূমিতে মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনকে হিন্দু জনগণও সমর্থন করলো' (আসাদ, ২০১৬:৫)।

হাকীম আজমল ও ডক্টর আনসারী প্রমুখ নেতারা সর্বভারতীয় এবং শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ও মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর নেতৃত্বে বাংলায় খেলাফত আন্দোলন হয়। ১৯১৯ সারের ২৩ নভেম্বর খেলাফত আন্দোলনের প্রথম সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন গান্ধী অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে গান্ধীর নেতৃত্বে একই বছর অসহযোগ আন্দোলন হয়। বিশেষ করে 'রাওলাত আইন' পাস হলে আন্দোলনের মাত্রা আরো বেড়ে যায় এবং এক পর্যায়ে 'জালিয়ানওলাবাগ হত্যাকাণ্ড' সংঘটিত হয়। পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের লালসা বৃটিশ ভীষণভাবে লালায়িত হয়ে এমন হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল (জালিয়ানওলাবাগ হত্যাকাণ্ড)।

নিপীড়িত, নিঃগৃহীত মানুষের অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম বা বিপ্লবই প্রধান হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃত। এ বিপ্লব সংগঠনে যুগে যুগে এগিয়ে এসেছেন কিছু চেতনাদীপ্ত মানুষ, শোষণের মর্মজ্বালা যাদের অন্তরে শেলের মতো গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। এমন ব্যক্তিদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম অন্যতম। তিনি তৎকালীন বৃটিশ নিপীড়ন থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য লেখনীর মাধ্যমে ডাক দিয়েছিলেন। এ ডাক দেওয়ার পূর্বে তিনি–

> ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব, আয়াল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম, তুরস্কে কামাল পাশার নেতৃত্বে নবজাগরণ, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, ১৯১৯ সালের রাউলাত আইন, ১৯১৯ সালের মন্টেও চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার রিপোর্ট, ১৯১৯ সালের জালিয়ানওলাবাগ হত্যকাণ্ড, ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলন, ১৯২২ সালের আইন অমান্য আন্দোলন, ১৯২৫ সালের দক্ষিণেশ্বর বোমা কারখানার খবর, ১৯২৯-এ ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি, ১৯৩০-এ সুর্যসেনের নেতৃত্বে সশ্রস্ত্র বিদ্রোহ ইত্যাদি রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ নজরুলের বিদ্রোহীসত্তাকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করে (মুখার্জী, ২০১৯)।

১৯২০ সালে হিজরত আন্দোলনও সংগঠিত হয় ভারতবর্ষে। এ আন্দোলনে হাজার হাজার মুসলমান অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে আফগান চলে যান। এ ঘটনা নজরুল মানসে দারুণভাবে আঘাত করে। এ সব আন্দোলন নজরুলের কাছে আপসকামিতা মনে হয়েছে। তিনি এসব আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা তথা উপনিবেশবাদ থেকে মুক্তির

কোনো পথ খুঁজে পাননি। ফলে, বিদ্রোহ ও বিপ্লবী চেতনা নিয়ে 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা করলেন রাজনৈতিক নেতাদের ভুল পথকে দেখিয়ে দিতে এবং সাধারণ জনগণকে ধর্মীয় বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে অংশগ্রহণে প্রস্তুত করার আশায়।

জাতি যখন ভোগের লিপ্সায় আকুল কিংবা আপসবাদিতায় মগ্ন, তখন আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ জাতির আত্মোপলিব্ধির ডাক দিলেন নজরুল, যেমন কবিতায় তেমনি গদ্য রচনায় 'নবযুগ' ও 'ধূমকেতু'র অনলবর্ষী লেখায়। আহ্বান জানালেন দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার। তাঁর মতে, "জোর জবরদস্তি করিয়া কি কখনো সচেতন জাগ্রত জনসংযোগ চুপ করানো যায়" (ইসলাম, ২০০৭:৩৭৫) এবং "ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজটরাজ বুঝি না, ...। ভারবর্ষেও এক পরমানূ অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে।...পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে" (নজরুল, ২০০৭: ৩৭২-৪)।

তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য তারুন্যের জাগরণকে প্রাধাণ্য দিলেন এবং আহবান জানালেন–

> ওঠ আমার নির্জীব ঘুমন্ত পতাকাবাহী বীর সৈনিক দল। ওঠো তোমাদের ডাক পড়েছে -- রণদুন্দুভি রণভেরী বেজে উঠেছে। তোমার বিজয় নিশান তুলে ধর। ...পুড়িয়ে ফেল ঐ প্রাসাদের উপর যে নিশান বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের উপর প্রভুত্ব ঘোষণা করছে। ভেঙ্গে ফেল ঐ প্রাসাদের শ্রঙ্গ... বল আমরা স্বাধীন।
> আমাদের বিজয় পতাকা তুলে ধরবার জন্য এসো সৈনিক। পতাকার রং হবে লাল, তাকে রং করতে হবে খুন দিয়ে। (নজরুল, ২০০৭:৪২৭)

স্বদেশের মুক্তি আন্দোলনের সপক্ষে নজরুলের বিদ্রোহ এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই উল্লিখিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে এবং প্রয়োজনে যুক্ত হয়েছে সংকীর্ণ সম্প্রদায় চেতনার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ। এখানে কবি যেন তাঁর সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত সকল ক্ষেত্রেই হিন্দু-মুসলিম বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে বৃটিশ আধিপত্যবাদকে শক্তিশালী করার জন্য ইংরেজরা "বিভাজন ও শাসন" নীতি গ্রহণ করে (আমীন, ২০১৮)। পরবর্তী সময়ে এ নীতির কারণে শাসকগোষ্ঠী 'আমরা' ও 'তোমরা' পরিচয়ে বিভক্ত করে ফেলে। রামনাথ বিশ্বাস ও কাজী নজরুল ইসলাম "খোলা মনে 'অপর'-কে দেখেছেন তাই 'অপর' সম্পর্কে কখনও কোনো তির্যক মন্তব্য করেননি। ... নিজে উপনিবেশের প্রজা হওয়ার সুবাদে অন্য উপনিবেশের প্রজাদের সঙ্গে আত্মীতার সম্পর্ক অনুভব করেছেন। উপনিবেশিত দেশগুলো সম্পর্কে

ইউরোপীয় বয়ান তাঁদের কাছে কখনও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি" (গুহমজুমদার, ২০০৭:১৩০)।

"তিনি [নজরুল] বুঝেছিলেন দেশের উপেক্ষিত জনগোষ্ঠীসহ সবাইকে এক আদর্শে সমবেত করা না গেলে ভারতবাসীর আদৌ মুক্তি ঘটবে না। তাই মুক্তির আদর্শের পথে এগিয়ে আসার জন্য তিনি হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্রসহ সব শেণি-পেশার মানুষকে অন্তর থেকে মনুষ্যত্বের আলো জ্বালিয়ে একই কাতারে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।" (মুখার্জী, ২০১৮)। নজরুল 'ছুৎমার্গ' প্রবন্ধে বলেছেন–

> হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার ঐ মহাগগনতলের সীমাহারা মুক্তির মাঝে দাঁড়াইয়া মানব-তোমার কণ্ঠে সেই আদিম বাণী ফুটাও দেখি, আমরা মানুষ ধর্ম'। দেখিবে, দশদিকে সার্বভৌম সাড়ার আকুল স্পন্দন কাঁদিয়া উঠিতেছে। মানবতার এই মহাযুগে একবার গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বল যে তুমি ব্রাহ্মণ নও, শুদ্র নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ-তুমি সত্য। (ইসলাম, ২০০৭:৩৯১)

এই মানবতার শক্তির জাগরণের অসামান্য কাব্যরূপ তাঁর 'বিদ্রোহী'। এখানে রণকান্ত বিদ্রোহী তখনই বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে বললেন–

> আমি বেদুইন, আমি চেঙ্গিস,
> আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।
> আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
> আমি ইস্রাফিলের সিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,
> আমি পিণাকপাণির ডমর ত্রিশূল, ধর্মারাজের দণ্ড,
> আমি চক্র ও মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড! (ইসলাম, ২০০৭:৯)

এ বিদ্রোহ কেবল রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শের বিষয় নয়। ধর্মীয় সম্প্রীতির মাধ্যমে জাতীয় জাগরণ তৈরি আবশ্যক। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই হিন্দু-মুসলিম বিরোধ মিটিয়ে এক দেশ দর্শন ও সৃষ্টির সবাই মানুষ তত্ত্বে ঐক্যবদ্ধ হলেই মুক্তি মিলবে। চলমান বিপ্লব মুসলমানদের খেলাফত আন্দোলন ও হিন্দুদের অসহযোগ আন্দোলন বিভক্তিকে আরো পাকাপোক্ত করেছে বলেই–

> নজরুল উপমহাদেশের আপাত-বিরোধী ধর্মীয় বিভক্তি–ভুলে গিয়ে সবাইকে একাত্ম হবার আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হয়। তিনি মর্ম দিয়ে উপলব্দি করেছিলেন, মানবধর্ম, মানবপ্রেম-এর বোধ ভারতবাসীর মনে জাগ্রত করতে হবে। সনাতন ধর্ম কেবল দুই জাতের মানুষের মধ্যে অনৈক্যের দেয়াল তুলে রাখবে–আর ভারতবাসীর মধ্যে বিভক্তি থাকলে তা ঔপনিবেশিক শক্তির দূর্গকে কেবল মজবুতই করবে–কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা আসবে না। নজরুলের এই অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে তাঁর স্বাধীনতা রোধেরই একটি সম্প্রসারিত রূপ হিসেবে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে, সম্পূর্ণ মনন ও মানসে, চিন্তা ও ধ্যানে, আবেগে ও বাস্তবতায় তিনি

ছিলেন চির অসাম্প্রদায়িক। তবে সবার উপরে দরকার ভারতবাসীর স্বাধীনতা। (খান, ২০০০:১১)

তাই নজরুল ধর্মীয় বিভেদ ভুলে লাঞ্ছিত মানুষকে জাগিয়ে তুলতে 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার!' কবিতায় জিজ্ঞাস করেন–

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ!
'হিন্দু না এরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী! বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র! (ইসলাম, ২০০৭:১২২)

একই কবিতায় তিনি রক্তগঙ্গায় প্রাণ হরানো মানুষের আহাজারিকে তুলে ধরেন এবং সবাইকে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আহ্বান জানান। তিনি এ লড়াইয়ে ভারতীয়দের বিজয় সুনিশ্চিত বলে দাবী করেন এবং বললেন–

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশির প্রান্তর,
বাঙালির খুনে লাল হলো যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর!
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার। (ইসলাম, ২০০৭:১২৩)

এ ধর্মের নাম করেই সমাজে উঁচু-নিচু শ্রেণি তৈরি করে বিভাজনকে পাকাপোক্ত করে ইংরেজরা শোষণ চালানোর কৌশল অবলম্বন করেছিল। সে জাল নজরুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং ধর্ম ও রাজনীতির বিভাজনকে এক জায়গায় আনার পথ তৈরি করে বেশ কয়েকটি কবিতা রচনা করেছিলেন জাতীয় জাগরণের জন্য। তাঁর 'রাজা-প্রজা' কবিতায় তিনি বললেন–

সাম্যের গান গাই
যেখানে আসিয়া সম-বেদনার সকলে হয়েছি ভাই।
এ প্রশ্ন অতি সোজা,
এক ধরণরি সন্তান কেন কেউ রাজা, কেউ প্রজা?
অদ্ভুত দর্শন-
এই সোজা কথা বলি যদি ভাই, হবে তাহা সিডিশন।
প্রজা হয় শুধু রাজ বিদ্রোহী, কিন্তু কাহারে কহি,
অন্যায় করে কেন হয় নাকো রাজাও প্রজাদ্রোহী!
... ...
দেড়শত কোটি মানুষের ঘাড়ে-চড়ে দেড়শত চোর।
এ আশা মোদের দুরাশাও নয়, সেদিন সুদূরও নয়-
সমবেত রাজ-কণ্ঠে যেদিন শুনব প্রজার জয়! (ইসলাম, ২০০৭:৯১-৩)

উপনিবেশিক শাসনের অন্যতম হাতিয়ার উপনিবেশিত মানুষের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা

রটিয়ে দেয়া এবং অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপন করা। ফলে, উপনিবেশিত জাতি হীনমন্যতায় ভোগে। এক্ষেত্রেও নজরুল ষড়যন্ত্রকে চিহ্নিত করে নিপীড়িত মানুষকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললেন–

কে তোমায় বলে ডাকাত বন্ধু, কে তোমায় চোর বলে?
চারিদিকে বাজে ডাকাতি ডঙ্কা, চোরেরি রাজা চলে!
...
কে বলে তোমায় ডাকাত, বন্ধু কে করিছ চুরি?
চুরি করিয়াছ টাকা ঘটি বাটি, হৃদয়ে হানেনি ছুরি!
ইহাদের মতো অমানুষ নহে, হতে পারো তস্কর,
মানুষ দেখিলে বাল্মীকি হও তোমরা রত্নাকার। (ইসলাম, ২০০৭:৮৫-৬)

ধর্মীয় বিভাজন কত ভয়ানক হতে পারে, তা উপনিবেশিত মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে দীর্ঘকাল ইংরেজ শোষণের ফলে। সে বিভাজন মানুষকে কেবল বিভাজনের পথে রেখে বৃটিশ শাসনের পথকে সুগম করেছে এবং নিজেদের মধ্যে ধর্মের নামে দাঙ্গা সৃষ্টি করে বুভুক্ষু জাতিতে পরিণত করেছে। তাই হিন্দু-মুসলিম বিভাজনকে বিদ্রূপ করে নজরুল মানুষের জয়গান গাইতে হলে কী প্রয়োজন তা 'মানুষ' কবিতায় তুলে ধরে বললেন–
গাহি সাম্যের গান–

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।
'পূজারী, দুয়ার খোলো,
ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে পূজার সময় হলো!'
স্বপন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়,
দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হয়ে যাবে নিশ্চয়!-
জীর্ণ-বস্ত্র শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ
ডাকিল পান্থ, 'দ্বার খোলো বাবা, খাইনিকো সাতদিন।'
...
ও কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি
ও মুখ হইতে কেতাব-গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে,
যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে।
পুজিছে গ্রন্থ;– গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো!
...
ও কে? চণ্ডাল? চমকাও কেন? নহে ও ঘৃণ্য জীব!
ওই হতে পারে হরিশ্চন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব।
আজ চণ্ডাল কাল হতে পারে মহাযোগী-সম্রাট,
তুমি কাল তারে অর্ঘ্য দানিবে, করিবে নান্দীপাঠ।
রাখাল বলিয়া কারে করো হেলা, ও-হেলা কাহারে বাজে!
হয়তো গোপনে ব্রজের গোপাল এসেছে রাখাল-সাজে!

চাষা বলে করো ঘৃণা!
দেখো চাষা-রূপে লুকায়ে জনক বলরাম এল কি না! (ইসলাম, ২০০৭:৮১-৩)

একই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় 'সাম্যবাদী' কবিতায়। যেখানে তিনি বললেন:

গাহি সাম্যের গান–
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান।
গাহি সাম্যের গান!
কে তুমি? পার্সি, জৈন? ইহুদি? সাঁওতাল, তিল, গারো?
কন্‌ফুসিয়াস্? চার্বাক-চেলা? বলে যাও, বলো আরো!
বন্ধু, যা খুশি হও,
পেটে-পিঠে, কাঁধে-মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক–
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব পড়ে যাও যত শখ,–
কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল? (ইসলাম, ২০০৭:৭৯-৮০)

তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্য থেকে শব্দ, প্রতীক ও ছবি ব্যবহার করেছেন আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক হিসাবে। 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় তিন শিবের প্রলয়নৃত্যের ছবিটি ব্যবহৃত করেন প্রতীকরূপে। তাঁর মতে–

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর-প্রলয় নূতন সৃজন বেদন।
আসছে নবীন-জীবন হারা অসুন্দরে করতে ছেদন। (ইসলাম, ২০০৭:৬)

একইভাবে 'রক্তাম্বরধারিনী মা' কবিতায় চণ্ডীর প্রলয়ঙ্করী মূর্তি এঁকে কবি শেষ পর্যন্ত বলেন–

শ্বেতশতদল-বাসিনী নয়, আজ
রক্তাম্বরধারিণী মা
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা। (ইসলাম, ২০০৭:১৩)

'আগমনী' কবিতাতেও শিব দুর্গার ছবির নেপথ্যে কবির মূল বক্তব্য হচ্ছে স্বাধীনতা। তাই তিনি এখানেও বললেন–

আজ রণ-রঙ্গিণী জগৎমাতার দেখ্ মহারণ
দশদিকে তার দশ হাতে বাজে দশ প্রহরণ।
পদতলে লুটে মহিষাসুর
মহামাতা ঐ সিংহ-বাহিনী জানাব আজিকে বিশ্ববাসীকে–
শ্বাশত নহে দানব-শক্তি, পায়ে পিষে যায় পশুর। (ইসলাম, ২০০৭:৩৩)

আবার একই চিত্র ফুটে উঠেছে 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধে তিনি বললেন–

"মারো শালা যবনদের!" "মারো শালা কাফেরদের!"

...আবার হিন্দু-মুসলমানী কাণ্ড বাঁধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কাটাকাটি, তারপর মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লার এবং কালীর প্রেস্টিজ রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চিৎকার করিতেছিল তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, তখন আর তাহারা আল্লা মিয়া বা কালী ঠাকুরাণীর নাম লইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে, "বাবা গো, মাগো।" মাতৃ পরিত্যক্ত দুটি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া এক স্বরে কাঁদিয়া মাকে ডাকে।
"দেখিলাম, হত আহতদের ক্রন্দন মসজিদে টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী চির কলঙ্কিত হইয়া রহিল।" (ইসলাম, ২০০৭:৪৩৩)

উভয় ঐতিহ্য থেকে আবলীলাক্রমে তিনি বিষয়, উপমা, রূপক, বাকভঙ্গি প্রভৃতি আহরণ করেছেন। তিনি একদিকে যেমন বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কালী-কীর্তন রচনা করেছেন তেমনি ইসলামি গান, কাব্য আমপারা, মরুভাস্কর প্রভৃতিও রচনা করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কালী-কীর্তন ও না'ত রচনায় তিনি প্রায় তুলনীয় চিত্রকল্প রচনা করেছেন। যেমন তাঁর একটি বিখ্যাত কালী-কীর্তনে আছে-

আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়
দেখে যা আলোর নাচন।
মায়ের, রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব
যার হাতে মরণ বাঁচন॥
আমার কালো মেয়ের আধাঁর কোলে
শিশু রবি-শশী দোলে
(মায়ের) একটু খানি রূপের ঝলক
ঐ স্নিগ্ধ বিরাট নীল-গগন। (ইসলাম,২০০৭:২৬৮)
তিনি 'জুলফিকার' নাতে বললেন-
তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে।
মধু পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে॥
যেন ঊষার কোলে রাঙ্গা রবি দোলে॥ (ইসলাম, ২০০৭:১৬৮)

শুধু ধর্মীয় ব্যবধান নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল বৈষম্য বিলোপের সম্ভাবনাপূর্ণ দিনের কল্পনা করেন কবি-

আজ নিখিলের বেদনা আর্ত পীড়িতের মাখি খুন
লালে লাল হয়ে উদিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ।
...
সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি
এক মোহনায় দাঁড়াইড়া শোন এক মিলনের বাঁশী। (ইসলাম, ২০০৭:৯৪)

'পথের দিশা' কবিতায় তিনি লিখলেন-

মসজিদ আর মন্দির ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার
রে আগ্রদূত ভাঙতে এবার আসছে কি জাঠ কালাপাহার? (ইসলাম, ২০০৭:৬২)

'হিন্দু মুসলিম যুদ্ধ' কবিতায় তিনি আশার আলো দেখতে পান। তাই আশার বাণী শুনিয়ে লিখলেন–

যে লাঠিতে আজ ট্যুট গম্বুজ, পড়ে মন্দির-চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া।
প্রভাতে হবে না ভায়ে-ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন।
করুক কলহ-জেগেছে, তো তবু-বিজয়-কেতন উড়া!
ল্যাজে যাদি তোর লেগেছে আগুন, স্বর্ণলঙ্কা পুড়া! (ইসলাম, ২০০৭:৬৫)

নজরুল সাহিত্য রচনায় বিশেষ করে 'বিদ্রোহী' কবিতায় হিন্দু ও মুসলিম ধর্ম থেকে শব্দ নিয়েছেন এবং উভয় ধর্মের বীরকে শক্তির উৎস হিসেবে দেখিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদী চেতনার বিরুদ্ধে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, "নজরুল হিন্দু, মুসলমান উভয় ঐতিহ্য থেকেই কাব্যে উপাদান সংগ্রহ করেছেন আর সেকারণেই তিনি একমাত্র মুসলমান সাহিত্যিক যার সাহিত্য কর্ম উভয় সমাজে আদৃত হয়েছে।" (রফিকুল ইসলাম, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯:১২৬)।

এটা সংগত কারণে উল্লেখ করা যায়, অসম্প্রদায়িক মানবচৈতন্যের প্রতিভূরূপে, হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির এক সংকর চৈতন্য রূপে নজরুল চাইলেন বিভক্ত, বিদ্যমান ও বৈষম্যপীড়িত এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষের হাত থেকে বিষভাণ্ড কেড়ে নিয়ে বিদেশি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে তাদের মিলিত পথযাত্রার বোধ উদ্দীপ্ত করে তুলতে। 'ধূমকেতু' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সাম্প্রদায়িক বিভেদ ভুলে স্বাধীনতার জন্য তিনি ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার অহ্বান জানান। তাঁর মতে–

> 'ধূমকেতু' কোন সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানদের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যেখানে প্রাণের মিল, আদত, সত্যের মিল, সেখানে ধর্মের বৈষম্য কোনো হিংসার দুশনীর ভাব আসে না। যার নিজের ধর্মের বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না। (ইসলাম, ২০০: ৬১৬)

আবার 'যুগবাণী'তেও একই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এখানে তিনি উচ্চারণ করেন,

> "মানবতার এ মহান যুগে একবার গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বল যে, তুমি ব্রাহ্মণ নও, শুদ্র নও, হিন্দু নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ, তুমি সত্য" (নজরুল, ২০০৭:৩৯৩)

> "দেশপ্রেমিক জননায়ক কামাল পাশার সংগ্রাম ও বীরত্ব যেমন স্বদেশে বিদেশী শত্রু বিনাশের পদ্ধতিগত প্রতীক, তেমনি কোরবানী বা মহরমের আত্মত্যাগ ও আদর্শগত প্রতীকে কবি আহ্বান জানান মুক্তির রক্তঝরা সশস্ত্র পথে শাসক-শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে নেমে আসার।" (রফিক, ২০০১:২৩৬-৭)।

তরুণ ও যুব সমাজকে 'কোরবাণী' কবিতায় নজরুল আহবান করেন–

ওরে সত্যমুক্তি স্বাধীনতা দেবে এইসে খুন-মোচন!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!
...
জোর চাই, আর যাচ্না নয়
কোরবানী-দিন আজ না ওই?...
...
কাজ না আজিকে জান মাল দিয়ে মুক্তির উদ্ধরণ?
বল্-যুঝবো জান্ ভি পণ! (ইসলাম, ২০০৭:৪৫)

একইভাবে 'মহররম' কবিতায় বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন:

ফিরে এলো আজ সেই মহররম মাহিন-
ত্যাগ চাই, মার্সিয়া-ক্রন্দন চাহিনা।...
সকীনার শ্বেতবাস দেবো মাতা-কন্যায়,
কাসিমের মত দেবো জান রুধি অন্যায়! (ইসলাম, ২০০৭:৪৭)

'ধূমকেতু' পত্রিকার 'মহরম সংখ্যায়'ও কবি বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মহররমের আত্মত্যাগের আদর্শ প্রয়োগের আহবান জানিয়ে। 'কামাল পাশা'তেও স্বদেশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে রক্তাক্ত সংগ্রামের পরোক্ষ ও প্রতীকী ইংগিত দৃষ্টি এড়ায় না। তাঁর মতে–

দেশ বাঁচাতে আপনারি জান শেষ করেছে।
বেশ করেছে!!
শহীদ ওরা শহীদ! (ইসলাম, ২০০৭:২১)

অন্যদিকে অত্যাচারী শক্তির বিনাশের উদ্দেশে ঐতিহ্যবাহী দেবীর সংগ্রামীরূপের চিত্রও অনুরূপ স্বদেশ-মুক্তির সংকল্পে ধৃত–

মহামাতা ঐ সিংহ-বাঘিনী জানায় আজিকে বিশ্বাসীকে-
শাশ্বত নহে দানব শক্তি পায়ে মিশে যায় শির পশুর!
নাই দানব
নাই অসুর
চাইনে সুর
চাই মানব! (ইসলাম, ২০০৭:১৩)

সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতাদের দোদুল্যমানতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, শ্রেণিস্বার্থ,

ব্যক্তিস্বার্থের প্রকটতা আর বিপ্লবে ভয় পায় তাদের জন্য নজরুল ইসলাম সত্য কথনে আহ্বান করেছে। যদিও গান্ধী, আলী ভাতৃদ্বয় প্রভৃতি জাতীয় রাজনীতিকদের প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। তিনি লিখেছেন–

নবীন মন্ত্রে দানিতে দীক্ষা আসিতেছে ফাল্গুনী,
জাগোরে জোয়ান! ঘুমায়োনা ভুয়ো শান্তির বাণী শুনি–
অনেক দধীচি হাড় দিল ভাই,
দানব-দৈত্য তবু মরে নাই,
সুতা দিয়া মোরা স্বাধীনতা চাই, বসে বসে কাল গুনি!
জাগোরে জোয়ান! রাত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি। (ইসলাম, ২০০৭:২৯)

বৃটিশ উপনিবেশবাদের ফলে এদেশের শ্রমিক-জনতা প্রান্তিক হয়ে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত ও শোষিত হয়েছে প্রতিক্ষেত্রে। নজরুল তথাকথিত কেন্দ্রীয় শ্রেণি কর্তৃক শোষিত হলে প্রতিবাদী হয়ে 'কুলি ও মুজুর' কবিতায় গণ-জাগরণের জন্য লিখলেন:

বেতন দিয়াছ? চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল।
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোড় পেলি বল। (ইসলাম, ২০০৭: ৯৪)

এমনকি সবকিছু ভুলে তাঁর বুকের কান্না বেজে ওঠার শব্দ শুনি, যখন তাঁর উপলব্ধি:

ক্ষুধাতুর শিশু চায়না স্বরাজ, চায় দু'টো ভাত একটু নুন,
বেলা বয়ে যায় খায়নিক' বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন। (ইসলাম, ২০০৭:৫৭)

নজরুলের এসব উপলব্ধি মূলত খেলাফাত আন্দোলন, স্বরাজ আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সাধারণ জনতাকে জাগরণের জন্য আহবান। তিনি বিশ্বাস করতে অর্থনৈতিক মুক্তি ও মানুষে-মানুষে শ্রেণি বৈষম্যকে দূর করতে না পারলে প্রকৃত মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। সমসাময়িক সমাজের নানা অন্যায়, অবিচার, ভেদাভেদ, সংকীর্ণতার রূপকে তিনি উপলব্ধি করেছেন তাঁর সংবেদনশীল হৃদয় দিয়ে। তাই চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বললেন, "আমি তো মনে করি নজরুলের মত আমরা একটাও কবিতা লিখিতে পারিনি। স্বাধীনতা আন্দোলনে নজরুলের কবিতা অনেকের মনে একটা স্পন্দন এনে দিয়েছিল। আমরা যারা নিজেদের মার্কসীয় মনে করি, মনে হয় সে রকম' কোনো কবিতা আমরা লিখে উঠতে পারিনি" (উদ্ধৃতি সৈয়দ, ১৪০৬:১৯২)।

'বাংলাদেশ' শীর্ষক গানে পরাধীন বাংলাদেশের চিত্র তুলে ধরে একজন চাঁদ কেদার বা বীর প্রতাপের আকাঙ্ক্ষা করেছেন। 'হেমপ্রভা' কবিতায় তিনি হেমপ্রভা বা চাঁদ সুলতানা আবির্ভাব কামনা করেছেন যাতে বাংলার আঁধার রাত অবসিত হয়। 'অশ্বিনীকুমার' কবিতায় তিনি অশ্বিনীকুমারের সাহস, বীরত্ব, সংগ্রাম ও দেশপ্রেমেকে বাঙালির চারিত্রিক

বৈশিষ্ট্যর প্রতীকরূপে চিহ্নিত করে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। 'ইন্দু-প্রয়াণ' কবিতায় তিনি শরন্দিুকে স্মরণ করার মাধ্যমে দেশবাসীকে পরাধীনতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছেন। "তিনি বাঙালিকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জাগ্রত ও ঐক্যবদ্ধ করার আন্তর তাগিদ অনুভব করেছেন" (আউয়াল, ১৯৯৯:১৯)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর ধারণা ছিলো [বাঙালি] জাগলে ভারতের মুক্তি আসবে। "বাঙালি যে দিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলবে [-] বাঙালির বাংলা সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। সে দিন একা বাঙালিই ভারতকে স্বাধীন করতে পারবে।" (ইসলাম, ২০০৭:৫৬)

'বিদ্রোহী'র শ্রেষ্ঠত্ব কেবল বিদ্রোহী চেতনার মধ্যেই নয়। এর বীর রস, যৌবন চেতনা এবং নব শব্দ রসে, বাণী'র ঝঙ্কারে ও উপমা প্রয়োগে। সমাজ বাস্তবতার এমন এক প্রেক্ষাপটে কবি এটি রচনা করেন, যখন পরাধীন দেশ ও জাতির ভূলুণ্ঠিত গৌরব ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে বিদ্রোহের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল ধীরে ধীরে। বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রামেও 'বিদ্রোহী' ছিল প্রাণ সঞ্চারের তাগিদ। বাংলার ঘুমিয়ে থাকা যুব সম্প্রদায় সেদিন জেগে উঠেছিল এই 'বিদ্রোহী' পড়েই। জাতীয় জাগরণ সৃষ্টিতে নজরুলের এই একটি কবিতা সেদিন সুদূরপ্রয়াসী ভূমিকা পালন করেছে। অন্য কোন রচনা দ্বারা তা সম্ভব হয়নি এবং এখান থেকেই নজরুল অর্জন করেন 'বিদ্রোহী কবি'র সার্বিক স্বীকৃতিও। বাস্তবিক, বলহীন শৃঙ্খলিত জাতির জন্য 'বিদ্রোহী' সেদিন ছিল সঞ্চারী এক ঘুম-ভাঙানী মন্ত্র। নজরুল জাগরণের আহবান জানিয়ে বললেন-

বল বীর-
বল উন্নত মমশীর!
শির নেহারী' আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর-
বল মহা বিশ্বের মহাকাশ ফাঁড়ি
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ছাড়ি;
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রির। (ইসলাম, ২০০৭:৭)

দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে বিভক্ত জাতিকে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে এবং মানবিকতার আহবান জানিয়ে পরাধীন দেশকে যেমন ঔপনিবেশিক শক্তির কাছ থেকে মুক্তির মূল মন্ত্র তিনি শিখিয়েছেন তেমনি দেশ গঠনেও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই

বাঙালিকে, বাঙালির ছেলে-মেয়েকে ছেলে বেলা থেকে শুধু এই এক মন্ত্র শেখার আহবান জানিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম বললেন-

এই পবিত্র বাংলাদেশ
বাঙালির– আমাদের।
দিয়া 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'
তাড়াব আমরা, করি না ভয়
যত পরদেশী দস্যু ডাকাত
'রামা'দের গামা'দের।

বাঙলা বাঙালির হোক! বাঙলার জয় হোক। বাঙালির জয় হোক। (ইসলাম, ২০০৭:৪২)

শৃঙ্খল ভাঙার এক অসীম দুর্বিনীত শক্তির মহাপ্লাবনের আগমন বার্তা ধ্বনিতে হয়েছে 'বিদ্রোহী'তে। বাঙালি এর আগের কখনো শৃঙ্খল ভাঙার এমন জয়গান শোনেনি। শক্তিদর্পী এই উন্নতশীর অসীম ক্ষমতাধর এবং তা বিষয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে উপমিত হয়েছে চূড়ান্ত মানব মহিমায়, "আমি আপনাকে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।" (ইসলাম, ২০০৭:৮) শক্তিমদমত্ত কবি তাই বলতে পারলেন, "আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি" (ইসলাম, ২০০৭:৮)।

চির বিদ্রোহী বীর তাঁর দ্রোহের নির্বাপনে ঘোষণা করেন,

মহা বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না–
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত। (ইসলাম, ২০০৭:৯)

'বিদ্রেহী'র এই মর্মবাণী আমৃত্যু লালন করেছেন কবি তাঁর কর্মে ও সৃষ্টিতে এবং বলা যায়-'বিদ্রোহী'ই হচ্ছে নজরুলের বিদ্রোহাত্মক চেতনার চূড়ান্ত মানসিক উত্থান। 'ধূমকেতু'র বিপ্লবী ভূমিকা আর 'লাঙলে'র সাম্যবাদী চেতনার উৎসভূমিও এই 'বিদ্রোহী'। পরবর্তীতে লেখা অধিকাংশ কবিতা ও প্রবন্ধ তার বিদ্রোহের রূপকে পূর্ণতা দান করেছে। তাঁর বিদ্রোহের দর্শন এসব কবিতা ও প্রবন্ধে স্পষ্ট হয়েছে।

তথ্য-নির্দেশিকা:

১. খান, খায়রুল আনাম (ডিসেম্বর ২০০০), বিষের বাঁশী : বিষয় ও প্রকরণ, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
২. খান, আজহার উদ্দীন (পৌষ ১৩৬৫), বাংলা সাহিত্যে নজরুল (তৃতীয় সংস্করণ), ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা।
৩. বিশ্বাস, ড. মিল্টন (২৫ মে ২০২১), "কাজী নজরুল ইসলাম : বিশ্ব বেদনার কবি", পেজ ফোর, https://pagefournews.com/kazi_nazrul_islam_by_dr-_milton_biswas/
৪. ভৌমিক, নির্মলেন্দু (আগস্ট ১৯৯৩), "বিদ্রোহী' কবিতা ও কবির বিশ্ব', দেবকুমার ঘোষ সম্পাদিত কবি নজরুল ও সঞ্চিতা, শিলালিপি, কলকাতা।
৫. বসু, সুভাষচন্দ্র (ফেব্রুয়ারি ২০০১), 'নজরুল একটি জ্যান্ত মানুষ', আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা।
৬. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ন (১৯৬৪), 'নজরুল', জি. এম হালিম সম্পাদিত নজরুল মানস সমীক্ষা, ঢাকা।
৭. আসাদ, আবুল (৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬), 'খিলাফাত স্বরাজ অসহযোগ আন্দোলনের বিভেদের পরিণতি'। https://rb.gy/odtxcj
৮. বসু, বুদ্ধদেব (ফেব্রুয়ারি ২০০১), 'নজরুল ইসলাম', আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা।
৯. হাসান, মাহবুব (জুন ১৯৯৭), নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
১০. 'জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপট, গুরুত্ব ও প্রতিক্রিয়া', shorturl.at/djtLR
১১. মুখার্জী, বীরেন (২৪ মে ২০১৯), 'নজরুলের বিপ্লব : একটি পর্যালোচনা', মত ও পথ, short-url.at/iDMOZ
১২. আমীন, রুবাইয়্যাত (৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮), 'ইংরেজদের বিভাজন নীতি ও মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা পঙ্গুকরনের ইতিহাস', রোর মিডিয়া, shorturl.at/ioAIN
১৩. গুহ মজুমদার, সমীরণ (ফেব্রুয়ারি ২০০৭), 'আফ্রিকা: ঔপনিবেশিক বনাম উপনিবেশিতের চোখে প্রেক্ষিত: রামনাথ বিশ্বাসের 'অন্ধকারের আফ্রিকা'', ফকরুল চৌধুরী সম্পাদিত উপনিবেশবাদ ও উত্তর-উপনিবেশবাদ পাঠ, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা ।
১৪. ইসলাম, কাজী নজরুল (ফেব্রুয়ারি ২০০৭), 'বিদ্রোহী', আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল-রচনাবলী (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ) প্রথম খ-, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
—, 'প্রলয়োল্লাস', প্রাগুক্ত।
—, 'রক্তাম্বরধারিনী মা', প্রগুক্ত।
—, 'মসজিদ-মন্দির', প্রাগুক্ত।
—, 'যুগবানী', প্রাগুক্ত।
—, 'কোরবাণী', প্রাগুক্ত।
—, 'মহররম', প্রাগুক্ত।
—, 'ছুৎমার্গ', প্রাগুক্ত।
—, 'ধূমকেতু', প্রাগুক্ত।
—, 'কামাল পাশা', প্রাগুক্ত।
—, 'আগমনী', প্রাগুক্ত।
—, 'কাণ্ডরী হুঁশিয়ার!', প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড।
—, 'আমরা লক্ষীছাড়ার দল', প্রাগুক্ত।
—, 'রাজা-প্রজা', প্রাগুক্ত।
—, চোর-ডাকাত', প্রাগুক্ত।
—, 'মানুষ', প্রাগুক্ত।
—, 'সাম্যবাদী', প্রাগুক্ত।
—, 'কুলি-মজুর', প্রাগুক্ত।
—, 'পথের দিশা', প্রাগুক্ত, তৃতীয় খণ্ড।
—, 'হিন্দু মুসলিম যুদ্ধ', প্রাগুক্ত।
—, 'সব্যসাচী', প্রাগুক্ত।
—, 'বনগীতা', প্রাগুক্ত, সপ্তম খণ্ড।
—, 'জুলফিকার', প্রাগুক্ত।
—, 'বাঙালির বাঙলা', প্রাগুক্ত।

—, 'মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা', দুর্দিনের যাত্রী, নজরুল রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), কেন্দ্রীয় বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৬।
১৫. ইসলাম, রফিকুল (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬), 'নজরুল ইসলাম ও আমরা', মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত নজরুল সমীক্ষণ, আনন্দ প্রকাশ।
১৬. সৈয়দ, আবদুল মান্নান (শারদীয় সংখ্যা ১৪০৬), 'নজরুল ইসলাম, মুজাফফর আহমদ ও আবদুল কাদির', কলেজ স্ট্রীট।
১৭. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার (২০০০), 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচনাবলী ও অন্যান্য (প্রথম সংস্করণ)।
১৮. রফিক, আহমদ (এপ্রিল ২০০২১), 'নজরুলের বিদ্রোহ ঃ বিদ্রোহের স্বরূপ-অন্বেষা', মুহম্মদ নুরুল হুদা সম্পাদিত নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা-বিশেষ সংখ্যা, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
১৯. গুপ্ত, ডক্টর সুশীল কুমার (২০১৫), নজরুল চরিত মানস, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।
২০. আউয়াল, আবু হেনা আবদুল (মে ১৯৯৯), নজরুলের রাষ্ট্রচিন্তা ও রাজনীতি, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
২১. আজাদ, ড. আবুল (আগস্ট ২০০৩), কবি নজরুলের বিদ্রোহ ও কারাগারে বন্দিজীবন, গ্লোব লাইব্রেরী (প্রা.) লিমিটেড, ঢাকা।
২২. রহমান, আতাউর (আগস্ট ১৯৯৩), নজরুল : ঔপরিবেশিক সমাজে সংগ্রামী কবি, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
২৩. বেরী, পিটার (এপ্রিল ২০১৮), বিগিনিং থিওরি, ড. রুহুল আমীন অনুদিত, ফ্রেন্ডস বুক কর্ণার, ঢাকা।
২৪. উমর, বদরুদ্দিন (২০১৪), 'ভূমিকা', বেনজীন খান সম্পাদিত এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ : আবিশ্ব বিবেকের কণ্ঠস্বর, সংবেদ, ঢাকা।
২৫. সাঈদ, এযওয়ার্ড ডব্লিও (১৯৭৮), ওরিয়েন্টালিজম, পেঙ্গুঈন, লন্ডন।

এনইউবি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা
(Peer-Reviewed Journal)
ISSN : 2710-4451
বাংলা বিভাগ
নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২২

'পোস্টমাস্টার' ও 'বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ': মিল-অমিলের সন্ধানে

মোহাম্মদ নূরুল হক*

সার-সংক্ষেপ : বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়। তার হাতেই আধুনিক ছোটগল্পের ভিত্তি রচিত হয়েছে। এরপর ছোটগল্প পাড়ি দিয়েছে সুদীর্ঘ পথ। সেই পথে অনেক মহারথীর মধ্যে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও উল্লেখযোগ্য একটি নাম। ছোটগল্পে রবীন্দ্র-প্রভাবের বিষয়টি বিশেষভাবে তাৎপর্য বহন করে। অন্য অনেক লেখকের মতো চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও রবীন্দ্ররীতিতেই ছোটগল্প রচনা করেছেন। এই অনুকল্পের আলোকে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ' গল্পে বেশকিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তবে, কিছু অমিলও রয়েছে। উভয় গল্পের বিষয় হৃদয়বৃত্তি, উভয় গল্পের চরিত্রে শ্রেণীভেদ আছে। এদিক থেকে কাহিনি বর্ণনা ও চরিত্র সৃষ্টিতে উভয় লেখকের মন ও মননের মিল রয়েছে।

০১.

ছোটগল্পের বড় সুখ রাবীন্দ্রিক, বড় দুঃখও তাই। সাহিত্যের এই কনিষ্ঠ শাখার দিকে তাকালে রবীন্দ্র আধিপত্যের দেখাই মেলে। সেই আধিপত্য আকাশের সমান যেমন বিপুল, তেমনি সমুদ্রের মতো গভীরও। এই বিশালতা-গভীরতার মাঝখানেই ছোটগল্পের বিস্তৃতি।

রবীন্দ্র প্রভাবের কথা বলার সঙ্গত কারণ রয়েছে। সেই প্রভাব যেমন বিষয়ে, তেমনি কাহিনির গাঁথুনিতেও। উত্তর-রৈবিক অনেক ছোটগল্প লেখকের রচনায়ই রবীদ্র-ছায়া প্রচ্ছন্নভাবে পড়েছে। কেউ সেই ছায়ায় সচেতনভাবে নিজের ভুবন নির্মাণ করেছেন,

* কবি-প্রাবন্ধিক

কেউ বা অবচেতনে আশ্রয় নিয়েছেন। এতে ছোটগল্পের সমৃদ্ধিই ঘটেছে। ক্ষতি কিছু হয়নি। এমন দাবির পেছনে দুটি গল্পের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। একটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (৭ মে ১৮৬–১৭ আগস্ট ১৯৪১) 'পোস্টমাস্টার', অন্যটি তার সমসাময়িক লেখক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১১ অক্টোবর, ১৮৭৭–১৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৮) 'বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ'। রবীন্দ্রনাথের হাতে ছোটগল্পের যাত্রা বলেই হয়তো তার সমসাময়িক লেখকরাও তারই রীতি গ্রহণ করেছেন। চারুচন্দ্রও তাই।

উভয় গল্পেরই মূল বিষয় হৃদয়বৃত্তি। তবে, একটিতে অসম বয়সের হৃদয়াকুতি, অন্যটিতে বিসম শ্রেণীগত সমস্যা প্রকাশিত। উভয় গল্পে উচ্চবিত্তের নিশ্চিত চাকচিক্যময় জীবনের কাছে নিম্নবিত্তের পরাজয়। উভয় গল্পেই নিম্নবিত্তের নিষ্ফল আকুতি প্রকাশিত। তবে, সেই আকুতি কোনো গল্পের নিম্নবিত্তের প্রতিনিধিই মৌখিকভাবে প্রকাশ করে না। কেবল আচরণ দিয়ে বোঝায়।

'পোস্টমাস্টার' গল্পে চরিত্র মূলত দুটি। পোস্টমাস্টার ও রতন। 'বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ'য় চরিত্র অন্তত হাফডজন। তবে, গল্পটি আবর্তিত হয়েছে দুটি চরিত্রকে কেন্দ্র করেই। দুটি গল্পের মিল-অমিল বিশ্লেষণের আগে উভয়ের কাহিনি দেখা যাক।

উলাপুর গ্রামে নীলকুঠির সাহেবদের প্রয়োজনে একটি পোস্ট অফিস হয়েছে। সেই পোস্ট অফিসে একজন পোস্টমাস্টার যোগ দিয়েছেন। নিজের রান্না নিজে করেন। মাঝেমধ্যে গ্রামের ১২/১৩ বছর বয়সী পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালিকা রতন তাকে জল এনে দেওয়া থেকে শুরু করে রান্নার কাজে সাহায্য করে। হুঁকোয় আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে ঘর মুছে দেওয়ার মতো টুকটাক কাজ করে দেয়। বিনিময়ে দুই বেলা খাবার পায় সে। পোস্টমাস্টার শহুরে মানুষ। এই অজপাড়াগাঁয়ে তার ভালো লাগে না। তাই এক বার অসুস্থ হয়ে পড়লে, সুস্থ হয়ে উঠেই বদলির চেষ্টা করে। কিন্তু তার সেই দরখাস্ত মঞ্জুর হয় না। তাই কাজে ইস্তফা দিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সিদ্ধান্ত পোস্টমাস্টারের জন্য যতই মঙ্গলজনক হোক, রতনের জন্য মনভাঙার। সহসা রতন জানতে চায়, 'দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?' জবাবে পোস্টমাস্টার হাসেন। বলে, 'সে কী করে হবে!'[১] পোস্ট মাস্টারের এই ছোট্ট জবাবে রতনের মন ভেঙে যায়। তার মনে সম্ভব-অসম্ভবের কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক কাজ করে না, কেবল কানে বেজেই চলে, 'সে কী করে হবে!'

একসময় পোস্টমাস্টারের বিদায়ের ক্ষণ ঘনিয়ে আসে। সে রতনকে ডেকে বলে, তার যাওয়ার পর রতনের কোনো সমস্যা হবে না। নতুন যে পোস্টমাস্টার আসবে, সেও রতনকে অনেক আদর করবে। এরপর বলে, 'রতন, তোকে আমি কখনও কিছু দিতে পারিনি। আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম, এতে তোর দিনকয়েক চলবে।'[২]

এই দয়ায় রতনের হৃদয়ে আঘাত লাগে। সে ব্যথিত হয়। ধুলায় পড়ে পোস্টমাস্টারের পা জড়িয়ে ধরে। বলে, 'দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না।'[৩] এরপরই এক দৌড়ে পালিয়ে যায়। পোস্টমাস্টার নিশ্বাস ফেলে। বাড়ির পথ ধরে। নৌকায় উঠে বসে। কিছুদূর যাওয়ার পর রতনের জন্য তার মনটা কিছুক্ষণের জন্য কেঁদে ওঠে, মনে মনে ভাবে, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি।'[৪] কিন্তু ততক্ষণে নৌকার পালে বাতাস লাগে। নৌকা ছুটে চলে গন্তব্যের দিকে। পোস্টমাস্টারও হৃদয়াকুতির জায়গায় বুদ্ধিবৃদ্ধির চর্চাকে বড় করে তোলে। ভাবে, 'জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।'[৫] বিপরীতে রতনের মনে নতুন কোনো তত্ত্ব নেই। সে কেবল পোস্ট অফিসের চারদিকে কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়ায়। বিধাতার কাছে নিষ্ফল আকুতি জানায়।

'বায়ু বহে পূরবৈয়াঁ' গল্পের প্রধান চরিত্র কাল্লু। সে প্রথমে পেশায় মুচি; মুচির ছেলে। বাবার আগ্রহে ইংরেজি মাধ্যমে কিছুদিন পড়াশোনা করে। বাবার মৃত্যুর পর মুচির কাজ না করে আরও 'ভালো' কাজের উদ্দেশ্যে কলকাতায় পাড়ি জমায়। সেখানে বালিকা স্কুলের ঘোড়ার গাড়ির সহিসের চাকরি নেয়। প্রথম দিনই বালিকারা তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করে। কেবল একজন বালিকা বাদ। সে বিভা। সে অন্য মেয়েদের তুলনায় গুরুগম্ভীর। বিচক্ষণা। কাল্লুর প্রতি কিছুটা সহৃদয় ভাব দেখায়। একসময় স্কুলগামী বালিকা জেনে যায়, কাল্লু ইংরেজি পড়তে জানে। বিভা অবাক হয়। সে কাল্লুকে নিজের বই পড়তে দেয়। তাতেই কাল্লুর হৃদয় উছলে ওঠে। সে অবসরে বিভার দেওয়া বই পড়ে। আর বইয়ের পাতায় পাতায় বিভার হাতের স্পর্শ অনুভব করে। নিজের মধ্যে পুরুষকে জাগতে দেখে। কাল্লু বিভিন্ন রূপকথা-উপকথা পড়ে দেখেছে, শাহজাদীর প্রেমে নিতান্ত গ্রামের দরিদ্র যুবকও পড়ে। সেই প্রেমও পরিণতি পায়। তাই সেও বিভাকে নিয়ে স্বপ্ন রচনা করে। কিন্তু সেই কথা কিভাবে বলবে, বুঝতে পারে না। সে বিভাকে নিজের গ্রামের আর ৫টা মেয়ের সঙ্গে তুলনা করে বোঝার চেষ্টা করে। তাতেও কোনো উপায় খুঁজে পায় না। তবু তার এই ভেবে সুখ যে বিভাকে সে প্রতিনিয়ত দেখতে পায়। এভাবে কিশোরী বিভা একদিন তরুণী বয়সে উপস্থিত হয়। পড়াশোনা শেষে স্কুলে শিক্ষকতা করে। কাল্লুকে সে তার দুই বেলার বেহারা করে নিয়েছে। এই কাজের সুযোগে কাল্লু দুই বেলা বিভার কাছাকাছি থাকতে পারে, তাকে দেখতে পায়। এই-ই তার সুখ। তার এই সুখস্বপ্নে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বিভার হবু বর। বিভার হবু বরের আসা-যাওয়া শুরু হলে কাল্লুর মনে ঝড় উঠতে থাকে। তার 'পায়ের তলা দিয়া মাটি সরিয়া চলিতে লাগিল,

তাহার চোখের সামনে বিশ্বব্রহ্মা– পাগলের মতো টলিয়া টলিয়া বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল! কোথায় তাহার আশ্রয়? কোথায় তাহার অবলম্বন?'[৬]

দেখতে দেখতে বিভার বিয়ে হয়ে যায়। এরপর ভগ্নহৃদয় কাল্লু ঠিক করে পুরনো পেশা মুচির কাজ করবে সে। আর স্কুলের চাকরি করবে না। সেই খবর পেয়ে বিভা জানতে চায়, কেন কাল্লু স্কুলের চাকরি দেবে। কাল্লু মাথা হেঁট করে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। বিভা আবারও জানতে চাইলে কাল্লু ধীর স্বরে বলে, 'জী নেহি লাগতা!' তারপর সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে জুতা সেলাইয়ের কাজ নিয়ে বসে। বিভার বাসার সামনেই। ঝড়বৃষ্টি-রোদ কোনো কিছুই তাকে তার কাজ থেকে সরাতে পারে না। সে মুচির কাজ করে। যখন বিভাকে দেখে তখন তার কণ্ঠে গান বেজে ওঠে।

০২.

'পোস্টমাস্টার' গল্পে রতনের চেয়ে বিত্তশালী পোস্টমাস্টার। শহুরে সন্তান। বিপরীতে রতন নিতান্তই গ্রামের মেয়ে। পিতৃমাতৃহীন, অনাথ। বয়স কম। পোস্টমাস্টার তাকে ছেড়ে গেলে সে পোস্ট অফিসের চারদিকে পুরনো স্মৃতির টানে ঘুরেঘুরে কাঁদে। পোস্টমাস্টারের সঙ্গে তার সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হয়ে যায়। 'বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ' গল্পের 'বিভা' উচ্চবিত্তের মেয়ে, কাল্লু নিম্নবিত্তের। কাল্লু পেশায় প্রথমে মুচি, পরে সহিস। সবশেষে আবারও মুচি। কাল্লু অতি আবেগের কারণে বিভার বাসার সামনেই তার কাজের স্থান ঠিক করে নেয়। এতে তার সুবিধা, সময়-অসময়ে বিভাকে সে দেখতে পায়। এই তার সুখ। উভয় গল্পে বেশ কিছু মিল পাওয়া যায়। মিলগুলো হলো:

ক. ধনী-দরিদ্রের একতরফা হৃদয়বৃত্তি
খ. চরিত্র নির্মাণে একই রকম একরোখা, একই রকম আত্মকেন্দ্রিক
গ. উভয় গল্পের চরিত্র নিজ নিজ অবস্থানে অনড়
ঘ. বিচ্ছেদে সমাপ্তি
ঙ. শ্রেণীবিশেষের প্রতি স্রষ্টার পক্ষপাত।

তুলনা-প্রতিতুলনার সুবিধার্থে উল্লিখিত বিষয়গুলো একসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে।

সামাজিক স্তরবিন্যাস-ধনী-দরিদ্রে ব্যবধান, অভিজাত-ব্রাত্যশ্রেণীর পার্থক্য চিরকালই ছিল। কখনো প্রকট, কখনো প্রচ্ছন্ন। মানুষ সাম্যের উপদেশ দেয় সত্য, কিন্তু নিজে ক্ষমতা পেলে 'বারো আনা'ই পক্ষপাত দেখায়। সেই পক্ষপাত তার স্বজনের প্রতি, স্বজাতির প্রতি। এমনকি স্বশ্রেণীর প্রতিও থাকে। মানুষ নিজেকে যতটা ন্যায়পরায়ণ-সাম্যবাদী দাবি করে, বাস্তবে ততটা নয়। বাস্তবে একদিকে তার মনোরাজদণ্ড ঝুঁকে

থাকেই। ওই পক্ষপাত থেকে তার মুক্তি নেই। এই ক্ষেত্রে সমাজের দশজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে একজন লেখকেরও কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ই এক। উভয়ের মনস্তত্ত্বই এক। ভাবাবেগের কাছে তাদের বিচার-বিবেচনাবোধ প্রায় পরাজিত হয়। তাদের মস্তিষ্কের ওপর হৃদয় ঠিকই কর্তৃত্ব করে। ফলে তারা যতই প্রাজ্ঞ কিংবা ন্যায়পরায়ণ হওয়ার চেষ্টা করুন, শেষপর্যন্ত অনড় থাকতে পারেন না। চেতনে কিংবা অবচেতনে হলেও তাদের পক্ষপাত প্রকাশিত হয়ে পড়ে। 'পোস্টমাস্টার' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর 'বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ' গলে চারচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাই করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও চারুচন্দ্র; উভয়েই অভিজাতশ্রেণীর প্রতিনিধি। তাদের চরিত্র 'পোস্ট মাস্টার' ও 'বিভা'–উভয়ে বিত্তশালী সমাজের প্রতিনিধি। উভয়েই স্বাবলম্বী। 'রতন' ও 'কাল্লু'–উভয়ে দরিদ্র; অনাথ। রতন ও কাল্লু উভয়েই একতরফা ভালোবাসে। অন্যপক্ষ তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র প্রেমাসক্ত কি না, সেই খবর তারা জানে না। জানতে চায় না। তারা কেবল ভালোবেসে যায়। সেই ভালোবাসায় সামাজিক অবস্থান, আর্থিক সঙ্গতি, বয়সের ব্যবধান–কোনো কিছুই তারা ভাবে না। ফলে পোস্টমাস্টার যখন উলাপুর গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়, তখন রতন ভেঙে পড়ে। বড় আঘাত পায়। পোস্টমাস্টার ভাবে না, সে চলে গেলে অনাথ রতনের কী হবে। রতনের ভবিষ্যৎ নিয়ে তার মনে গভীরভাবে কোনো আঁচড় পড়ে না। বরং পোস্টমাস্টার বিদায়ের সময় রতনকে যে টাকা দিতে চায়, তাতে যতটা বিত্তশালীর করুণা ঝরে পড়ে, ততটা প্রিয় মানুষের দরদের দেখা মেলে না। হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়া যায় না। এখন ভিক্ষাপ্রার্থীকে লোকে যেভাবে, দয়া করে, রতনের সঙ্গে পোস্টমাস্টারও ঠিক তেমন আচরণই করে। এতে হৃদয়বতী রতনের অন্তরে আঘাত লাগে। সে অপমানে-বেদনায় ভেঙে পড়ে। হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে পোস্টমাস্টারের পা জড়িয়ে ধরে তার সেই দান প্রত্যাখ্যান করে পালিয়ে বাঁচে। রতনের এই কাতর প্রত্যাখ্যানে অক্ষম বেদনা-আক্রোশ-অভিমান একসঙ্গে ঝরে পড়লেও পোস্ট মাস্টারের তাতে ভাবান্তর ঘটে না। কারণ পোস্টমাস্টারের কাছে এই এক রতনের আলাদা করে কোনো গুরুত্ব নেই। সমাজের দশজন অনাথের প্রত্যাশার সঙ্গে এক রতনের অব্যক্ত-ভালোবাসার কোনো প্রভেদ দেখে না সে। কারণ সে উঁচু শ্রেণীর বাসিন্দা। তার লক্ষ্য গ্রাম ছেড়ে কলকাতার চাকচিক্যময় জীবন। সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকের কাছে এক অনাথ-গ্রাম্য কিশোরীর ভালোবাসা নিতান্তই অযৌক্তিক, অবাস্তব। রতন একবারই শুধু পোস্ট মাস্টারকে অনুরোধ করে তাকে নিয়ে যেতে, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর আর আটকানোর চেষ্টা করে না। দাবিও জানায় না।

'বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ' গল্পের বিভা ও কাল্লুরও প্রায় একই পরিণতি। বিভাকে প্রথম গাড়িতে দেখেই কাল্লু মুগ্ধ হয়ে যায়। নিজের সমাজ-শ্রেণী-অবস্থান ভুলে সে বিভাকে ভালোবেসে

ফেলে। কিশোরী বিভা একদিন যুবতী বয়সে এসে পড়ে। স্কুলবালিকা থেকে স্কুল-শিক্ষকে পরিণত হয়। কাল্লুর চোখের সামনে বিভা বড় হয়, তার বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের আগপর্যন্ত কাল্লুর আশা ছিল কোনো অলৌকিক ক্ষমতা বলে, রূপকথার গল্পের মতো করে একদিন বিভা তার হতেও পারে। কিন্তু কাল্লুর চোখের সামনে দিয়ে বিয়ের পর বিভা যখন স্বামীর সংসারে যায়, তখন তার সমস্ত আশার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। সে আশাভঙ্গের কথা প্রকাশ করতে পারে না। 'আপন মনজ্বালা নীরবে' তাকে দহন করে। পোস্ট মাস্টার গল্পে রতন অন্তত একবার পোস্ট মাস্টারকে অনুরোধ করে তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। কিন্তু এই গল্পে কাল্লু কখনোই বিভার কাছে নিজেকে নিবেদন করে না।

পোস্টমাস্টার গল্পে রতন ব্রাত্যশ্রেণীর হলেও কিশোরী, স্ত্রী জাতির প্রতিনিধি, তাই সে অন্তত একবার হলেও নিজের আকুতি জানাতে পারে। বিপরীতে দ্বিতীয় গল্পের কাল্লু পুরুষ জাতির প্রতিনিধি, তদুপরি রতনের মতোই দরিদ্র-অনাথ। অনাথ-দরিদ্র পুরুষকে মানায় না উচ্চবিত্তের রমণীকে প্রেম নিবেদন করা। তাই কাল্লুও প্রেম নিবেদন করে না। অর্থাৎ চারুচন্দ্র এখানে খুবই হিসাবী, উচ্চবিত্ত-রুচির। তাই সমাজের নিচু তলার পুরুষের সঙ্গে উঁচুতলার নারীর প্রণয়কে প্রশ্রয় দেন না। তিনি সমাজের সামাজিক কাঠোমোর গোড়ায় কুঠারাঘাত করার সাহস পান না। অথবা ইচ্ছাই পোষণ করেন না। সমাজে কিছু মানুষ থাকে, যারা আপন আপন মর্জিতে অনড় থাকে। তাদের সেই একরোখা ভাবের কারণে সমাজের কী হলো না হলো, তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ থাকে না। কেউ কেউ ভীষণ আত্মকেন্দ্রিক হয়। নিজেকে ছাড়া জগতের আরও ভালোমন্দে তাদের কোনো আগ্রহ থাকে না। আলোচ্য পোস্টমাস্টার, রতন, বিভা ও কাল্লু তেমন একরোখা। আত্মকেন্দ্রিকও বটে। তবে কেউ বেশি, কেউ কম। এরমধ্যে বিভার আত্মকেন্দ্রিক আত্মমর্যাদা-সামাজিক অবস্থানের প্রশ্নে ষোলো আনা হলেও কিছুটা সে মানবপ্রেমীও। কাল্লুকে সে চাকরি দিতে চায়, এজন্য স্বামীর কাছে সুপারিশও করে। কিন্তু যত আগ্রহ নিয়ে বিভা অনুরোধ করে, ততোধিক দৃঢ়তার সঙ্গে তার স্বপ্ন প্রত্যাখ্যান করে। ফলে কাল্লুর আর চাকরি হয় না। কিন্তু কাল্লুও সেই চাকরি চায় না। বিভার স্বামী যেমন কাল্লুকে পছন্দ করে না, তেমনি কাল্লুও তাকে সহ্য করে পারে না। তাই সে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে পুরনো পেশা জুতা সেলাইয়ের কাজেই যোগ দেয়। সেখানে বিভা অসহায়। তার কিছুই করার থাকে না। কিন্তু একজন দরিদ্র ও দীর্ঘদিনের পুরনো ভৃত্যের প্রতি যেটুকু দরদ থাকার কথা, এর বেশি কিছু তার মধ্যে দেখা যায় না। অর্থাৎ সামাজিকতা রক্ষার দায়িত্বটুকু বাদ দিলে বিভা চরিত্রে প্রেমের কোনো নিদর্শন মেলে না।

আবার পোস্টমাস্টারের কথা যদি বলি, তবে দেখি, তার হৃদয় বলে কিছু নেই। যা

আছে, তা কেবল একজন অবস্থাসম্পন্ন মানুষের দান-খয়রাতের মানসিকতা, কিংবা বলা যেতে পারে শহরের বাবুদের বখশিস দেওয়ার স্বভাব। তাতে না আছে হৃদয়ের সংযোগ, না আছে মানুষের প্রতি দরদ কিংবা সম্মানবোধ। বিপরীতে রতন যুক্তিহীনভাবে পোস্ট মাস্টারের ওপর অধিকার বজায় রাখতে চায়। চায় বলেই সে পোস্টমাস্টারের সঙ্গে যেতে চায়। এই ঘটনা প্রমাণ করে–মানুষ যার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়, তাকেই ভালোবাসতে চায়। যে ছুড়ে ফেলে, তাকেই আঁকড়ে ধরতে চায়। এ যেন অজেয়কে জয়ের দুর্মর বাসনা। আর যে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দেয়, তাকে সে অবজ্ঞা করে। এ যেন বিধির বিধান। এই চিত্র 'পোস্টমাস্টার' গল্পে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি 'বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ'য়ও। উভয় গল্পেই ভালোবাসার প্রতিদানে প্রত্যাখ্যান। অবজ্ঞার জবাবে ভালোবাসার দৃশ্য। কোথাও প্রকট, কোথাও প্রচ্ছন্ন। উপরিতলে যা-ই ঘটুক, ভেতরের চিত্র একই।

উভয় গল্পের চরিত্রগুলো নিজ নিজ অবস্থানে অনড়। কেউ নিজের অবস্থান থেকে একচুলও নড়ে না। পোস্টমাস্টার ও বিভা দুজনই উচ্চবিত্তের প্রতিনিধি, তাদের বিত্তের অহং রয়েছে। তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কের মতো জীবনসঙ্গী নির্বাচন ও বন্ধুত্বেও রয়েছে আভিজাত্যের ছোঁয়া। তারা কেউ নিজেদের সামাজিক অবস্থান ভুলে নিম্নবিত্তের সঙ্গে প্রণয়ে আবদ্ধ হবে না। এমনকি পারতপক্ষে বন্ধুত্বও নয়। নিম্নবিত্ত চিরকালই উচ্চবিত্তের দাস, সেবক। এই সত্য উচ্চবিত্তের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে গ্রথিত। তারা জানে, অর্থ যার করায়ত্ত, জগৎ তারই বশীভূত। তাই তারা 'নিছক' হৃদয়ের দামে হৃদয় কেনার মতো বোকামি করে না। তারা অর্থবিত্তের দিক থেকে সমানে সমান নীতিতে বিশ্বাসী। আচরণেও তাই। নিম্নবিত্তের রতন কিংবা কাল্লুর প্রেম-ভালোবাসা-আবেগ তাদের কাছে প্রভুভক্তি–এর বেশি কিছু নয়।

অন্যদিকে, রতন ও কাল্লু কেবল হৃদয়ের দাস। তারা বিত্তের ছলাকলা বোঝে না। অবুঝ হৃদয়ের বিনিময়ে হৃদয়ে সাড়াই আহ্বান করে। কিন্তু সেই সাড়া যে সম্ভব নয়, তা বোঝার মতো বোধ নেই। সামাজিক বাস্তবতা তাদের ধারণার বাইরে, কল্পনার অতীত। তাই তারা বোঝে না। কাল্লু বোঝো না, সে বিভার ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য নয়। রতনও মানতে চায় না, সে পোস্টমাস্টারের সংসারের কেউ না। দুটি অবুঝ হৃদয় বিত্তশালীর প্রেমে মজে, ভালোবাসায় অন্ধ হয়–অযৌক্তিকভাবে। পরিণতিতে হয় প্রত্যাখ্যাত। বেদনায় হয় লীন। আবার যেচে কেউ তাদের হৃদয়ের আকুতির কথা প্রকাশও করে না। উভয়েই যুক্তিহীন অভিমান পুষে রাখে বুকে। সেই অর্থহীন-নিষ্ফল অভিমান বুকে চেপে বেদনায় ভেঙে পড়ে। এখানে রতন ও কাল্লুতে কোনো প্রভেদ নেই। দুজনে স্বভাবে প্রায় এক, দুজনের পরিণতিও এক।

'পোস্টামাস্টার' ও 'বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ'–উভয় গল্পেরই সমাপ্তি বিচ্ছেদে। এ যেন নিয়তির লিখন। বিধাতা যেমন সৃষ্টির ললাট লিখে রাখেন, তেমনি স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ-চারুচন্দ্রও রতন-কাল্লুর ভাগ্য লিখে রেখেছেন আগে থেকেই। সেই ছক অনুযায়ীই এগিয়ে চলেছে গল্পের কাহিনি। কোথাও বিচ্যুতির লেশমাত্র ঘটেনি। পোস্টামাস্টার গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে গল্পের সমাপ্তি, সেখানে একা পড়ে থাকে রতন। আর বিভার বিয়ে হওয়ার মধ্য দিয়ে কাল্লুর সঙ্গে চিরতরে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

রতন-পোস্টমাস্টারের মিলন হয় না। কারণ রতন নিতান্তই কিশোরী। তদুপরি নিম্নবিত্তের সন্তান। বিপরীতে পোস্ট মাস্টার অবস্থাসম্পন্ন শহুরে পরিবারের সন্তান। বয়স তার পরিণত। রতনের হৃদয়াকুতি তাকে বিচলিত করতে পারে না। পরন্ত তার মনে হয়, 'পৃথিবীতে কে কাহার?' অবচেতন মনেও পোস্ট মাস্টারের মনে বিত্তের অহংই বেজে ওঠে। সেখানে হৃদয়ের দাবি পরাজিত।

রবীদ্রনাথ নিতান্ত দরিদ্র কিশোরের সঙ্গে বিত্তশালীর সম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি। না পারার কারণ, অত্যন্ত কৌশলে নারী চরিত্র এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন, যেন তার বয়স এতই কম দেখানো হয়েছে, বিত্তের প্রসঙ্গ বাদ দিলেও কেবল বয়সের অসমতার কারণেও সেই সম্পর্কের পরিণতি দেওয়া যেন সম্ভব না হয়। অসম বয়সও মিলনের পথে বাধা নয়। বিসম কিংবা অসম বয়সীদের মধ্যে পরিণয়ের ঘটনা নতুন নয়। আবার ধনী-দরিদ্র কিংবা মালিক-প্রভুতে পরিণয়ের সম্পর্ক নতুন নয়। বাস্তব জীবনে যেমন এর নজির ছিল, তেমনি রবীন্দ্র পূর্ববর্তী সাহিত্যেও দৃষ্টান্ত কম নয়। এরপরও রবীন্দ্রনাথ অসম বয়স ও শ্রেণীবৈষম্যের প্রাচীর ভাঙতে চাননি, নিতান্তই নিজের শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণেই।

রবীন্দ্রনাথের 'কৌশলী' পথ অনুসরণ করেছেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি বিত্তশালী বিভার বিপরীতে দরিদ্র কাল্লুকে সৃষ্টি করেছেন। কাল্লুর মনে প্রেম দিয়েছেন, সেই প্রেম একতরফা। বিভার মনে সামান্য দয়া দিয়েছেন, সেই দয়াও উঁচুতলার বিশালকায় প্রাচীরঘেরা। তিনিও সেই প্রাচীর টপকাতে রাজি হননি। প্রথার বিরুদ্ধে যাওয়ার মতো হৃদয়সংবেদী হননি।

০৩.

এ তো গেলো মিলের কথা। অমিলও আছে। প্রথমত পরিবেশ; দ্বিতীয়ত পটভূমি; তৃতীয়ত নারীশিক্ষা।

পোস্টমাস্টার গল্পের পটভূমি গ্রাম। ফলে বিভিন্ন ঋতুতে সেই গ্রাম কী রূপধারণ করে, তার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। সেই বর্ণনায় মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের পরিচয়ও

মেলে। সেখানে অসুস্থ পোস্টমাস্টারের সেবায় রতনের যে স্নেহময়ী রূপের পরিচয় পাওয়া যায়, তার সঙ্গে প্রকৃতি ও আবহমান বাঙালি নারীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রয়েছে। এই চিত্র চিরায়ত। রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

> এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারী রূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে, এবং এ স্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈষ্ঠ ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিক খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাধিয়া দিল, এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হাগো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি'?

কিন্তু যেই স্নেহশীলা কিশোরীর সেবায় পোস্টমাস্টার রোগমুক্ত হলো, সেই অবলাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কিংবা তার মনের খবর নেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করলো না সে। এখানে বরং পোস্টমাস্টারকে তার জন্মস্থান ইট-পাথরের শহরের মতো নির্দয় মনে হয়। বিপরীতে 'বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ' গল্পে কাল্লু কেবল বিভা ও তার সখীদের আনা-নেওয়া করতো। এরপরও কাল্লুকে স্থায়ী কোনো চাকরি দেওয়ার জন্য বিভা তার স্বামীকে অনুরোধ করে। উভয়গল্পের এই চার চরিত্র বিশ্লেষণে একটি কঠিন সত্য বেরিয়ে আসে। পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি যদি বিত্তশালী হয়, তাহলে নারীকে ব্যবহার করে মাত্র। তার কাছে নারী হৃদয়ের কোনো মর্যাদা নেই। নারীর প্রতি তার সম্মানবোধ কিংবা প্রীতিও নেই। বিশেষত অজপাড়াগাঁয়ের নিতান্ত কমবয়সী অশিক্ষিত অনাথ কিশোরী উচ্চশিক্ষিত শহুরে পুরুষের জীবনে অবাঞ্ছিতই বটে। আর বিভা নারী। তার হৃদয় কোমল। যতই উচ্চবিত্তের শহুরে প্রতিনিধি হোক, দীর্ঘদিনের পুরনো ভৃত্যের প্রতি ভালোবাসা না জন্মাক, প্রেম না জাগুক, কিন্তু নারী-হৃদয়ের শান্ত কোমল পরশটুকু আছে। সেই স্নেহশীলা নারীর পরিচয় তাকে এখানে মহৎ করে তোলে। বিভা তার স্বামীকে বলে, 'ওগো শুনছ, দেখ, আমাদের স্কুলের সেই যে সহিসটা আমার বেয়ারার কাজ করত, সে আমার এখানে কাজ করতে চায়, তাকে রাখব? তাকে এতটুকু বেলা থেকে দেখছি, বড় ভালো লোক সে।'[৮] এই অনুরোধে বিভার স্বামীর মন গলে না। বরং তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখ্যান করে। বিভা ক্ষণিকের জন্য হলেও মনক্ষুণ্ন হয়। স্নেহশীলা-মাতৃরূপের দিক থেকে দেখলে রতন ও বিভার মধ্যে কিঞ্চিৎ মিল পাওয়া যায়। সেই মিল নারী বলেই; সমান্তরাল চরিত্র হিসেবে কোনোভাবেই নয়।

পটভূমির দিক থেকে দেখলে দুই গল্পেই ভিন্নতা আছে। 'পোস্টমাস্টার' গল্পের ঘটনা ঘটে সম্পূর্ণ গ্রামে। সেই উলাপুর গ্রামের জলবায়ু-মাটি-গাছপালার সঙ্গে চরিত্রগুলোর

দিনযাপন। শহুরে পোস্টমাস্টারের হাপিয়ে ওঠা। পল্লীর অবলা রতনের দুর্বল হয়ে পড়া। যদিও পোস্টমাস্টার গল্পে গ্রামীণ দৃশ্যের বর্ণনা তেমন দেওয়া হয়নি। কেবল কাহিনির প্রয়োজনে প্রদীপ, মাটির সরা, নৌকা, বৃষ্টির মতো প্রাসঙ্গিক কিছু অনুষঙ্গ উচ্চারিত হয়েছে।

'বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ' গল্পেও একই রকম। পটভূমি শহুরের বটে। কিন্তু আমেজ অবস্থাসম্পন্ন গ্রামের। তবে সেখানে নাগরিক জীবনের ছোঁয়া মেলে। লোকজনের কথা-বার্তা এমনকি হাসি-ঠাট্টায়ও শহুরে নির্দয় আচরণের সাক্ষাৎ মেলে। বিভা যখন কাল্লুকে চাকরি দেওয়ার অনুরোধ নিয়ে যায়, তখন তার স্বামী বলে, 'কে, সেই কালো কুচকুচে শয়তানটা? সে ভালো লোক! তুমি দেখনি তার চোখের চাউনি–যেন কালো বাঘের চোখ! তাকে রেখো না, সে কোন দিন ঘাড় ভেঙে রক্ত খাবে, আমায় খুন করবে!'[৯] তার কথায় তাচ্ছিল্য আছে। অবজ্ঞা আছে। মানুষের প্রতি বিদ্বেষ আছে। বর্ণবিদ্বেষের মতো ঘৃণ্য মানসিকতা প্রকাশের প্রমান আছে। এদিক থেকে দেখলে গ্রামীণ জীবনে দয়ার্দ্র আচরণে সঙ্গে শহুরে জীবনের নিষ্ঠুরতা বড় আঘাত দেয় মানুষের হৃদয়ে।

পোস্টমাস্টার গল্পে কেবল পোস্টমাস্টারের ভালো লাগা না লাগা, আর রতনের আকুতির বর্ণনাই আছে। ওই অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা বলতে নীলকুঠিদের স্বার্থের ধারণা দেওয়া আছে। কিন্তু সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রসঙ্গে কোনো বর্ণনা নেই। শিক্ষা প্রসঙ্গে যেটুকু আছে, সেটুকু মূলত রতনের বর্ণমালা অ-আ শেখা। এর বাইরে আর কে কী পড়ে, তার কোনো বর্ণনা নেই। অথচ 'বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ' গল্প শুরেই হয়েছে নারীশিক্ষার প্রসঙ্গ দিয়ে। অর্থাৎ কাল্লু যে ঘোড়ার গাড়ির সহিস, সেই গাড়িতে চড়ে ওই অঞ্চলের কিশোরী-রা স্কুলে আসা-যাওয়া করতো। সেই স্কুলগামী বালিকা বিভাই একদিন এমএ পাস করে স্কুলের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পায়। চারুচন্দ্র গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নারীশিক্ষার অগ্রগতির বর্ণনা দিয়েছেন।

এর বাইরে বড় অসঙ্গতি চরিত্র নির্মাণ ও বিকাশে। পোস্টমাস্টারে দুটি চরিত্র। চরিত্রগুলোর মধ্যে সম্পর্ক ও কাজের সীমারেখা আছে। রয়েছে নির্দিষ্ট কাজ ও দায়িত্ব। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই চরিত্রগুলোর উপস্থিতি দেখা যায়। অন্যদিকে 'বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ'য় শুরু থেকে যেসব চরিত্র থাকে, সেগুলোর মধ্যে কাল্লু ও বিভা ছাড়া বাকি চরিত্রগুলো গল্পের মাঝখান থেকে হারিয়ে যায়। স্বাভাবিক বিকাশ কিংবা পরিণতি কোনোটাই তাদের ভাগ্যে জোটে না। পরন্তু বিভার স্বামীর আগমন ঘটে।

০৪.

শুরুতেই উল্লেখ করেছি, ছোটগল্পের বড় সুখ রাবীন্দ্রিক, বড় দুঃখও তাই। রবীন্দ্ররীতির

বিপরীতে নতুন কোনো রীতি বাংলা ছোটগল্পে আজো দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। আলোচন্য দুই গল্পেও এমন বক্তব্যের প্রমাণ মিলেছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। রবীন্দ্র-গল্পের কাহিনি বর্ণনা, চরিত্র নির্মাণ, পরিণতির রীতিই গ্রহণ করেছেন চারুচন্দ্র। অন্তত এই গল্পে তারই স্বাক্ষর মেলে। তফাত কেবল স্থানে। একটি গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত, অন্যটি শহুরে। একটিতে চরিত্র বেশি, অন্যটিতে মাত্র দুটি। এর বাইরে উভয় গল্পেই বিচ্ছেদের সুর, উভয় গল্পেই ধনীর উন্নাসিকতা, দরিদ্রের হাহাকার প্রকাশিত। রবীদ্রনাথ সমাজের যে সম্মানকে উঁচুতে তুলে ধরেছেন, হৃদয়াকুতির দাম দেননি; চারুচন্দ্রও তাকে সেখানে রেখেছেন। আভিজাত্যের দেয়াল ডিঙিয়ে মানবপ্রেমের জয়গান গাননি। তারা উভয়েই আভিজাত্যের পূজারি, কেউই প্রেমের বংশীবাদক নন।

উভয় লেখকই ব্রাত্যজনের মনে প্রেম দেখেন, কিন্তু সেই প্রেমের পরিণতি দেন না। তারা উচ্চবিত্তের প্রতি নিম্নবিত্তের প্রেমকে প্রভুভক্তি-পূজা হিসেবেই দেখেন। অধিকার হিসেবে নয়। তারা উচ্চবিত্তের নর-নারীর প্রতি নিম্নবিত্তের প্রেমানুভূতিকে নিতান্তই পরিহাসের ছলে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ-চারুচন্দ্র দুজনেই ব্রাত্যজনের মনে প্রেম দিয়েছেন, কিন্তু ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার দেননি। তাদের দুজনের চোখেই ব্রাত্যজন, কেবলই সংখ্যা, তাদের হৃদয়ের দাবি থাকতে পারে না, সেই দাবির মূল্য নেই। স্রষ্টা হিসেবে দুজনেই নিষ্ঠুর, অমানবিক; উচ্চবিত্তের প্রতিভূ।

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পোস্টমাস্টার', গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, পুন:মুদ্রণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা: ১৯
২. তদেব, পৃষ্ঠা: ২০
৩. তদেব, পৃষ্ঠা: ২০
৪. তদেব, পৃষ্ঠা: ২১
৫. তদেব, পৃষ্ঠা: ২১
৬. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বায়ু বহে পূরবৈয়াঁ, সমরেশ মজুমদার সম্পাদিত একশ বছরের সেরা গল্প, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পুনঃপ্রকাশ, ২০২১, পৃষ্ঠা: ৪৫
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পোস্টমাস্টার', গল্পগুচ্ছ মৌ প্রকাশনী, বাংলাবাজার ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০১১, পৃষ্ঠা: ১৯
৮. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বায়ু বহে পূরবৈয়াঁ, সমরেশ মজুমদার সম্পাদিত একশ বছরের সেরা গল্প, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পুনঃপ্রকাশ, ২০২১, পৃষ্ঠা: ৪৭
৯. তদেব, পৃষ্ঠা: ৪৭

এনইউবি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা
(Peer-Reviewed Journal)
ISSN : 2710-4451
বাংলা বিভাগ
নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২২

সৈকত রক্ষিতের গল্প: পুরুলিয়ার জনজাতি প্রসঙ্গ

নাড়ুগোপাল দে*

সার-সংক্ষেপ: ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ১ নভেম্বর পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি হয়। এর পূর্বে পুরুলিয়া ছিল বিহারের মানভূম জেলার সদর মহকুমা। বিহারের বাসিন্দা হলেও পুরুলিয়ার মানুষের বঙ্গসংস্কৃতির প্রতি অদ্ভুত নাড়ির টান ছিল। পুরুলিয়ার মানুষজন বাংলা ভাষাতে কবিতা, যাত্রা, নাটক, লোকনৃত্য, লোকগান প্রভৃতির মাধ্যমেই পুরুলিয়ার সাংস্কৃতিক চর্চায় রত ছিল। পুরুলিয়া জেলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা জোরালো শুরু হয় অধ্যাপক সুবোধ বসুরায়ের হাত ধরে। তিনি 'ছত্রাক' (১৯৭১) পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে পুরুলিয়াকে মুখ হিসাবে তুলে ধরলেন। পুরুলিয়া জেলার কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– সৈকত রতি, জ্যোৎস্না কর্মকার, সিরাজুল হক, পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য গুপ্ত, শূদ্রক ওরফে রবি মুখোপাধ্যায়, বিমল লামা, কল্যাণ ব্যানার্জী, সুবোধ বসুরায়, ধ্রুবানন্দ মাহাত প্রমুখ।

সৈকত রক্ষিত (জন্ম : ১৯৫৪) বর্তমান পুরুলিয়া জেলার কথাসাহিত্যে 'মুকুটহীন সম্রাট'। তিনি পুরুলিয়া জেলার মানবাজার সংলগ্ন সিন্দরী গ্রামে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। পুরুলিয়ার মুনসেফডাঙ্গার এক পাঠশালায় 'ইউ.পি. স্কুলে' তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। পরে পুরুলিয়া জিলা স্কুলে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর পুরুলিয়ার পলিটেকনিক কলেজে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হন। তিনি উক্ত পলিটেকনিক কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারেননি। এর অন্যতম কারণ সাহিত্যের প্রতি তাঁর অমোঘ আকর্ষণ। তিনি সাহিত্য জীবনকে প্রধান অবলম্বন করলেন। সুখী দাম্পত্য জীবন তাঁর কাছে গৌণ হলো। সাহিত্য তাঁকে দিয়েছে দারিদ্র, একাকিত্ব এবং নিঃসঙ্গতা। তাঁর সমস্ত সাহিত্য জীবনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পুরুলিয়ার ভূ-প্রকৃতি,-টাঁড় অঞ্চল, রুখু-সুখু জনজীবন, সংস্কৃতি, আর আছে মানভূঁএঞা ভাষার ব্যবহার। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের পরতে পরতে আছে পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি-লোকগান, লোকনৃত্য, ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা প্রভৃতি।

সৈকত রতি তাঁর সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে তিনি নিজেই এক জায়গায় লিখেছেন :

> সাহিত্যচর্চা আমার অন্তর-জীবনে 'মধুর-একাকীত্ব' এনে দিয়েছে। একাকিত্ব বেদনার, অবজ্ঞা-অপমান-দারিদ্র্য-বেদনার। কিন্তু এই সব অনুভূতিতে কাতর না হয়ে, আমি সেই জর্জরিত অভিজ্ঞতাগুলোকেই সৃজন কর্মের প্রেরণার উৎস করে নিই। যার ফলে আপাত বিচারে যা হতাশা ও প্রতিবন্ধকতা বলে মনে হয়, আমার কাছে তাই চ্যালেঞ্জ।[১]

২.

সৈকত রক্ষিতের গল্প সংকলনের সংখ্যা পাঁচটি। এগুলি হলো-*আরাম চেয়ার* (১৯৮০), *জন্মভূমি বধ্যভূমি* (১৯৮৮), *উঠোরে পুতা জাগোরে পুতা* (১৯৮৮), 'মাড়াইকল' (১৯৯৪), *বাঁশ বাগানের মাথার উপর* (২০০২), এবং *উত্তরকথা* (২০১৫)। সৈকত রক্ষিতের উপন্যাসের সংখ্যা বারোটি। এগুলো হলো- *আকরিক* (১৯৯৪), *হাড়িক* (১৯৯০), *অক্ষৌহিণী* (১৯৯৬), *ধূলা উড়ানি* (১৯৯৬), *বৃংহন* (২০০০), *সিরকাবাদ* (২০০১), *সিঁদুরে কাজলে* (২০০২), *মহামাস* (২০০৫), *মদনভেরি* (২০০৮), *স্তিমিত রণতূর্য* (২০১৪), *বৈশম্পায়ন কহিলেন* (২০১৪), এবং *জয়কাব্য* (২০১৫)।

ভারতবর্ষে বসবাসকারী জনজাতিগুলোর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের ধারাবাহিক ইতিহাসের বড়ই অভাব। ব্রিটিশ সরকারের আমলে তৈরি হওয়া উপজাতিদের পরিচয় বর্তমানে পাওয়া বড়ই দুষ্কর। এ প্রসঙ্গে পুরুলিয়ার গবেষক তরুণদেব ভট্টাচার্যের মন্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন : "নৃতাত্ত্বিক যে বৈশিষ্ট্যের উপর উপজাতিগুলির স্বাতন্ত্র্য গ্রথিত ছিল, সহস্রাধিক বৎসরের সংমিশ্রণের ফলে গোষ্ঠীগুলির মূল কাঠামো অবলুপ্ত হয়েছে। চেহারা, চরিত্র, ভাষা, দৈনন্দিন জীবনযাপনের ধারা-সবই ধীরে ধীরে রূপান্ত রিত হয়েছে বিমিশ্র উপাদানে।"[২]

এ প্রসঙ্গে পুরুলিয়ার আর এক গবেষক অনিমেষ ব্যানার্জী জানাচ্ছেন, এরপরে আরো প্রশ্ন আসে যে, বর্তমান পরিপ্রেতিতে, বিশ্বায়নের অমোঘ প্রভাবে জনজাতিগুলির বিভিন্ন সময়ে জানার বা অনুসন্ধান করার আদৌ কোনো যৌক্তিকতা আছে? এক্ষেত্রে আমাদের দুটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। প্রথম বিষয়টি হল, আমাদের আলোচ্য জেলার নাম পুরুলিয়া। এই জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা অনেকাংশে মৌলিক। এই জেলায় বিশ্বায়নের করাল গ্রাস ততটা থাবা বসাতে পারেনি। এই জেলায় জনজাতিগুলির

* প্রফেসর ও ডিন, কলা অনুষদ, সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়,
পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

মৌলিকতা এখনো কিছু পরিমাণে রক্ষিত আছে। আর দ্বিতীয় বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে, তা হল জনজাতিগুলো রূপান্তরের পথে চললেও রূপান্তরের প্রকৃত চেহারাটি আজো স্পষ্ট নয়। জনজাতিগুলোর দৈনন্দিন জীবনচর্যা, আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহরীতি, পেশা, পরম্পরার মূল ধারাটি কিয়দংশে অত আছে। যে ধারাগুলোকে গভীরভাবে অনুধাবন না করার কোনো কারণ নেই।

> J.D Beglar-এর 'Report a Tour Through the Bengal Provinces etc. in 1872-73' H. Coupland-এর 'Bengal District Gazetteers, Manbhum'এবং H.H. Risley-এর 'The Tribes and Castes of Bengal' VOL.-1 অনুসারে জানা যায় নানা জনজাতি ও সম্প্রদায়ের বাস পুরুলিয়া জেলায়। কুড়মি, সাঁওতাল, ভূমিজ, বাউরি, খেড়িয়া শবর, রাজোয়ার, মাহালি, সর্দার, মুচি প্রভৃতি বিভিন্ন উপজাতির মানুষ এই জেলায় বাস করে এবং তাদের জনজাতির মৌলিক জীবনচর্যার ধারাকে বহন করার চেষ্টা করে।[৩]

সৈকত রক্ষিতের বিভিন্ন ছোটগল্পে পুরুলিয়ার বিভিন্ন জনজাতির প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

১. সাঁওতাল প্রসঙ্গ :

সৈকত রক্ষিতের 'রাঙামাটি', 'আরোপ', 'চাপান-উতোর', 'ছল', 'উৎখাতের পটভূমি', 'শীষ-ওঠা লণ্ঠন ও রাইমণি বাস্কের মুখ' প্রভৃতি ছোটগল্পে সাঁওতাল জনজাতির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে।

'রাঙামাটি' গল্পে দিগন্তবিস্তৃত ভূমি ও উদার-ব্যাপ্ত প্রকৃতি থাকা সত্ত্বেও সাঁওতালদের ঘরের কাঠামোগত একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। সৈকত রক্ষিতের ভাষায় :

> জঙ্গলের একাংশে তাদের চৌকো চৌকো ঘর। মাথায় শালপাতার টুপির মতো বসানো খড়ের চালা। দূর থেকে দেখলে অনেকটাই গোলাকার লাগে। আর দু-ঘরের মধ্যবর্তী গলি যথেষ্ট সঙ্কীর্ণ বলে, এক ঘরের চাল ছুঁয়ে, মনে হয়, ফুঁড়ে উঠেছে বুঝি আরেকটি ঘর। এমনি নিবিড় তাদের সহাবস্থান।[৪]

এরা আধুনিক সভ্যতা থেকে দূরে নিবিড়ভাবে নিরিবিলিতে বসবাস করার জন্যই হয়তো তারা পুলিশ-প্রশাসনের শাসন ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করতে চায় না। পরিবর্তে এরা স্ব-গঠিত শাসন ব্যবস্থায় আস্থা রাখতে চায়। তারা তাদের বিচার ব্যবস্থায় সিদ্ধান্তও তাদের স্ব-গঠিত শাসনতন্ত্রের মাধ্যমেই নিয়ে থাকে।

'রাঙামাটি' গল্পে দেখা যায়, সঞ্চারিণীর প্রতি ডাইনি আরোপের নিমিত্ত গ্রামবাসীর সঙ্গে বনমালীর পরিবারের টানাপড়েন চলতে থাকে। সুষ্ঠু বিচারের আশায় বনমালীর ভাই কালি হাঁসদা পুলিশের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে গ্রামবাসী তা মানতে চায় না :

> 'পুলিশ-ফুলিশ বাদই দাও।' পশুপতি বলল, 'সমাজের ভিৎরের গণ্ডগোল হামদের

> সমাজ মেট্‌মাট করবেক। পুলিশ কিসের?' 'হুঁ। হামদের পর্ধান আছে'। মুখিয়া-মড়ল আছে। ভিড়ের মধ্যে তাদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে গুণ্ডা চিনিয়ে দেবার চেষ্টা করে।[৫]

'মাড়াই কল' গল্পেও সৈকত রক্ষিত সাঁওতাল জনজাতিকে গল্পের বিষয় হিসাবে তুলে ধরেছেন। লেখক অত্যন্ত স্বল্পকথায় চেপুলাল বেশরার শরীরের বর্ণনা দিয়েছেন :

> চেপুলাল বেশরার শরীরে মাংস আর নেই বললেই চলে। শরীরটা তার একটা সুষম ছন্দ ও রীতিতে গাঁথা, যেন হাড়ের মালা। অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গের ঠোকাঠুকি লাগলে ছন্দের কোনো কোমলতা সে টের পায় না। পায় এক ধাতব অনুরণন। দৃশ্যত, তার শরীরে, বাড়তি হাড় যেমন কিছু আছে, তেমনি আছে বাড়তি কিছু উপাদানও। তার ভুরুর পাকা ও মোটা লোমের রাশি, তার বেড়ে ওঠা নখ-যা অপরিচ্ছন্নতার দরুন নীল থেকে কালো হয়ে উঠেছে। আর সারা গায়ে-পিঠে ময়লা, যা আলাদা করে ময়লা বলে আর বোঝা যায় না। ময়লার রং হয়ে উঠেছে তার গায়ের রং। এমন মেটে মেটে গায়ের সঙ্গে অদ্ভুত এক প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য নিয়েই পাংশুটে চুল দখল করে আছে তার গর্দানের ওপর ভারি মুণ্ডুটি। চোখের কোলে পিচুটি জমে। এবং জমলে, পাতা সহজে খুলতে পারে না চেপুলাল। হয়ত তার কষ্টই হয়।[৬]

সাঁওতাল জনজাতির মানুষেরা প্রকৃতির দিক থেকে সরল, কিছুটা বোহেমিয়ান প্রকৃতির। এরা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সাংসারিক জীবনে ধরা দিতে চায় না। এরা পান-ভোজন, আনন্দ-স্ফূর্তিতেই বেশি থাকতে পছন্দ করে। এরা কর্মঠ, আবার ততোধিক উদাসীন নিজেদের কর্ম ও তাদের জীবন সম্পর্কে। এ প্রসঙ্গে Coupland সাহেবের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য :

> ... they also good worker and many go to the mines for employment, there they earn money quickly, much of which they spend in drink; once they have accumulated some small savings they return to villages and live at home until these are exhausted, when they return to work once more.[৭]

২. শবর প্রসঙ্গ :

পুরুলিয়া জেলার শবর জনজাতি খেড়িয়া নামে পরিচিত। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এই জনজাতিকে অপরাধপ্রবণ জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে Coupland সাহেবের মন্তব্য :

> "… they have an unenviable reputation as professional thieves and burglars."[৮]

Coupland সাহেবের মন্তব্যের প্রতিধ্বনি আমরা লক্ষ করি কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিতের 'খাদ' গল্পে :

> একটা সময় ছিল যখন অধিকাংশ শবরদের কাজ ছিল চুরি-ডাকাতি করা। তাদের ক্ষেত-লাঙল-গরু কিছুই ছিল না বলে, এটাই তাদের জীবনধারণের উপায় হয়ে

দাঁড়িয়েছিল।[৯]

মহাশ্বেতা দেবীর 'অর্জুন' গল্পে শবর জনজাতির অপরাধপ্রবণতার নেপথ্য কারণটি উল্লেখিত হয়েছে :

> "আমার দিন গেলে চারটে টাকা চাই। গাছ কাটতে বলো কেটে দেব, মানুষ কাটতে বলো, কেটে দেব।"[১০]

তবে, বর্তমান দিনে, শবরদের অপরাধপ্রবণ জাতি বলা যায় না। সরকার তাদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সৈকত রক্ষিত 'শবরচরিত' গল্পে পুরুলিয়ার ভেলাইডাঙা গ্রামের শবরদের জীবন ও কর্মের কিছু পরিচয় দিয়েছেন। তারা জঙ্গল থেকে 'গেঁঠালা' পেড়ে মহাজনকে বিক্রি করে, কখনো বিক্রি করে জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা কুসুমবিচি। জঙ্গলের গেঁঠালা, কুসুমবিচির সংগ্রহ শেষ হলে শবররা অন্য পেশাতে যায় সামান্য অর্থ উপার্জনের তাগিদে। যতদিন না ক্ষেতে লাঙল নামছে, ততদিন ভেলাইডাঙার ভূমিহীন শবররা কালাপাতির সাঁওতালদের ঘরে ঘরে খাটবে। সৈকত রক্ষিতের ভাষায়:

> আজ বলে নয়, আবহমানকাল ধরে রুয়ারুয়ির সময়ে, কাটাইয়ের সময়ে, খামারে ফসল তোলা ও ঝাড়াইয়ের সময়ে শবররাই তাদের বিশ্বস্ত জনমজুর। কখনো তারা ঘরামিরও কাজ করে। দুরের ডুংরি থেকে কাঁধে কাঁধে দলবদ্ধভাবে তারা পাথর বয়ে আনে, জল টেনে আনে, মাটি কেটে আনে। তখনো মাঁএগা-মরদ সমান। সারাটা দিন ধরে বুক টনটন করলেও শবর মা তার ক্রন্দনরত শিশুটিকে মাই দিতে পারে না।[১১]

শবরদের পোষাক পরিচ্ছদের বর্ণনা দিয়েছেন সৈকত রক্ষিত :

> তাদের ছেলেমেয়েরা অনেকটা বয়স পর্যন্ত উলঙ্গ ঘুরে বেড়ায়। ছেলেদের লিঙ্গ ডাঁটো হওয়া পর্যন্ত ভেলাবিচি বাঁধা ঘুনসিও গায়ে থাকে না। পুরুষদের কোমরে জড়ানো একটা মোটা ও ঠেঁটি ধুতি, যা ময়লা জমে জমে আরো বেশি মোটা ও ভারি হয়ে থাকে। মেয়েরাও তেমনি একটি শাড়িকেই সারাগায়ে ঘুরিয়ে পরে। তাহলেও আঁচল দিয়ে তাদের আবলুস রঙের সচ্ছল বুক তারা ঢাকতে পারে না। কখনো একটা বুক উদোম চেয়ে থাকে।[১২]

'খাদ' গল্পে শবর জনজাতির মরমি মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে :

> কালীনাথ কেন, শবরপাড়ার কারো সঙ্গে শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে তার এই নিরুৎসাহের মধ্যে মোটেই মূর্খতার অহংকার নেই। রয়েছে বঞ্চনার উদাসীন বেদনা।[১৩]

৩. মুচি বা চর্মকার প্রসঙ্গ :

চামার, মুচি, চর্মকার তথা রবিদাসের পরিচয় দিতে গিয়ে এক জনজাতি-গবেষক লিখেছেন : "পশু চর্ম ছাড়ানো (খালানো), পাকানো (পাকা করা, tan) এবং তার দ্বারা

পাদুকা ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত সংকীর্ণ এক উপ-সম্প্রদায় চর্মকার বা চামার।"[১৪]

চামার জনজাতি প্রসঙ্গে Dr. Brigges-এর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

> "The tanners of leather, the preparers of skin, the manufacturers of leather articles, and the makers of shoes belong to a well defined class in the Indian social order. Most of the workers, in Upper India, are today included under the general term chamar."[১৫]

মানবাজার নিকটবর্তী জুয়ালকাঠি, ঘাগরা, কাশিডি, ভালুবাসা, বামনি, পিয়ারশোল প্রভৃতি গ্রামে বসবাসকারী দরিদ্র মুচি সম্প্রদায়ের অনাড়ম্বর ও নিতান্ত অবহেলাপূর্ণ গৃহকাঠামোকে গল্পকার সৈকত রতি 'আঁকশি' গল্পে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। লেখকের ভাষায় :

> "জুয়ালকাঠি জঙ্গলের প্রান্তে তার বসবাস অনেকটা গ্রাম্য ও আদিমতাপূর্ণ। মাটির যে ঘরটিতে, প্রকৃত অর্থে, মাথা গুঁজে সে থাকে, তার মধ্যে সভ্যতার লেশমাত্র নেই। সরল হাতে চৌকো করে তোলা মাটির পাতলা দেয়াল। তার মাঝে খোঁটা পুঁতে ঢালু করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে চালার ঠাট। জঙ্গলের মহুল গাছ কেটে বানানো এই চালা খড় দিয়ে ছাইতে পারেনি মাগারাম। ধান হয় তার সামান্য। খড়ের বদলে তাই সাউড়ি ঘাস কেটে, চালায় সে গুচ্ছ গুচ্ছ ফেলে দিয়েছে। সেগুলো চিহড় লতা দিয়ে শক্ত করে বাঁধা।
> ঘরের চারপাশ একটা এবড়ো-খেবড়ো পাঁচিলে ঘেরা। তার কতকটা কেটেই যেন আনাগোনার জন্য 'সদর' করা হয়েছে। সেখানে মুখোমুখি পোঁতা দুটো মোটা কাঠ। এই দুটো কাঠের গায়ে, খোপের মধ্যে, আড়াআড়ি কয়েকটা গাছের ডাল ঢুকিয়ে দিলে সেটা দরজার মতো হয়।"[১৬]

বাসস্থানের আকৃতি ও প্রকৃতি দেখলেই বোঝা যায় মাগারাম মুচির দারিদ্র্য কতখানি। তাদের দুর্দিনের শেষ নেই। চৈত্রের দিনগুলিতে এমনও হয় যে, পেটে পানিও সে জোটাতে পারে না। তখন তারা ভুট্টা সেদ্ধ করে, ল্যাটো করে খেয়েও ক-টা দিন হায় করে বাঁচে। এই 'নিজেকে ভেঙেচুরে চৌচির করেও বাঁচার মধ্যেও' সে একটা মাদকতা অনুভব করে। এই মাদকতার বশে মাগারাম ভিন্ন ভিন্ন পেশার কাজ অকেশে করে দেয়। লেখক এই বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে 'আঁকশি' গল্পে তুলে ধরেছেন :

> "সেই মাদকতার বশে সে দিনমজুরের ঘাম ফেলে। মাটি কাটে। পাথর ভাঙে। কোনো অন্তর্নিহিত প্রতিবাদ ছাড়াই লাঙল ঠেলে ঠেলে, অন্যের জমিতে আবাদ ফলিয়ে দেয়। আবার কখনো নিতান্ত নিরুপায় হলে, জীবিকার তাড়নায় সে কেবল ঘুরেই বেড়ায়। গ্রাম-গ্রামান্তরে। জঙ্গলে। তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে তার পরিবারও। বেদনি, নুনু, লীলকমল।"[১৭]

এই প্রসঙ্গেই আসে 'হাম্বা' গল্পের চরিত্র গোবিন্দ মুচির নাম। সে পুরুলিয়ার মতো খরা-পীড়িত প্রান্তিক জেলায় পূর্ব পুরুষের ঐতিহ্যশালী পেশাকে অবলম্বন করে বাঁচতে চায়।

সে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের ভাগাড়গুলো ঘুরে ঘুরে চামড়া ও শিং সংগ্রহ করে বেড়ায় এবং সে নিকটবর্তী আড়তদারের কাছে তা বিক্রি করে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করার চেষ্টা করে :

> "এ-গ্রাম সে-গ্রাম শিং সংগ্রহ করা এবং পরে তাঁকে নিকটবর্তী আড়তদার বা মহাজনের কাছে বেচে আসা তার কাজ।"[১৮]

তবে মাগারাম মুচি ও গোবিন্দ মুচি দুজনেই অর্থ কষ্ট থেকে বাঁচতে প্রয়োজনে অন্য পেশাও গ্রহণ করে। 'আঁকশি' গল্পের মাগারাম তুলা সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। অন্যদিকে, 'হাম্বা' গল্পের গোবিন্দ মুচি খেত মজুর খাটে, দড়ি খাট বুনে জীবিকা অর্জন করে স্বপেশার অভাবে।

৪. পাইটকার প্রসঙ্গ :

সৈকত রক্ষিত তাঁর 'পট' গল্পে 'পাটিকার'দের পরিচয় নিখুঁতভাবে দিয়েছেন। লেখকের ভাষায় :

> "আমি মরা-হারা ঘর খুঁজে খুঁজে ঘুরি।
> 'অ তার মানে তুমি হলে, যাকে বলে পাটিকার? তাইলে ত তুমাকে বহুত রাউন্ দিতে হয়।'

বহুত। পুবে-পশ্চিমে-উত্তরে-দক্ষিণে চারো তরফে আমাদের ডিব্‌টি করতে হয়। তবে হঁ, আমরা কি আর নিজে নিজে ঘুরি। আমাদেরকে ঘুরায়।"[১৯]

গল্পকার 'পাটিকার' এক সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন, যারা আঞ্চলিক ভাষায় পেটো নামে পরিচিত। এদের উপাধি চিত্রকর। পাইটকারদের এক সম্প্রদায় চুদান পটের মাধ্যমে মৃতের বাড়িতে গিয়ে, মৃত ব্যক্তির ভূত-ভবিষ্যতের বর্ণনা দিয়ে তাদের আত্মীয়-পরিজনদের কাছ থেকে কিছু অর্থ ও উপঢৌকন আদায় করে। এই অর্থ ও উপঢৌকনের উপরেই এই সমস্ত পাইটকার সম্প্রদায়ের জীবন নির্ভর করে।[২০]

সৈকত রক্ষিত 'পট' গল্পটিতে পাইটকার জনজাতির পেশা, পেশা-সংকট এবং সেই সঙ্গে অস্তিত্ব সংকটের কথা তুলে ধরেছেন। গল্পসূত্রে জানা যায় যে, পাইটকাররা মুসলমান গৃহ বাদ দিয়ে প্রায় সমস্ত জাতের হিন্দু ঘরে প্রবেশ করে। বিশেষ করে মড়াঘরে এবং তাদের জাতিগত জন্মবৃত্তান্তের কাহিনি বলে, অবিশ্বাসী মনে বিশ্বাসের ভরসা জাগিয়ে নিজেদের চিরাচরিত পেশাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে। তবে তারা শিক্ষিত মানুষকে ভয় পায়। তারা জানে শিক্ষিত পরিবার তাদের পেশাগত লোকবিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মকে বিশ্বাস করে না এবং সুযোগ পেলে অপমান করেও থাকে।

'পট' গল্পে আমরা দেখি যে, গুহিরামের মতো পাইটকাররা নিজেদের পেশায় আর আস্থা

রাখতে পারছে না। অস্তিত্ব সংকট থেকে উত্তরণের জন্য তারা নিজের পেশা বহির্ভূত অন্য কাজে ঝুঁকে পড়েছে। এছাড়া তাদের উপায় নেই। গল্পকার সৈকত রতি তাঁর 'পট' গল্পে পেশাগত অভিযোজনের রূপটি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন :

> "বয়স পঞ্চাশের ওপর হলেও অমূল্য পাইট্‌কার এখনও বেরোয়। মেয়েজামাই নিয়ে তার সংসারটিও গ্রামের সবার চেয়ে বড়। কিন্তু তার সংসারের সবাই যে এই বৃত্তি গ্রহণ করেছে, তা নয়। অমূল্যের জামাই রিকশা টানে। বড় ছেলে কোনোদিন বেরোয় আবার কোনোদিন সে বেরোতেই চায় না। তার এই খামখেয়ালিপনাকে কেউ কেউ মাথার ছিট বলে মনে করে। আসলে, রোদে জলে ঝড়ে বাপকে দেখতে দেখতেই সে বেঁচে থাকার এই নিষ্ঠুর অবলম্বন থেকে পিছু হটতে শিখছে।"[২১]

৫. সহিস প্রসঙ্গ :

পুরুলিয়ার বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সহিস। লেখক সৈকত রক্ষিত 'লক্ষ্মণ সহিস' গল্পে সহিসের পেশাগত নৈপুণ্য, জীবন-সংগ্রাম এবং যুগের সঙ্গে অভিযোজিত হয়ে যাওয়ার নানা চিত্রও প্রকাশ করেছেন। মুচি তথা চামার জনজাতির যেমন জাত ব্যবসা ছিল গবাদি পশুর চামড়া নিয়ে, তেমনি সহিস সম্প্রদায়ের জাত ব্যবসা মোষের শিং নিয়ে। সহিসরা মোষের শিং থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় চিরুনি প্রস্তুত করে জীবিকা নির্বাহ করে।

'লক্ষ্মণ সহিস' গল্পের পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে পুরুলিয়ার নির্জন ল্যাদামহুল অঞ্চল। নির্জন স্থান বেছে নেওয়ার কারণ, কাঁচা মোষের শিং ধীরে ধীরে শুষ্ক হবার সময় পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে অসহ্য পচা দুর্গন্ধ। এই পচা দুর্গন্ধের জন্যই অবশ্য সহিসদের ঘনবসতি এলাকা থেকে দূরে নির্জনে বসতি গড়তে হয়। এই কদর্য মোষের সিং-ই সহিসদের শৈল্পিক নৈপুণ্যে গড়ে ওঠে মনোহর চিরুনি।

গল্পে দেখা যায়, ল্যাদামহুল অঞ্চলে বাস করে মাত্র তেরোটি সহিস পরিবার। এদের জাত ব্যবসা মোষের শিং থেকে চিরুনি উৎপাদন করে তা বাজারে বিক্রি করা। এই ভাবেই তারা জীবিকা অর্জন করত। কিন্তু, কালক্রমে দেখা যায়, বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারার জন্য এ ব্যবসা ক্রমশ ম্রিয়মান। বর্তমানে মাত্র তিন ঘর মানুষ এ ব্যবসায় যুক্ত। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পী লক্ষ্মণ সহিস। সে সত্যিকারের জাত শিল্পী। সে তার শিল্পকে অন্তর থেকে ভালোবাসে এবং পেশাগত উৎকর্ষে স্বপ্ন দেখে। কিন্তু বাজারে আসা সুলভ প্লাসটিকের চিরুনির সঙ্গে সহিসদের হাতে গড়া তৈরি মোষের শিং এর চিরুনি প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। মোষের চিরুনি বিক্রি কমতে কমতে এক সময় বন্ধ হয়ে যায়। শিল্পী সহিসরা অন্য পেশা অবলম্বন করে। যেমন, কৃষিকাজ। আবার অবৈধ কাঠ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রচুর মুনাফাও অর্জন করে। লেখক স্বল্প কথায় পেশা

হারানো লক্ষ্মণ সহিসের অব্যক্ত যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি ও বিবর্তন তুলে ধরেছেন:

> তিন-চার বছর আগে, নিরঞ্জন যখন শিংয়ের পাট তুলে দিল, লক্ষ্মণ আধাআধি দামে কিনেছিল তার হাতিয়ারগুলো। আজ কে কিনবে, লক্ষ্মণের মরচে পড়া সরঞ্জাম? কাঠের বাক্সর কোণে পড়ে থাকা চিরুনিটা পেয়ে, সে চিরুনির গায়ের ধুলো মুছে দেখে। এবং চিরুনির প্রতিটি নিখুঁত দাঁড়ের মধ্যে কল্পনা করে তার অতীতের শ্রমরত প্রতিচ্ছবি। আর সেই পরিচিত ঘ্রাণের জন্য আনচান করে ওঠে তার ভেতরটা।
> জোড়ে এখন আর জল নেই। গ্রামে সূত্রপাত ঘটে খরার। ছেঁড়া কাঁথা গায়ে জড়িয়ে, লক্ষ্মণ, কোদাল হাতে চলে যায় শহরের দিকে।[২২]

সৈকত রক্ষিত বর্তমান সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক। পুরুলিয়া জেলার ভূমিপুত্র এই মানুষটি পুরুলিয়ার কৃষ্টি-কালচার, ভূপ্রকৃতি, জনজীবন তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে-বিশেষত ছোটগল্পে। পুরুলিয়া জেলায় বসবাসকারী বিভিন্ন জনজাতির প্রতি তাঁর ছিল এক অদ্ভুত মমত্ব এবং সহানুভূতি। এই সহানুভূতি থেকে তাঁর গল্পে একের পর এক জনজাতি উঠে এসেছে নিখুঁত এবং বাস্তবসম্মত হয়ে। তিনি যা দেখেছেন তা একেবারে চোখ কাছে নিয়ে গিয়ে। তিনি তাদের সঙ্গে মিশেছেন। এই কারণের জন্য পুরুলিয়ার বিভিন্ন জনজাতির প্রত্যেকটি চরিত্র একেবারে নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে তাঁর গল্পের পৃষ্ঠায়। এখানেই সৈকত রক্ষিতের শ্রেষ্ঠত্ব।

তথ্যসূত্র :

১. রক্ষিত সৈকত, "গল্পকারের ভাবনা", কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত, সম্পাদনা পলমল অরূপ, ডাভ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা ২০১৩, পৃ. ৩৩
২. ভট্টাচার্য তরুণদেব, "পুরুলিয়া", ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা : ৭০০০১২, তৃতীয় প্রকাশ ২০১৪, পৃ. ২১৩
৩. ব্যানার্জী অনিমেষ, বাংলা কথাসাহিত্যে পুরুলিয়া : সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষা, পাণ্ডুলিপি দ্র. (পৃ. ১৮৮)
৪. রক্ষিত সৈকত, "উত্তরকথা", সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ, পারুল প্রকাশনী, রাঙামাটি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯, প্রথম পারুল সংস্করণ ২০১৫, পৃ. ১৬৬
৫. তদেব, পৃ. ১৭৪
৬. তদেব, পৃ. ৩৬
৭. Coupland H. Bengal District Gazetteers, Manbhum. Bengal Seeretarial Book Depot, Calcutta, 1911, চ. ৭৭.
৮. তদেব, পৃ. ৭৭
৯. রক্ষিত সৈকত, "খাদ", 'বাঁশবাগানের মাথার উপর', অন্যরূপ, হাওড়া : ৭১১৩০২, মার্চ ২০০২, পৃ. ১০৪
১০. দেবী মহাশ্বেতা, "অর্জুন" মহাশ্বেতা রচনা সমগ্র, চতুর্দশ খণ্ড, দে'জপাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৪০৪
১১. রক্ষিত সৈকত, "শবর চরিত", 'উত্তরকথা', সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ, তদেব, পৃ. ২২০

১২. তদেব, পৃ. ২১২-২১৩
১৩. রক্ষিত সৈকত, "খাদ", 'বাঁশবাগানের মাথার উপর', তদেব, পৃ. ১০৬
১৪. ঘোষ প্রদ্যোত, বাংলার জনজাতি (প্রথম খণ্ড), পুস্তক বিপণি, কলকাতা : ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২১২
১৫. Briggs G.W. "The Chamers", Association Press, S Russell Street, Calcutta; 1920, চ. ১১
১৬. রক্ষিত সৈকত, "আঁকশি", 'উত্তরকথা', তদেব, পৃ. ১২
১৭. তদেব
১৮. রক্ষিত সৈকত, "হাম্বা", 'উত্তরকথা', তদেব, পৃ. ১৩৮
১৯. রক্ষিত সৈকত, "পট", 'উত্তরকথা', তদেব,পৃ. ৮৮
২০. মাঝি মধুসূদন, "পটুয়া ও পটশিল্প", 'প্রসঙ্গ : পুরুলিয়া' প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা রায় সুভাষ, বর্ণালী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১০, পৃ. ২৬৮-২৬৯
২১. রক্ষিত সৈকত, "পট", 'উত্তরকথা', তদেব, পৃ. ৯২
২২. রক্ষিত সৈকত, "লমণ সহিস", 'উত্তরকথা', তদেব, পৃ. ৭০

সহায়ক গ্রন্থ : ব্যানার্জী অনিমেষ, 'বাংলা কথাসাহিত্যে পুরুলিয়া : সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষা', গবেষণা নিবন্ধ, পাণ্ডুলিপি দ্রষ্টব্য।

এনইউবি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা
(Peer-Reviewed Journal)
ISSN : 2710-4451
বাংলা বিভাগ
নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২২

আধুনিক বাংলা কবিতায় *মনসামঙ্গলের* নতুন পাঠ

সঞ্জিৎ সরকার*

সার-সংক্ষেপ: বাংলা মধ্যযুগের কাব্য বলতে আমাদের মনে প্রথমে চলে আসে মঙ্গলকাব্যের কথা। কাব্যের প্রধান লক্ষ্য ছিল জনমানসে দেব-দেবীর মহিমা প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজের উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ দূর করা। এই কাব্যধারার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত কাব্য হলো মনসামঙ্গল কাব্য। মনসামঙ্গলের কাহিনি, চরিত্র ও অনুষঙ্গকে যুগের রুচি চাহিদা অনুযায়ী আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যবহার করে মঙ্গলকাব্যের নব রূপায়ণ করে চলেছেন। শুধু নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্প'ই নয় লোকপুরাণের চরিত্র, কাহিনি ও ভাব পরিমণ্ডলকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে আধুনিক কবিতার একটা অংশ। আমাদের ক্রমাগ্রমুখিনতার মাঝেও কখনো কখনো পেছন ফিরে দেখতে হয়।

রাজনৈতিক অস্থিরতাময় এবং সংগ্রামমুখর সময়ে কবি শঙ্খ ঘোষ, জয় গোস্বামীর কবিতায় চাঁদ সদাগরের হেতালের লাঠি ও চৌদ্দডিঙা মধুকরের মানবিক রূপ লাভের প্রসঙ্গ নিয়ে এবং জীবনানন্দ দাশের কবিতায় মনসামঙ্গলের প্রেক্ষাপটের পরিমণ্ডলে বাংলার নদী-মাঠ-ঘাট, ভাঁটফুল আর ঘুঙুরের শব্দ প্রভৃতি প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা। নারীর অধিকার বোধ ও আত্মচেতনার আলোকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা। অরুণ মিত্রের কবিতায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থানের কথা এবং বিষ্ণু দে-র 'এবং লখিন্দর' কবিতায় একালের যুগযন্ত্রণাময় প্রেমচেতনার বহিঃপ্রকাশের ছবি। জয় গোস্বামীর 'ডিঙা' কবিতায় চাঁদ বণিকের প্রশস্তি ও একালের নারীজাতির বক্তব্যে আক্ষেপের সুরের বর্ণনার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সাহিত্য হলো সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতীক– যা মানুষের চিরকালের মুক্তির সরোবর ও তৃপ্তির পারাবার। সাহিত্য অনুধাবনের ফলে মানুষ জগৎ ও জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি ও আত্মোপলব্ধি করার ক্ষমতা অর্জন করে থাকে। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের, দূরের সঙ্গে নিকটের, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সুদৃঢ় মেলবন্ধন ঘটানো সম্ভব। অতীতকে আমরা পুরাতন বলে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না, কেননা প্রাচীনের গর্ভগৃহে জীবনের সাধনা রচিত হয়েছিল, তার প্রাসঙ্গিকতা আজও সমান প্রয়োজনীয়। প্রাচীনের সুর আজও আমাদের টানে। যেকোনো ভাষার সাহিত্য সমৃদ্ধ'তা লাভ করে অতীতের রসসিঞ্চনে এবং বর্তমানের আবর্তে কিংবা ভাবিকালের সম্ভাবনার দ্বারা। অতীতের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির প্রাসঙ্গিকতা কালের জাঁতাকলে পিষ্ট হলেও সময় সন্ধানী চোখ তাকে উদ্ধার করে নবরূপে তুলে ধরে। সময় সন্ধানী শিল্পীর কলমে শব্দ, কাহিনি ও ভাষার পরিবর্তন ঘটে। এইভাবে শব্দ কাঠামো ও অর্থের বহুমুখী সম্ভাবনার দ্বারা বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এই নবনির্মিত সাহিত্য সর্বদা নতুন পথের দিশা দেখায়।

ফরাসি দার্শনিক জাক দেরিদা আমেরিকা তথা সমগ্র বিশ্বের দার্শনিক ও সাহিত্য-সমালোচনা ধারায় এক তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। দেরিদা আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনায় এমন এক রীতির উদ্ভাবন করেছিলেন যা নবপ্রাণের উন্মেষ ঘটিয়েছিল। এই রীতিটি হল 'ডি-কনস্ট্রাকশন' (Deconstruction) যার বাংলা আভিধানিক অর্থ হল 'বিনির্মাণ'। ১৯৬৬ সালে জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মেলনে দেরিদা 'Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Science' নামক বিখ্যাত নিবন্ধটিতে ডি-কনস্ট্রাকশনের উল্লেখ করেছেন। দেরিদা উদ্ভাবিত 'ডি-কনস্ট্রাকশন' কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্ব বা পদ্ধতি নয়, বরং তা এমন এক পঠন পদ্ধতি বিশেষ, যেখানে প্রতিনিয়ত প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে ভাবনার বিশেষরূপ। নিছক পাঠ নয়, পড়া নয়, পাঠের প্রতিক্রিয়াটাই আসল। দেরিদা মনে করেন, ব্যাখ্যায় পাঠকের সামনে সব সময়েই নতুন নতুন অর্থ (Meaning of a text) খুলে যায়। অনেকটা যেন আশ্চর্য কারুকার্য করা গোটানো কার্পেট কেবলেই যেন খুলছে, কিন্তু তার শেষ প্রান্তটির দেখা মিলছে না। প্রচলিত ধারণায় 'ডি-কনস্ট্রাকশন্' বলতে আমরা যা বুঝি তা হলো 'ভেঙে দেওয়া'। কিন্তু আসলে তা নয়, বিনির্মাণ মানে কেবল ভেঙে দেওয়া'ই নয় বরং নতুন করে ভাবনার জগতকে বিস্তারিত করে তোলা। পরিবর্তনশীল জীবনের মতই বিনির্মাণ পূর্বনির্দিষ্ট কোনো গতিপথ মেনে চলে না। এ প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলেছেন– "বিনির্মাণ তাই অন্তহীন সম্ভাবনার তত্ত্বরূপ। এ এমন এক আশ্চর্য তত্ত্ব যার উৎস বা মোহনা কখনও নির্দিষ্টতা মেনে নেয় না। জন্মমুহূর্তেই তা আপন মৃত্যুবীজকে লালন করে– তবে এই মৃত্যু মানে ক্ষয় নয়, বিস্তার।"[১]

বিনির্মাণের প্রধান অবলম্বন হলো পাঠ। দেরিদার দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য, বিজ্ঞান কিংবা

* গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়,
বারাণসী, উত্তরপ্রদেশ, ভারত

সামাজিক বিদ্যা যাই হোক না কেন, সবকিছুর গঠনশৈলীর ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনা করার স্পষ্ট অবকাশ রয়েছে। অতীতের যে-কোনো ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে নতুন দৃষ্টি থেকে কল্পনা করে নবরূপে প্রদর্শন করানো যেতে পারে। পাঠের মধ্যে শব্দের নির্বাচন, কাহিনির সংযোজন ও বিয়োজন এবং ভাষার পরিবর্তন করে একজন সাহিত্যিক তাঁর শিল্পকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারেন। কেননা কোনো শব্দেরই চিরকালীন এক অর্থ থাকতে পারে না, দেশ-কাল-পাত্রের স্থান-ভেদে অর্থ পরিবর্তনশীল হতে পারে। ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার এ প্রসঙ্গে বলেছেন - " বিনির্মাণতত্ত্বের মধ্যে একধরনের ব্যাখ্যা বা interpretation সাহিত্যিক বা অ-সাহিত্যিক - থেকেই যাচ্ছে। এবং একটি text-এর ব্যাখ্যা কখনোই সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না।.... কাজেই এই ধরনের রচনার পাঠ নিয়তই পরিবর্তনশীল বা transformational."[২]

পুরাণ কাহিনির চাঁদ সদাগর, মনসা, সনকা, বেহুলা, লখিন্দর ও বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে গদ্য আখ্যান, নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্পের পাশাপাশি কবিতা রচনার প্রবণতাও অনেক বেশি দেখা দিয়েছে। আজকের সময়ে দাঁড়িয়েও কবি ও সাহিত্যিকগণ বারেবারে ফিরে গেছেন অতীতের ঐতিহ্যশালী চরিত্রগুলো ও অনুষঙ্গের কাছে। এইভাবে অতীতের বিষয়, চরিত্র ও কাহিনিগুলো কবিদের ভাবনায় নানারঙে, নানাভাবে নতুনরূপে উঠে এসেছে। বাংলা কবিতার বিস্তীর্ণ প্রান্তে বিনির্মিত হয়েছে প্রচলিত মনসামঙ্গলের কাহিনি। মনসামঙ্গল কাব্যের বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ আধুনিক বাংলা কবিতাকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিপ্লব চক্রবর্তী বলেন–

> "আধুনিক কবিতায় কবিদের জীবন ও যুগজিজ্ঞাসা তাঁদের নিজস্ব ভাব ও ভাবনার মুকুরে রূপায়িত হয়। লোকাভরণ সেই রূপায়ণের এক বিশিষ্ট নির্মাণ শৈলী। রচনার সংগঠনে ও শিল্পকর্মে লোকাভরণ জীবনানুভব ও লোক-উপাদানকে মেলাবার এক অতি স্পষ্ট শিল্প-রূপায়ণ। কবির সংবেদনে, লোকজীবনের প্রত্যক্ষ ও অগোচর স্বর-স্ফুটনে তা হল শিল্পের রূপময় প্রকাশ। নতুনতর রূপ ও রূপান্তর।"[৩]

আধুনিককালে রাজনৈতিক অস্থিরতাময় এবং সংগ্রামমুখর সময়ে কবি শঙ্খ ঘোষ, জয় গোস্বামীর কবিতায় চাঁদ সদাগরের হেতালের লাঠি ও চৌদ্দডিঙা মধুকর মানবিক রূপ লাভ করেছে, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় মনসামঙ্গলের প্রেক্ষাপটের পরিমণ্ডলে বাংলার নদী-মাঠ-ঘাট, ভাঁটফুল আর ঘুঙুরের শব্দ প্রাণলাভ করেছে। অন্যদিকে নারীর অধিকার বোধ ও আত্মচেতনা উঠে এসেছে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়। অরুণ মিত্রের 'ও বেহুলা' কবিতায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থানের কথা এবং বিষ্ণু দে-র 'এবং লখিন্দর' কবিতায় একালের যুগযন্ত্রণাময় প্রেমচেতনার বহিঃপ্রকাশের ছবি। জয় গোস্বামীর 'ডিঙা' কবিতায় চাঁদ বণিকের প্রশস্তি ও একালের নারীজাতির আক্ষেপের সুর

ধ্বনিত হয়েছে। এছাড়াও কালিদাস রায়ের 'চাঁদ সদাগর', দীপঙ্কর মাহমুদের 'বেহুলার ভেলা', কৃষ্ণা বসু'র 'চাঁদ বণিকের ডিঙা', জিয়া হায়দারের 'লখিন্দর' প্রভৃতি কবিতা।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা নির্বাচিত কিছু আধুনিক বাংলা কবিতায় মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি, চরিত্র ও অনুষঙ্গের বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ হয়েছে সেই বিষয়গুলির বিশ্লেষণী পাঠ তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র।

আধুনিক কালের রোমান্টিক কবিদের মধ্যে সর্বাগ্রে উঠে আসে জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) নাম। কবি 'রূপসী বাংলা' কাব্যের 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতায় মনসা-পুরাণের অনুষঙ্গের ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির নবমূল্যায়ন হয়েছে। 'রূপসী বাংলা' কাব্য বাংলাদেশকে নতুন করে চিনতে ও ভাবতে শিখিয়েছে আমাদের। বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছে। তিনি সুররিয়ালিস্টিক দৃষ্টি দিয়ে জগতকে অনুভব করতে চাইলেও তাঁর কবিতায় মিথ ও লোকপুরাণ প্রত্নপ্রতিমা হয়ে ওঠেছে। 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের প্রায় ৬০টি কবিতায় গ্রাম-বাংলার প্রকৃতিরূপের যে অফুরন্ত সৌন্দর্য রয়েছে কবি জীবনানন্দ দাশ তার বর্ণনা করেছেন নিজস্ব বাচনভঙ্গিতে। সমালোচক বিপ্লব চক্রবর্তীর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে খুবই প্রযোজ্য– "এই কবিতাগুলোয় কান পাতলে বাংলার লোকজীবনের নানা কথার– বাংলার ইতিহাস ভূগোল বা পুরাণের স্রোত বেয়ে ভেসে আসা লোকজীবনের বিচিত্র উপাদানের ঐক্যতান শোনা যায়।"[৪]

'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলার অপরূপ প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে গিয়ে বারে বারে ফিরে গেছেন মনসামঙ্গল কাব্যের উঠানে। কবি প্রথমেই ঘোষণা করেছেন–

> " বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
> খুঁজিতে যাই না আর; অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে "[৫]

কবি বাংলার অপরূপ সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন বাংলার শোভনীয় বাতাবরণকে তাই তিনি পৃথিবীর রূপ খুঁজতে চাননি। বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে কবি ফণীমনসা ও শটিবনের মধ্যে লৌকিক দেবী মনসার অস্তিত্ব অনুভব করেছেন। এরপরেই তিনি ব্যবহার করেছেন মধুকর ডিঙা, চাঁদ সদাগর, চম্পা মনসাপুরাণের প্রভৃতি অনুষঙ্গগুলোর। আমরা জানি, মনসার কোপে ছয় পুত্র হারিয়ে বণিক চাঁদ সদাগর বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে চৌদ্দডিঙা (মতান্তরে সপ্তডিঙা) নিয়ে দক্ষিণ পাটনে পাড়ি দিয়েছিল। যাত্রা পথে চাঁদ প্রত্যক্ষ বাংলার অপরূপ রূপ। শুধু বণিক চাঁদ'ই নয় অকালপ্রয়াত স্বামী লখিন্দরকে নিয়ে যাত্রা পথে বেহুলাও দেখেছিল 'কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না', সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য বটগাছ, এছাড়াও শুনেছিল, 'শ্যামা

পাখির নরম গান'। যা সদ্য স্বামীহারা দুঃখ-কাতরা বেহুলার মনে মায়াময় জগৎ রচনা করেছিল। এই কবিতায় কবি স্বামীর প্রতি নারীর ঐকান্তিক প্রেমের বার্তা ঘোষণা করেছেন। এই প্রেমের মধ্যে রয়েছে নারী হৃদয়ের গভীর আর্তনাদ ও বেদনা। প্রেমের সেই বেদনাকে গভীরতর করেছে বাংলার অপরূপ রূপ প্রকৃতি। এই কবিতায় বেহুলা শুধু একজন স্বামীহারা নারী নন, তিনিই সমগ্র বাংলা। জীবনানন্দের বিনির্মিত বেহুলা যেন বাংলার মৃত্তিকা জননীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেছে।

পুরাণ কাহিনি সূত্রে আমরা জানি যে, লখিন্দরের প্রাণ বাঁচাতে বেহুলাকে ইন্দ্রের সভায় নৃত্য পরিবেশন করতে হয়েছিল দেবতাদের তুষ্ট করার জন্য। দেবসভায় বেহুলার নৃত্য কবির কাছে 'ছিন্ন খঞ্জনার মতো' তীব্র যন্ত্রণাকাতর মনে হয়েছিল। বেহুলার সেই নৃত্যের মধ্যে যে লাঞ্ছনা লুকিয়ে ছিল, তা কেবল বেহুলার নিজস্ব নয়, তা সমগ্র নারী জাতির ইতিহাস। সেই কলঙ্ক থেকে আজও মুক্ত নয় কোনো নারী। সেকালের মতো একালেও নারী জাতিকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ভোগ্যপণ্য হিসেবে বিবেচনার অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। তাতেই সমাজ নিয়ন্ত্রক ও পুরুষ সমাজপতিদের মন ও শরীর পুলকিত হয়। কিন্তু নারী জাতির চাপা আর্তনাদ ও বেদনা ধ্বনিত হতে থাকে মাটির পৃথিবীর সর্বস্তরে। আধুনিক কালে দাঁড়িয়েও কবি জীবনানন্দও সেই কান্নার সুর তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়–

> -একদিন অমরায় গিয়ে
> ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
> বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।"[৬]

বেহুলা লাস্যনৃত্য দেখিয়ে দেবতাদের মন জয় করে মৃত স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলে। তবে এর আড়ালে চাপা পড়েছে নারীহৃদয়ের গভীর বেদনা। কবি এই নৃত্যের প্রসঙ্গ তুলে নারী জাতির অবমাননা ও লাঞ্ছনার বর্ণনা করেছেন। নারীর এই অসম্মান ও অসহায়তায় বাংলার নদী-মাঠ-ঘাট, ভাঁটফুল সবকিছুই ঘুঙুরের মতো কেঁদেছিল তার পায়। অমরায় গিয়ে বেহুলার নৃত্য প্রদর্শনের মতো ঘটনা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কালো দিককে চিহ্নিত করেছে। এখানে নারী জাতির অসহায়তা ও বিপন্ন অবস্থার সঙ্গে বাংলার নিসর্গ প্রকৃতি একীভূত হয়ে গেছে।

বিশ শতকের বিপন্ন সময়, যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, খুন, মূল্যবোধহীনতা প্রভৃতি ঘটনায় মানুষ যখন জর্জরিত সেই সময় কবি জীবনানন্দ প্রকৃতির মধ্যে শান্ত নিবিড় আশ্রয় খুঁজেছেন। ফণীমনসা, মধুকর ডিঙা, চাঁদ, চম্পা, বেহুলা পুরাণের ইত্যাদি চরিত্র ও অনুষঙ্গ তুলে যেমন প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, তেমনি প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে বেদনাতুর হৃদয়ের কথা তুলে ধরেছেন। মনসাপুরাণের আবহে

কবিতায় বিশ শতকের বিপন্ন সময় নতুন ভাবে নির্মিত হয়েছে।

রবীন্দ্রউত্তর কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও চিন্তাশীল কবি বিষ্ণু দে'র (১৯০৯-১৯৮২) 'আলেখ্য' কাব্যগ্রন্থের একটি উন্নত কবিতা হল 'এবং লখিন্দর'। মনসামঙ্গলের আবহ মণ্ডলে পাঁচটি স্তবকে ও কুড়িটি চরণের পরতে পরতে একালের যুগযন্ত্রণাময় প্রেমচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। পুরাণের বেহুলা নিয়তির হাতে বাসররাতে স্বামীহারা হয়। নারীর জীবনধারণের নির্বিঘ্ন উদযাপনের জন্যে একজন পুরুষের ভূমিকা থাকা আবশ্যক। সে স্বামী যেমনই হোক না কেন, সে নারীর পথ চলার সম্বল। মধ্যযুগের বেহুলা জীবনে প্রেমের পরিতৃপ্তি পায়নি। অপরিতৃপ্ত প্রেম বুকে নিয়ে স্বামীর শবদেহ নিয়ে ভেলায় করে ভেসে চলে গাঙুরের জলে। রোমান্টিকতায় পরিপূর্ণ কবি-হৃদয়ও বেহুলার মতো আশা-আকাঙ্ক্ষা ও একবুক স্বপ্ন নিয়ে প্রত্যয়ের ভেলায় ভেসে চলেছে। কবি স্রোতস্বিনী গঙ্গার প্রতি অফুরান্ত ভালোবাসা ও অন্তরের শ্রদ্ধা প্রকাশ করে, নদীর গতিময় স্রোতকে মহাকালের যাত্রার মধ্যে অনুভব করেছেন। সেই গতিময় স্রোতের সঙ্গে কবি একাত্মতা অনুভব করেছেন–

> হৃদয়ে তোমাকে পেয়েছি, স্রোতস্বিনী !
> তুমি থেকে থেকে উত্তাল হয়ে ছোটো,
> কখনও জোয়ারে আকণ্ঠ বেয়ে ওঠো,
> তোমার সে-রূপ বেহুলার মতো চিনি।[৭]

নদীতে বয়ে চলা বেহুলা হয়ে উঠেছেন কালের প্রতীক। এমন এক কাল, যেখানে রয়েছে প্রাণভরে বাঁচার ঠিকানা। প্রেম ও পুষ্টিতে ভরা বেহুলার মধ্যে নদী ও নারী মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। আধুনিক প্রেম বেহুলার মতো নিঃসঙ্গ। আধুনিক কালের প্রেম বেহুলার মতোই যন্ত্রণাময়। এই প্রেম নদীর স্রোতের মত বহমান, কখনো জোয়ারের জোরে ফুলে ফেঁপে ওঠে কখনো বা ভাটার টানে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। নদীর গতিময় স্রোতের কলধ্বনির মধ্যেই কবি পেয়েছেন চলার মন্ত্র, জীবনে চলার পথের 'সময়' হয়ে ওঠে। সময়ের এই স্রোত যখন বিধ্বংসী ও খরতোয়া হয় তখন প্লাবন শুরু হয়– সে প্লাবন ধ্বংসের। কবি স্রোতের সাহচর্যে চলেছেন, কবি নিজে কথা না বললেও কবির অন্তর থেকে ভেসে এসেছে সেই প্রেমের কথা–

> রক্তের স্রোতে জানি তুমি খরতোয়া
> ঊর্মিল জলে পেতেছি আসন পিঁড়ি
> থৈথৈ করে আমার ঘাটের সিঁড়ি
> কখনো বা পলিচড়া-ই তোমার দোয়া।[৮]

নদীর এই গতিমান স্রোতের মধ্যে কবি নতুন উৎসাহ উপলব্ধি করেছেন। মহাজনী মাল্লার গান, পান্সি মাঝির ভাটিয়ালী গান ব্যথা ভুলে থাকার আবেশ অবিশ্বাস্য পথ চলার

অনুপ্রেরণা জোগায়। বেহুলার অনিশ্চিত ভেসে চলার মধ্যে রয়েছে অনিশ্চয়তা ও রহস্যময়তা। সেই যাত্রার মতো আধুনিক প্রেমও অনিশ্চয়তায় পরিপূর্ণ। পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্বে আধুনিক প্রেম মুখরিত। এই পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্বের কারণে আধুনিক মানুষ অস্থির ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। আধুনিক মানুষ অস্তিত্ব সংকটের শিকার হয়, কোথাও দু-দণ্ড শান্তি নেই। জীবনের অথৈ সাগরে মৌন মানুষ শুধু তক্তায় ভাসে। বর্তমানের মানুষ অস্থির সময়ের পুরাণের বেহুলার মতো নিশ্চিত পথে ধাবমান। লখিন্দর সহ কাঠ, খড়, ফুল যেমন ভেসে যায় নদীতে আধুনিক প্রেমও তেমনি ভেসে চলেছে নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে। কবি বাস্তবের সেই দৃশ্যকে উপলব্ধি করেছেন নির্মোহ দৃষ্টিতে–

কত ডিঙি ভাঙো, যাও কত বন্দর,
কত কী যে আনো, দেখ কত বিকিকিনি,,
তোমার চলায় ভাসাও, স্রোতস্বিনী,
কাঠ খড় ফুল– এবং লখিন্দর।।[৯]

কবি এইভাবে বেহুলা ও লখিন্দরের জীবন ইতিহাসকে আধুনিককালের প্রেক্ষাপটে নিয়ে এসে নতুনভাবে গড়ে তুলেছেন। সামাজিক অবয় ও মানবিক মূল্যবোধহীনতার মধ্যে আধুনিক প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছে কবি কবিতায়।

বিশ শতকের তিন চার ও পাঁচের দশকের উত্তাল সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য। পূর্বাশা পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য কবিতার পাশাপাশি সাহিত্যের দরবারে ঔপন্যাসিক, সমালোচক ও চিত্রশিল্পী হিসেবে খ্যাতনামা ছিলেন। 'বেহুলা' কবিতাটি অলিন্দ পত্রিকার অষ্টম সংখ্যায় ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতায় অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রচলিত মনসাকথার পরিমণ্ডলে কবিতাটি বিধ্বস্ত সময়ের একটি মূল্যায়ন। আটটি চরণে রচিত বেহুলা কবিতাটিতে কবি আপন বাচনভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন পাঁচ ও ছয়ের দশকের অবয়িত সময়ের বিপন্নতার ছবি। পাশাপাশি অতীত ঐতিহ্যের মধ্যে অন্বেষণ করেছেন সমকালের জীবনীশক্তিকে। মনসাপুরাণের বেহুলার মধ্যে আমরা দেখতে পাই হার না মানার মানসিকতা, অমিত তেজ ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি। দুর্বল ভীরু সময়ে কবি বেহুলাকে আহ্বান করেছেন, তাঁর ইচ্ছাশক্তি দিয়ে অবয়িত সময়ের অপসারণ ঘটাতে–

নাচো নাচো বেহুলা আমার
বর্ষণ– ভোলানো নাচ নাচো
নদী উৎসে এসে গেছে[১০]

এই আহ্বানের মধ্যে পৃথিবীর নারীশক্তির জাগরণের অভীপ্সা প্রকাশ পেয়েছে। এই নদী আসলে সম্ভাবনার স্রোত। নতুন দেশ ও জাতি গঠনের ক্ষেত্রে যে উগ্র ফ্যাসিবাদী শক্তি

বাধার পাহাড় সৃষ্টি করে। কবি তাদের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদের জন্য বেহুলাকে আহ্বান করেছেন। কবি একালের সভ্যতা সংস্কৃতিকে অভিশপ্ত লখিন্দরের মতই 'মৃতপ্রাণ' বলেছেন। অথচ অর্থ প্রতিপত্তির সস্তা আরামদায়ক বিলাস বহুল জীবনে আজও 'সুর-ভিমদির নাগিনীরা বর্ষণ উৎসবে নাচে'। কবি এমন নারীশক্তিকে আহ্বান করেছেন যে শক্তি বুর্জোয়া শক্তির অবসান ঘটিয়ে নতুন সমাজ তৈরি করবে। সামাজিক অবক্ষয় রোধে কবি পুরাণের নায়িকা বেহুলাকে আহ্বান জানিয়েছেন–

তোমার ভেলায় যদি নিলে
নাচো জল নাচো রক্ত, বেহুলা আমার॥[১১]

রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিদের মধ্যে অন্যতম প্রথিতযশা কবি অরুণ মিত্র (১৯০৯-২০০০)। তাঁর কবিতায় উত্তাল চল্লিশের দশকে সমাজের অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রত্যয়ী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি রোমান্টিক চেতনাকে বাস্তবের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে এক নতুন রোমান্টিকতা তৈরি করে তুলেছেন। তাঁর কবিতার ভাষা সহজ ও সরল এবং বোধগম্য। তাঁর কবিতা সহজবোধ্য হলেও গভীর ব্যঞ্জনা বহন করে। শব্দ ব্যবহার, কাহিনি, চরিত্র ও নানা অলংকার সৃষ্টিতে কবি অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয়ে বাংলা কাব্যজগতে নতুন ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কবি অরুণ মিত্র মনসামঙ্গলের কাহিনির বহমানতার উল্টোদিকের ভাবনা নিয়ে 'ভাঙনের মাটি' কাব্যগ্রন্থের 'ও বেহুলা' কবিতাটি লিখেছেন। কবিতাটি গদ্যকবিতার আদর্শে রচিত এক অনবদ্য সংরূপ। বাংলার বুকে যখন নকশাল আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে ঠিক সেই সময় কবি কবিতাটি লিখেছেন। নকশাল আন্দোলনের সময় হাজার হাজার লখিন্দরের জীবন নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। এই শুষ্ক সময়ের বালিয়াড়িতে দাঁড়িয়ে কবির মনে হয়েছে আমাদের জীবন থেকে মধ্যযুগের বেহুলারা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। কবি বাস্তব জীবনের নানা প্রশ্ন তুলে ধরেছেন কবিতাটিতে। সমগ্র কবিতাটির বহিরাবরণে মনসাকথার কাহিনি বিস্তৃত। পুরাণে, নিছনি নগরের সায়বেনের কন্যা বেহুলা নৃত্যে পটিয়সী, কর্মে নিপুণা সতীসাধ্বী নারী। সে চাঁদ বণিকের পুত্রবধূ হওয়ার যোগ্যতা প্রমাণ দিয়েছে লোহার ডাল সিদ্ধ করে। চাঁদ সদাগর ও মনসার দ্বন্দ্বের কারণে বেহুলা বাসর-রাতে স্বামী লখিন্দরকে হারায়। মৃত স্বামী লখিন্দরের প্রাণ নিয়ে কলার মান্দাসে করে গাঙুরের জলে ভেসে অমরলোকের উদ্দেশে রওনা দেয়। বেহুলার এই করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন কবি। বিশ শতকের কবি অরুণ মিত্র বেহুলাকে আহ্বান করেছেন মরণলোকের ওপার থেকে। কবি বেহুলার কাছে জানতে চেয়েছেন সেইসব কথা যা পুরাণের কবিরা বলেনি। কবিতার প্রথমে কবি বেহুলার সঙ্গে আলাপের পর্ব চুকিয়ে নিয়েছেন। সেই আলাপে কবি বেহুলার রূপের ও গুণের বহুমুখী প্রশংসা করেছেন। আমাদের বুঝতে

অসুবিধা হয় না যে, একটা প্রজেক্টরের মতো কবি কবিতার পর্দায় আলো ফেলে বেহুলা চরিত্রটিকে পাঠকের সামনে স্পষ্ট করে তুলতে চাইছে। স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার কারণে মৃত স্বামীকে ভেলায় বেহুলা একা ভেসে যেতে না দিয়ে, সমাজের বিধি বিধানের তোয়াক্কা না করে শবদেহের সঙ্গিনী হয়। ভালোবাসার প্রবল তেজে সব বাধাবিঘ্ন পিছনে ফেলে দেবসভায় উপনীত হয়। নৃত্য-গীত পরিবেশন করে দেবতাদের মন জয় করে স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়ে চম্পকনগরে আসে। সারাদেশে বেহুলার নামের ধন্য ধন্য পড়ে যায়। মানুষের মুখে শোনা যায় বেহুলার পতিব্রতার প্রশংসার কথা। বেহুলার এই সতীত্ব ও পতিব্রতার কথা যুগ যুগ ধরে চলে আসে। আমাদের সমাজ নারীর চারিত্রিক পবিত্রতায় ও সতীত্বে যতখানি বিশ্বাসী, ঠিক ততখানি উদাসীন পুরুষের ক্ষেত্রে। বিশ শতকের স্পষ্টবাদী কবি অরুণ মিত্র কবিতায় একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলেছেন, প্রশ্নটি হল– "ও বেহুলা, এখন বলো তো আমায় লোহার বাসরঘরে অন্ধকারে সাপটা যদি ভুল ক'রে লখীন্দরের বদলে তোমাকে ছোবল দিত, তাহলে কী হত।"[১২]

কবির এই কথা শুনে আমরা হতভম্ভ হয়ে যাই। সত্যিই তো এমনটা হওয়া তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। রাতের অন্ধকারে নাগ যদি লখিন্দরের জায়গায় বেহুলাকে দংশন করতে পারতো। তাহলে মনসাপুরাণের কাহিনি উল্টোস্রোতে বহমান হতো। কবি এসব প্রশ্ন তুলে মনসামঙ্গলের কাহিনিকে ভেঙে খান খান করে দিয়েছেন। কবি মধ্যযুগীয় কাব্যের প্রচলিত ডিসকোর্স (Discourse) তছনছ করে দিয়ে বৈপ্লবিক বয়ানের সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। কবির মতো আমাদের মনেও প্রশ্ন জাগে বেহুলা বিহনে লখিন্দরের কী হতো? লখিন্দর কী বেহুলার সর্প দংশনে মৃত শরীরটা নিয়ে কলার ভেলায় করে নদীতে ভেসে যেতেন? স্বর্গে গিয়ে দেবতাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্তে নাচ দেখাতেন বা গান শোনাতেন? লখিন্দরের পথেও কি একের পর বিপদ এসে দাঁড়াত! কেমন হতো একজন পুরুষের পথপ্রান্তে অপেক্ষমান বিপদ। বেহুলাও হয়তো এইসব সাত-পাঁচ ভেবেই নিরুত্তর ছিলেন। কবিতায় কবি আজকের সমাজের লখিন্দরের মনোভাব তুলে ধরেছেন। লখিন্দরের সুন্দরী ও লাস্যময়ী স্ত্রীকে হারিয়ে পাগলের মতো দশা হতো। লখিন্দর মৃত বেহুলার দেহটিকে অতিযত্নে কলার মান্দাসে করে ভাসিয়ে দিত নদীতে, কিন্তু নিজে ভাসতেন না। সন্ন্যাসীর মতো ঘুরে ঘুরে কিছুদিন বিরহে দিন কাটাত ঠিকই কিন্তু মাস দুই বাদে যে কোনো একটি মেয়েকে আবার বিয়ে করে নিতো। দ্বিতীয় স্ত্রী হয়তো বেহুলার মতো লাস্যময়ী ও রূপসী হতো না কিন্তু সেসব তো মুখ্য নয়। মুখ্য তার একজন নারী দরকার। পুরুষের নারী দরকার যৌনতার জন্য। তার কাছে স্ত্রী ততটাই প্রয়োজনের যতটা প্রয়োজন যৌনতার।

বিশ শতকের দোরগোড়ায় এসেও মানুষ নারীর প্রতি অবহেলা, অন্যায় অত্যাচার থেকে

বিরত থাকেনি। কবির যুক্তিবাদী মন তা মেনে নিতে পারেনি। সেই কারণে একালের বাস্তব চিত্রকে তুলে ধরতে গিয়ে মধ্যযুগের মনসামঙ্গলকাব্যের পতিব্রতা নারী বেহুলাকে নিয়ে এসে তার প্রশ্নের সম্মুখীন করেছেন। নারীজাতির জাগরণের প্রয়াস, সমকালের মানুষের মূল্যবোধ, আদর্শ, বিভিন্ন ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও বাস্তব সচেতনার মানসিকতাটিকে কবি নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন কবিতায়। কবিতাটি হয়ে উঠেছে প্রচলিত মনসাকথার নবনির্মাণ বা বিনির্মাণ ভাবনার ফসল।

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৫) আধুনিক কাব্য জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ ও অস্থিরতার যন্ত্রণা বুকে নিয়ে। তিনি জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেছেন বাস্তববাদী কবি হিসেবে। শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তাদের সমস্ত রকম প্রতিকূলতা থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলেছেন। কবি তাদের দুর্দশার জন্য প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকেই দায়ী করেছেন। কবি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি প্রচলিত সমাজের স্বার্থপর মানুষদের অমানবিকতা ও নিষ্ঠুরতাকে। তাই সমকালের বিপন্ন রুগ্‌ণ সমাজব্যবস্থার অনুভব করতে গিয়ে অতীতকেই নতুনরূপে নতুনভাবে অনুসন্ধান করেছেন। জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে যেমন তিনি বৈপ্লবিক আদর্শে প্রভাবিত হয়েছেন, তেমনি নির্মোহ দৃষ্টিতে জীবনকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর কবিতার আঙিনায় সমকালের সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও মানুষের স্বার্থান্বেষী মনোভাবের অহমিকা নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বর্তমানের কলুষিত সমাজ থেকে মুক্তির পথ পেতে কবি বারবার অতীতে ফিরে গিয়েছেন। তিনি ভিন্নদৃষ্টিকোণ থেকে বহুবিষয়ের বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করেছেন তাঁর কবিতায়।

১৩৬২ বঙ্গাব্দে রচিত *মৃত্যুত্তীর্ণ* কাব্যে 'বেহুলা নাচানো স্বর্গ' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে এটি *বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা*'তে অন্তর্ভুক্ত হয়। কবি মনসামঙ্গলের বণিক পুত্রবধূ বেহুলার স্বর্গের দেবসভায় নাচের প্রসঙ্গটিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নতুনভাবে দেখিয়েছেন। আটটি স্তবকে এবং প্রতিটি স্তবকে চারটি পঙক্তি এবং মোট বত্রিশটি পঙক্তিতে কবিতাটি হয়ে উঠেছে একটি ভিন্ন স্বাদের কবিতা। মনসামঙ্গল কাব্য থেকে জানা যায়, বাসর রাতে সর্প দংশনে লখিন্দরের মৃত্যু হয়। কলার মান্দাসে করে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য স্বর্গে যাত্রা করে। যাত্রা পথে বেহুলাকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বেহুলা নৃত্য-গীত পরিবেশন করে দেবতাদের মন জয় করে মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরে আনে। অতীতের এই কাহিনি লোকমুখে বহুপ্রচলিত ও জনপ্রিয়। অতীতের চির পরিচিত এই কাহিনিকে কবি একালের দৃষ্টিতে দেখেছেন। সেকালের মানুষেরা কাব্যের এই অংশটুকু ভক্তিরসের আবেগ হিসেবে গ্রহণ করলেও একালের

দৃষ্টিতে কবি পুরুষ দেবতার সম্মুখে একজন নারীর নৃত্য-গীতকে মেনে নিতে পারেননি। আমাদের বিলাসবহুল ও ভোগবাদী সমাজে নারীরা অর্থ, সম্মান, যশ ও প্রতিপত্তির লোভে নিজেকে পণ্য করে তুলেছে। স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নারীকে পুরুষসমাজের কাছে নানা ছলা-কলার আশ্রয় নিতে হয়। একালের মানুষেরা তাই বেহুলার সতীত্ব নিয়ে নানামুখী প্রশ্ন তুলে থাকে। ভোগবাদী সভ্যতার জৌলুষে ও অহমিকায় পরিপূর্ণ স্বর্গের বেহুলাকে কবি প্রশ্ন করেছেন–

অয়ি পদ্মপলাশলোচনা
তোর চোখে কি পড়লো ধুলো?
যেন নীলাকাশ জুড়ে লাল মেঘ
আর মেঘে মেঘে ঝড় এলো[১৩]

বেহুলার শান্ত কোমল স্নিগ্ধ হৃদয়ের নীল আকাশের উপর ভোগবাদী আগ্রাসী 'লাল মেঘ' ঝড় তুলেছে। আমরা জানি, সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত পুরুষের চাহিদার যূপকাষ্ঠে নারীকে সঁপে দিতে হয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের হাতে। সেই লাল মেঘের ঝড়ে কবি বিভ্রান্ত হয়ে স্বর্গের বেহুলার কাছে জানতে চেয়েছেন–

তোর কী হ'লো আজকে ললনা?
কোন কুটিল ঐরাবত
দিল নীলোৎপলেও বেদনা।[১৪]

ভোগবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বেহুলা অসহায়। বেহুলার এই দুর্দশার জন্য কবি নিয়তিকে'ই দায়ী করেছেন। নিয়তির 'বাঁকা তলোয়ারে'র আঘাতে বেহুলার 'নীল নয়নে' দাগ পড়েছে। ফুলে ফুলে জমে উঠেছে তাজা রক্ত। কবি উপলব্ধি করে, বেহুলার এই অভিব্যক্তিই বুঝি কালবৈশাখী ঝড় ডেকে এনেছে গ্রীষ্মের ভরদুপুরে। ঝড়ের সম্ভাবনাময় ঐতিহ্যের মধ্যেও বেহুলার অন্তরে বিকশিত হয় 'পূর্বরাগের সোহাগ'। যার ফলে বেহুলা অতিক্রম করেছে মৃত্যুর ভ্রুকুটি। সে প্রেম ও কামনার বশবর্তী হয়ে গলায় পড়েছে 'নীলকণ্ঠের মালা'। বেহুলার ঘন ঘন 'রংবদলের ঘটা' দেখে 'ইন্দ্রেরও ভয় করে'। বেহুলার এই আচরণের জন্য কবি তির্যক ও ধারালো ভাষায় তাকে তিরস্কার করে বলেছেন–

নখী রক্তচারীর ভিড়ে কি
ভয় লজ্জাও নেই মনে।[১৫]

বেহুলার লাস্যময় নৃত্য দেখে উদগ্র কামনা বাসনার আতিশয্যে স্বর্গ কেঁপে ওঠে। দেবতাদের মধ্যে লোভের লেলিহান শিখা জ্বলে ওঠে। নারীর আত্মসম্মান ও মানমর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়। যৌনলোভীরা ভোগবাদী আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে জেগে ওঠে। মানসম্মান,

লজ্জা, ভয় প্রভৃতি যখন মাটিতে মিশে যায় তখন জাতির দুর্দিন নেমে আসে। এর জন্য কবি বেহুলাকে দায়ী করে তির্যক ভাষায় বলেছেন–

একী যৌন-জ্বরের জলসায়
তুই তনু দিলি অঞ্জলি-
হাসি কান্নার চুনি-পান্নায়
ছুঁড়ে দিলি ছেঁড়া কঞ্চুলি।[১৬]

কবি বেহুলার 'কঞ্চুলি' অর্থাৎ আবরুর শেষ চিহ্ন দেবতাদের উদ্দেশে ছুড়ে দেওয়ার মধ্যে ভীষণ প্রতিস্পর্ধার স্থিরচিত্র এঁকেছেন। প্রাচীনকালে সতীসাধ্বী স্ত্রীর মতো মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য যমের দুয়ারে পাড়ি দিতো এই পর্যন্ত ঠিক ছিল। আবার এমনটাও যদি দেখাত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য ভারতীয় বাঙালি নারীদের মতো নিজের শরীরকে পীড়ন দিয়ে নানারকম ব্রতপালন, উপবাস রাখা, ঠাকুরের থানে বুকের রক্ত দেওয়া ইত্যাদি দেখাতো, তাহলে ঠিক ছিল। কিন্তু কবি এসবের ঊর্ধ্বে বেহুলাকে দেখিয়েছেন। কবির সৃষ্ট বেহুলা অনেক বেশি সাহসিনী ও প্রতিবাদী চরিত্র। কবি পুরাণের বেহুলার লাস্যনৃত্যের প্রসঙ্গের জোরালো ভাঙন দেখিয়েছেন। কবিতায় আমরা পেলাম দেবতারদের কামনার প্রতিস্পর্ধী শক্তি আবির্ভূতা লেলিহান শিখাতুল্য একালের বেহুলাকে। বেহুলার শরীর এখানে দাবি আদায়ের বিক্রয় কেন্দ্র (Selling Point) নয়, বরং পাল্টা শক্তি (Counter Force) হয়ে উঠেছে।

কবিতায় বেহুলার নাচ জীবনানন্দের বেহুলার 'ছিন্ন খঞ্জনা'র মতো নাচ নয়, এ অন্য এক নাচ, যার যৌন-জ্বরের লেলিহান শিখায় স্বর্গ কেঁপে ওঠে। যার ঘুঙুরের শব্দে নদী-মাঠ-ঘাট ও ভাঁটফুল কেঁদে ওঠে না, বরং যার শব্দে ও উগ্রতায় স্বর্গ বেসামাল হয়ে পড়ে। বেহুলার এই নৃত্যের মধ্যে রয়েছে সদ্য স্বামীহারা এক নারীর চাপা আর্তনাদ। আগ্রাসী দেবতাদের উদ্দেশে নারী জাতির সম্ভ্রম রক্ষার শেষ আবরু ছুড়ে দিয়েছে আজকের বেহুলা। এ যেন অনেকটা শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের প্রতিবাদ তুল্য। বেহুলার এই উগ্ররূপ দেখে দেবতামণ্ডলের মধ্যে ভয় ও জড়তার সঞ্চার হয়েছে। কবির প্রবল দ্বিধা, সংশয় ও ব্যঙ্গ ধরা পড়েছে শেষ স্তবকের পঙক্তিতে–

ও কী দেবতা অসুড় জড়সড়
বোবা রক্তের কোলাহলে
এই বেহুলা নাচানো স্বর্গ?
সে যে আগুনের মতো জ্বলে![১৭]

আজকের দিনেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অত্যাচারের কবলে অবলা নারীজাতি জর্জরিত। তবে একালের বেহুলা পুরাণের বেহুলার মতো নীরব নয় বরং অনেক বেশি প্রতিবাদী। কবি এমন এক নারী চরিত্র নির্মাণ করেছেন, যার ক্রোধের ভয়ে স্বর্গের দেবতারা ভীত

ও সন্ত্রস্ত হয়। বেহুলার দ্বন্দ্বময়তা, বিপণ্নতা ও হতাশাময় জীবনকে তুলে ধরতে কবিতায় উঠে এসেছে একালের সমাজের বিধ্বস্ত চালচিত্র। বর্তমানে পুরুষসমাজের যৌনাচারের বিরুদ্ধে নারীরা নিজেদের মূল্যবোধের অধিকার ফিরে পেতে সোচ্চার প্রতিবাদ করে। আজকের বেহুলা পুরুষের জলসার আসরকে ক্রোধের আগুনে ভস্মীভূত করে দেয়। আর এখানেই আধুনিক নারীশক্তির জয়লাভ স্পষ্ট হয়। কবি তাঁর কবিতায় মনসামঙ্গলের ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে বাঙলার নারী জাতির বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের চিত্র তুলে ধরেছেন। মধ্যযুগের বেহুলা কবিতায় হয়ে উঠেছে 'ফেমিনিস্ট' চেতনার আলোকে আলোকিত এক উজ্জ্বল চরিত্র। এখানেই বিনির্মাণে গৌরব।

'বেহুলার ভাসান যাত্রা' অংশটিকে আমরা মনসাকথার সবচেয়ে ঘটনাবহুল অধ্যায় হিসেবে জানি। সেই যাত্রাপথের প্রতিটি বাঁকে লুকিয়ে থাকে এক একটা বিপদ, এক একটা উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা এই বুঝি বিপদ সামনে এলো। আমরা যদি কখনো নিজেদের মনকে ঠাণ্ডা মাথায় প্রশ্ন করি কেন আমরা বেহুলার বিপদ নিয়ে এত ভাবি, তাহলে আমাদের চেতনায় একটাই উত্তর ঘুরপাক খায় আর সেটা হল বেহুলার সতীত্বকে নিয়ে। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'লখিন্দর' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বেহুলা' কবিতাটির মধ্য দিয়ে আশাবাদের কথা বলেছেন এবং প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন সত্য ও সুন্দরের বাণী। এই কবিতায় সংগ্রামশীল মানসিকতা নিয়ে তৎকালীন ক্লেদাক্ত সমাজকে অতিক্রম করে যাওয়ার আশা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার কাণ্ডারী বেহুলা নিজেই। সে মৃত স্বামী লখিন্দরকে কোলে নিয়ে কলার মান্দাসে করে গাঙুরের জলে ভেসে যায় জীবিত করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে। কবিতার প্রথমে তাই বেহুলার উক্তিতে শোনা গেছে–

> সে জাগবে। জাগবেই। আমি তাকে কোলে নিয়ে
> ব'সে আছি রক্ত পুঁজে মাখামাখি রাত্রি
> ভেলায় ভাসিয়ে। আমি কান্নার যন্ত্রণা
> গঙ্গায় সাগরে রেখে কাক তড়াই।[১৮]

নারীর জীবনধারণ নির্বিঘ্ন উজ্জাপনের জন্যে একজন পুরুষের ভূমিকা থাকা খুব দরকার। সমাজবিধান অন্তত সেটাই বলে। বিবাহিত নারীর জীবনে প্রধান ভরকেন্দ্র স্বামী। স্বামী যেমনই হোক না কেন, নারীর কাছে সে একমাত্র বেঁচে থাকার অবলম্বন। সতীর জীবনে পতির মূল্য কতখানি নারী জন্মগ্রহণের পর থেকেই তার পরিবারের কাছে শুনে আসে। মনসামঙ্গলের বেহুলার ভাসান যাত্রার মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনা। কেননা একমাত্র স্বামীছাড়া বা স্বামীহারা নারীরাই জানে সমাজে তাদের মূল্য কতটুকু। মৃত্যুর থেকে তা কোনো অংশে কম নয়।

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের যে নৈরাজ্য, হিংস্রতা, ভীরুতা, লোভ, রক্তপুঁজে

মাখামাখি রাত্রি সবকিছুই যেন বেহুলা ভেলায় করে গাঙুরের জলে ভাসিয়ে দিতে চায়। মানুষের মধ্যে যে প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা, আত্মীয়তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, রূপ-সৌন্দর্য সবকিছুই যেন কাক, হায়না, শেয়াল, শকুনের মতো অত্যাচারীদের হাতে আজও ত বিত। তবুও বেহুলা একরাশ স্বপ্ন বুকে নিয়ে অভিযানের আয়োজন করেছে। তার কাছে কোন বাধাই আজ আর বাধা নয়। শত প্রতিকূলতা পেরিয়ে বাংলার এই বিধবা সতী বেহুলা পাতালে, নরকে অথবা যমের দুয়ারেও তার ভেলা নিয়ে যেতে প্রস্তুত স্বামীর প্রাণ ফেরানোর জন্য। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে মৃত স্বামীকে ঘিরে এত প্রত্যয়ের শক্তি বেহুলা কোথা থেকে সংগ্রহ করে। যে নারীকে এরকম কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়, তার পক্ষে কেঁদে আকুল হওয়া সাজে না। বুকের কান্নাকে চাপা দিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করতে হয়। কবির ভাষায়–

> তবু আমি বাংলার বিধবা
> সতী, তাকে ফিরে পাব, হয়েছি সাবিত্রী!
> পাতালে নরকে কিংবা যমের দুয়ারে
> ভিড়বে ভেলা, যাব। সমুদ্রেও
> শান্ত প্রতীক্ষার স্তোত্র গাঁথব পয়ারে;[১৯]

'সতী' শব্দটি স্ত্রী লিঙ্গবাচক এবং এর লিঙ্গান্তরের সংস্থান পৃথিবীর ব্যাকরণে নেই। পুরুষজাতি ঐতিহাসিক ভাবেই বহুগামী হওয়ার ছাড়পত্র পেয়ে আসছে। পৃথিবীর কোনো সমাজেই সামাজিক বিচারে পুরুষের বহুগামিতা তেমন ভয়ঙ্কর দোষাবহ নয়। সতীত্ব আরোপিত কর্তব্যের মতো পালন করে যেতে হবে নারীকে, তার রক্ষার দায়িত্ব নারীরই, তারও পরে নারী হতে পারেন ধর্ষিতা সেক্ষেত্রেও দায় নিতে হবে নারী জাতিকেই। সমগ্র বিশ্বের লিখিত উপাদানের মধ্যে এমন পুরুষ চরিত্র বিরল, যিনি পুরুষ হয়েও নিজের জীবনসঙ্গিনীর জীবন ফিরিয়ে আনার জন্যে মৃত্যুলোকের ওপারে অভিযান করেছিলেন। কিন্তু এমন নারী চরিত্রের অভাব নেই, যে স্বামীর প্রাণ ফেরানোর জন্য কঠিন সংগ্রাম করেননি। মধ্যযুগের বেহুলা নিঃসন্দেহে সেই স্রোতের এক ঢেউ।

কবিতায় বেহুলা শুধু চাঁদ সওদাগরের পুত্রবধূ নয়, সমগ্র দেশপ্রেমিকের রূপকল্প হয়ে উঠেছে; যার হাত ধরে স্বদেশভূমি পবিত্র হবে এবং পূর্ণতা লাভ করবে। সতী বেহুলা দেবতাদের মন জয় করে মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে এনে বিধবা থেকে সধবা হয়ে উঠেছে। আমাদের সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসে তা একটি বিরল ঘটনা। চরম হতাশা ও অবক্ষয়িত সময়কে অতিক্রম করে বেহুলার নতুন করে বেঁচে ওঠার কথা প্রকাশ পেয়েছে শেষ দুটি পঙক্তিতে–

> গান দেব, জ্বলব কিন্তু হব না অঙ্গার
> সে জাগবে, জাগবেই; লখিন্দর সে আমার।[২০]

আধুনিক কালের বাংলা কবিদের মধ্যে অন্যতম শঙ্খ ঘোষ *মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে* (১৯৮৪-২০২১) কাব্যগ্রন্থে সংকলিত 'হেতালের লাঠি' কবিতায় মনসা-কথার চাঁদের ব্যক্তিত্বকে নির্মাণ করেছেন অন্যভাবে। দৃঢ়, প্রত্যয়ী ও নির্ভীক চাঁদের স্বপ্নকে সাকার করে তোলার জন্য কবি হেতালের লাঠিকে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতীকী হিসেবে প্রহরীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করে মনসামঙ্গল কাব্যের ভিন্ন পাঠের নবনির্মাণ করেছেন।

অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ও শিক্ষার সঙ্গে স্বপ্ন দেখার স্বাধিকারও রয়েছে মানুষের। কেননা স্বপ্ন ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকার পথ গতিরুদ্ধ হয়ে পড়ে, আমরা কি সেকথা অস্বীকার করতে পারি। একমাত্র স্বপ্ন দেখার মধ্যে মানুষ কল্পনা করতে পারে এমন এক পৃথিবীর, যেখানে শোষণ থাকবে না, থাকবে না কোনো যন্ত্রণা ও পীড়নের বেদনা। আলোচ্য কবিতায় চাঁদ সেরকমই একজন স্বপ্নাতুর ব্যক্তি। তিনি কল্পনা করেছেন এমন এক পৃথিবীর যেখানে থাকবে না কোনো দ্বন্দ্ব, কোনো সাপ এবং সাপের কামড়ে মৃত্যুর ভয় প্রভৃতি।

'হেতালের লাঠি' কবিতাটি ১৮টি চরণে রচিত একটি স্মরণীয় সনেট। দুটি স্তবকে বিন্যস্ত কবিতার প্রথম স্তবকে আটটি চরণ, দ্বিতীয় স্তবকে দশটি চরণ। কবিতাটির গভীর ভাব সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত কবি উপস্থিত করেছেন নিজের জবানিতে। সমগ্র কবিতাটিতে কবির সময়সচেতন মানসিকতা, সংকট অতিক্রম করার জয়ী জীবনদৃষ্টি ও আদর্শবোধ প্রতিষ্ঠিত। কবি নিজের জবানিতে এমনভাবে কবিতাটি উপস্থাপনা করেছেন, যাতে পাঠকের বুঝতে অসুবিধা না হয়, এই জবানি একই সঙ্গে চাঁদ সদাগরেরও।

বিশ শতকের আটের দশকের গোপন চক্রান্ত ও অশুভ শক্তির আঁতাতকে তুলে ধরার জন্য কবি পুরাণের চাঁদ ও মনসার দ্বন্দ্বকে মিথ হিসেবে ব্যবহার করেছেন এই কবিতায়। আমরা যদি মনসাকথার আদি পাঠ লক্ষ করি, তাহলে সেখানে ক্ষমতার দুটি ভরকেন্দ্র দেখতে পাই, সেই ভরকেন্দ্রের একদিকে মনসা আর অন্যদিকে চাঁদ সদাগরের অবস্থান। একজনের পরিচিতি প্রতাপে তো অন্যজনের পরিচিতি প্রতিজ্ঞায়। উভয়ের শক্তির কথা যদি আমরা বলি তবে বলতে হয় দুই তরফে দুইরকম শক্তির সহায় ছিল। মনসার শক্তি ছিল আধিভৌতিক দৈবী শক্তি অন্যদিকে বণিকের শক্তি ছিল আত্মশক্তি আর আত্মবিশ্বাস। মনসার আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল। মনসামঙ্গলে আমরা বারবার দেখেছি মনসা কোনো প্রতিরোধের সামনাসামনি পড়লে সহচরী নেতার পরামর্শ নেয়। মনসা চাঁদ সদাগরকে যতবার আক্রমণ করেছেন ততবারই তিনি ছলনা ও কৌশলের পথ অবলম্বন করেছেন। সম্মুখ সমরে মনসা কখনো উপনীত হয়নি। বিপরীত দিকে চাঁদ সদাগর বরাবর সম্মুখ সমরের পন্থা অবলম্বন করেছে। সদাগর শক্ত হেতালের লাঠির আঘাতে মনসার বিগ্রহ ভেঙে দিয়েছে। সনকার মনসা পূজার ঘট চাঁদ পদাঘাতে চূর্ণ করেছে এবং নগরের চারিদিকে মনসাপূজা বন্ধ করে দিয়েছে। চাঁদ সেই লড়াই জারি রেখেছে

আখ্যানের শেষ পর্যন্ত। মনসার ক্ষমতার বিপক্ষে চাঁদের সুপ্ত জেহাদের এই লড়াইকে কবি শঙ্খ ঘোষ এমন এক মাত্রা দিয়েছেন, যা মনসাকথার পাঠকে বহুকৌণিক সম্ভাবনার দ্বারে পৌঁছে দিয়েছে।

বাসররাতে পুত্র লখিন্দরের মৃত্যুর কথা বণিক চাঁদ জানতো। সে কারণে চাঁদ পুত্র লখিন্দর ও পুত্রবধূ বেহুলার জন্য সান্তালী পর্বতে নিশ্ছিদ্র লোহার ঘর নির্মাণ করার আদেশ দিয়েছে বিশ্বকর্মাকে। কুচক্রী মনসা যেন কোনোভাবে বাসর ঘরে প্রবেশ করতে না পারে, তাই চাঁদ লোহার সিঁড়িতে 'হেতালের লাঠি' হাতে অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে নিজেই পাহারারত ছিলেন। মহান কর্মযজ্ঞের যাঁরা নিরলসভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন তাদের সামনে সমূহ বিপদ। এমন সম্ভাবনাময় কালরাত্রিতে যেন কোনো 'ফণা' এসে সেই সব মানুষদের শিয়রে কুণ্ডল করে বসতে না পারে–

> হেতালের লাঠি নিয়ে বসে আছি লোহার সিঁড়িতে
> কালরাত্রি কেটে যাবে ভাবি, ওরা বাসর জাগুক
> এমন রাত্রিতে কোনো ফণা এসে যেন না ওদের
> শিয়রে কুণ্ডল করে, কেটে যাক প্রেমের প্রহর।[২১]

সন্তানের প্রতি চাঁদের অপত্য স্নেহ প্রবল। প্রকৃত পিতা হিসেবে চাঁদ সন্তানের প্রতি কর্তব্য পালনে কোনো রকম খামতি রাখেনি। চাঁদের এইরকম কর্তব্য নিষ্ঠার মধ্যে আজকের যুগের পিতামাতার সন্তানের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা, দায়িত্ব পালন এবং ভবিষ্যৎ মঙ্গলকামনার প্রভৃতি দিক প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের বহুপরিচিত একটি পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে– 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' পঞ্চম থেকে অষ্টম চরণে কবি সংগ্রামী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। দেবতার সঙ্গে মানুষের এই লড়াই যেন দুর্বল শ্রেণির সঙ্গে শোষক শ্রেণির লড়াই। শোষক শক্তি সবসময়ই প্রবল হয়। তারা তাদের শোষণ কায়েম করতে কোনো ত্রুটি রাখে না। প্রতিনিয়ত শোষক শক্তি বিপ্লবীদের চেতনায় ছড়িয়ে দেয় অবিশ্বাস আর প্রতিক্রিয়ার নিদ্রালুতা। বিপ্লবের ইচ্ছেটাকে ভিতর থেকে নষ্ট করে দেওয়া শোষক শ্রেণির প্রাচীনতম ও কার্যকারী কৌশল। বিপ্লবী সৈনিকদের সবসময় এই কথা মাথায় রাখতে হবে যে, প্রগতি যখন ঘুমায়, প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধী শক্তি তখন জেগে ওঠে। তাই বিপ্লবী সৈনিকদের পক্ষে ঘুম ভয়ঙ্কর। এই ঘুম বলতে শরীরের ঘুমকে নয়, চেতনার ঘুমের কথা বলেছেন–

> কিন্তু বড়ো ঘুম, এক কালঘুম মায়াঘুম কেন
> কেবলই জড়ায় চোখ, অবসাদে ভরে দেয় শিরা
> সমস্ত চেতনাঘেরা নাগিনীপিচ্ছিল অন্ধকারে
> ঢিল হয়ে আসে মুঠি, খসে আসে হেতালের লাঠি।[২২]

কবিতাটিতে বেহুলা-লখিন্দর শুধু পুরাণের নায়ক-নায়িকাই নয় তার উভয়ে আসলে ভাবীকালের এমন এক প্রতীক যেখানে শোষণের কোনো ছাপ থাকবে না। তারা উভয়ে এমন এক সম্ভাবনাময় অভিযানের প্রতীক, যাঁদের যাত্রাপথ বুর্জোয়া শাসনের শক্তিকে প্রতিহত করে আগামী পৃথিবীকে নতুনভাবে গড়ে তুলবে এবং সমাজকে সৃষ্টি করবে নতুন ভাবে। যাঁদের অবিরাম সংগ্রাম পৃথিবীকে শস্যশ্যামলায় ভরে তুলবে এবং সকলের খাদ্য পাওয়ার অধিকার সুনিশ্চিত করবে। নতুন করে তৈরি করবে উৎপাদনশীলতা ও প্রজননশীলতার পথ–

তারও মাঝখানে আমি স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন দেখি
দেখি ওরা হেঁটে যায় পৃথিবী সুন্দরতর ক'রে
নক্ষত্রবিলাসে নয়, দিনানুদিনের আলপথে
আর যতদূর যায় ধানে ভরে যায় ততদূর।[২৩]

নিজের আপনজন ও ধনসম্পদ ও চম্পকনগর রার্থে চাঁদ সদাগর যেমন হেতালের লাঠি ব্যবহার করেছেন। অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করে চাঁদ স্বপ্ন দেখেছেন এক সুন্দর পৃথিবীর। বেহুলা ও লখিন্দরের এই এগিয়ে চলার শক্তি যেন মাটির মানুষের কল্যাণ কামনায় প্রতীকায়িত হয়ে ওঠে। সমাজে প্রেমের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে তাদের রা করাই যেন কবির কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। বুর্জোয়া শাসনতন্ত্র ও ঔপনিবেশিক শক্তির কবলে চম্পকনগরী স্বার্থের বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়, যেখানে মানুষের কোনো স্বাধীনতা নেই। সেই নগরের মানুষদের আদর্শ ও স্বপ্ন সেই কুটিল চক্রান্তে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। এই বিপন্ন সময়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে চাঁদ 'হেতালের লাঠি'কেই বেঁচে থাকার হাতিয়ার করেছে। যুগান্তকালের মানুষের হাতে হেতালের লাঠি যেন চাঁদের ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষের প্রতীকী নবীকরণ।

প্রহরী চাঁদের মত আমরাও জেগে থাকি, যাতে আমাদের সন্তান-সন্ততির কোনো বিপদ না আসে। 'নাগিনীর শ্বাস' এর মতো কোনো অশুভ শক্তির স্পর্শ বা ছোঁয়া না লাগে। 'হেতালের লাঠি' এখানে প্রতিবাদী শক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

আধুনিক কালের অন্যতম জনপ্রিয় কবি হলেন জয় গোস্বামী (১৯৫৪-)। বাংলা কাব্যজগতে তাঁর আবির্ভাব শুরু হয়েছিল লিটল ম্যাগাজিনে কবিতা প্রকাশের পরে। তাঁর লেখা প্রথম কবিতা 'সিলিং ফ্যান'। তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার কথা, অত্যাচারিত নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কথা ইত্যাদি। জয় গোস্বামী রচিত 'ডিঙা' সনেটধর্মী কবিতা। দুটি স্তবকে চৌদ্দটি পঙক্তি বিশিষ্ট কবিতাটি মধ্যযুগের মনসামঙ্গলের অনুষঙ্গ ও চাঁদ চরিত্রের প্রশস্তি ও মনসার আক্ষেপের নবনির্মিত পাঠ।

কবিতার প্রথম স্তবক জুড়ে কবি বর্ণনা করেছে পুরাণের অন্যতম চরিত্র চাঁদ সদাগরের

প্রশস্তির কথা। মনসামঙ্গলের আত্মবিশ্বাসী চাঁদ মনসার শক্তির কাছে আত্মসমর্পন করেনি। কিন্তু কবিতায় লক্ষ করা যায়, চাঁদ বণিকের চৌদ্দডিঙা (মতান্তরে সপ্তডিঙা) মনসার কুটিলচক্রের ফলে গাঙে ডুবে যায়। বণিক চাঁদ নিঃশ্বাস নেবার জন্য মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে। বলিষ্ঠ চাঁদ নিজে থেকে প্রস্তুত কারণ সে জানে সামনে তাঁর বড়ো বিপদ। গাঙের বড়ো খাদের সামনে পড়লেও সে মনসার ফেলে দেওয়া কাঠ সে ধরবে না। শৈব উপাসক চাঁদ কখনোই মনসা পূজা করতে রাজি ছিল না, দেবী মনসার সঙ্গে কোনোরকম আপসরফায় আসতে চাননি। তা সে যতই বাধা আসুক না কেন। তাতে যদি তাঁর স্ত্রীর মাথার সিঁদুর মুছে যায় এবং হাতের শাঁখা ভেঙে ফেলতেও হয়, তবুও সে চ্যাঙমুড়ি মনসার দয়া গ্রহণ করবে না। চাঁদ হেতালের লাঠির তীব্র আঘাতে মনসার বিগ্রহ ও ঘট'কে চুরমার করে দিতে চায়। বলিষ্ঠ ও আত্মবিশ্বাসী চাঁদ বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে জল ঠেলে পাশ কাটাবে ডুবন্ত ডিঙাকে। কবির ভাষায় বিষয়টি ফুটে উঠেছে–

যদি তাতে আছড়ে পড়ে ভাঙে
তার সধবার শাঁখা, তবুও চেংমুড়ী কানি, তোর
দয়া সে নেবে না; তোর শরীর, বিগ্রহ কিংবা ঘট
যা পাবে চুরমার করবে তার তীব্র লাঠির দাপট;
বরং সে ঠেলবে জল, পাশ কাটাবে ডুবন্ত পাথর...[২৪]

বিশ শতকের শেষ লগ্নে এসে কবি সংকটময় সময়ে এমন এক চরিত্রের কল্পনা করেছেন। যার প্রবল শক্তির জোরে অশুভ আঁতাতের বিনাশ ঘটবে এবং যার হাতে শুভ শক্তির জয় হবে। কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে কবি মনসার আক্ষেপের মধ্য দিয়ে একালের নারীজাতির অবস্থানের বর্ণনা দিয়েছেন। মনসার কথা একদিন নাকি চাঁদ ভুল করে তাঁর ঘরে ঢুকে পড়েছিল। তখন চাঁদের হাতে হেতালের লাঠি দেখে সমস্ত নাগেরা পালিয়ে যায়। মনসাও বিবস্ত্র হয়ে পড়ে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অবহেলিত নারীর অন্তরের দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা শোনার কেউ থাকে না। নারী তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে। এর চেয়ে নারীর কাছে দুঃখের কী হতে পারে। কবিতায় কবি সেই কথাই তুলে ধরেছে মনসার বক্তব্যে। মনসার মুখে তাই শোনা গেছে একালের নারী জাতির বেদনা ও হতাশার আর্তনাদ এবং আক্ষেপ–

এক চক্ষু কন্যা আমি, দিনে দিনে হয়েছি ডাগর।
ফিরেও দ্যাখোনি কেউ। তুমি কেন বুঝলে না তখন
সময়ে পূজা না পেলে দেহে লক্ষ ডিঙা ডুবে যায়![২৫]

আধুনিক কালের যুগযন্ত্রণা ও সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ প্রভৃতির চিত্র তুলে ধরতে কবি আশ্রয় নিয়েছেন মনসামঙ্গল কাব্যের উঠানে।

এছাড়া জিয়া হায়দারের 'লখিন্দর' কবিতায় লোহার বাসরঘরের চিত্রকল্পে আধুনিক মানুষের সংকট এবং বেহুলার মধ্যে একালের নারীভাবনা দেখানো হয়েছে। কৃষ্ণা বসুর 'চাঁদ বণিকের ডিঙা' কবিতায় অতীতের কষ্টি পাথরে বর্তমানকে যাচাই করে সমকালের বিপন্নতা ও সংকটকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আমাদের ক্রমাগ্রমুখিনতার মাঝেও কখনো কখনো পেছন ফিরে দেখতে হয়। কেননা এগিয়ে চলার পথে আমাদের বহু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়; আমরা সেখানে থেমে না গিয়ে যদি পেছনে ফেলা আসা নিজের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি, তাহলে আমাদের চলার পথ সহজ ও সুগম হয়ে উঠবে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সাহিত্যিকেরা একই পন্থা অবলম্বন করে। আধুনিক কবিরা মনসামঙ্গলের কাহিনি, চরিত্র ও অনুষঙ্গকে যুগের রুচি চাহিদা অনুযায়ী আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যবহার করে মঙ্গলকাব্যের নব রূপায়ণ করে চলেছেন।

তথ্যসূত্র :

১। তপোধীর ভট্টাচার্য : 'জাক দেরিদা তাঁর বিনির্মাণ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ.- ৫৪।
২। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার : 'সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৩, পৃ.- ২৪৪।
৩। বিপ্লব চক্রবর্তী : 'লোকাভরণ : আধুনিক কবিতার শৈলী', পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৭০০০০৯, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ.- ৩৫।
৪। তদেব, পৃ.- ১৩১।
৫। জীবনানন্দ দাশ : 'রূপসী বাংলা', নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা-৭, আগস্ট ২০১৫, পৃ.- ১৭।
৬। তদেব, পৃ.- ১৭।
৭। বিষ্ণু দে : ' বিষ্ণু দে'র শ্রেষ্ঠ কবিতা', নাভানা, কলকাতা ৭০০০৭২, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫, পৃ.- ১২৭।
৮। তদেব, পৃ.- ১২৭।
৯। তদেব, পৃ.- ১২৭।
১০। সঞ্জয় ভট্টাচার্য : 'সঞ্জয় ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা', ভারবি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃ.- ১৭৬।
১১। তদেব, পৃ.- ১৭৭।
১২। অরুণ মিত্র : 'ভাঙনের মাটি', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ.- ৫০।
১৩। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা', ভারবি, কলকাতা ৭০০০০৯, মার্চ ১৯৬০, পৃ.- ৩০।
১৪। তদেব, পৃ.- ৩০।
১৫। তদেব, পৃ.- ৩১।

১৬। তদেব, পৃ.- ৩১।
১৭। তদেব, পৃ.- ৩১।
১৮। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'নির্বাচিত কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০, পৃ.- ১২।
১৯। তদেব, পৃ.- ১২।
২০। তদেব, পৃ.- ১২।
২১। শঙ্খ ঘোষ : 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৭৮, পৃ.- ১২৫।
২২। তদেব, পৃ.- ১২৫।
২৩। তদেব, পৃ.- ১২৫।
২৪। জয় গোস্বামী : 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', প্রতিভাস, কলকাতা ৭০০০০২, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০৮, পৃ.- ২৩১।
২৫। তদেব, পৃ.- ২৩১।

এনইউবি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা
(Peer-Reviewed Journal)
ISSN : 2710-4451
বাংলা বিভাগ
নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২২

প্রবন্ধের স্বরূপ ও সংস্কৃতির সন্ধান

ড. উৎপল মণ্ডল*

সার-সংক্ষেপ: নিজের মনন-চিন্তন ও অনুভবকে সমকাল ও উত্তরকালের অন্যজনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে বাসনা সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক মনস্তত্ত্ব, সেখানেই নিহিত যাবতীয় শিল্পসৃষ্টির উৎস-রহস্য। বস্তুত, জীবজগতের এই বৈশিষ্ট্য শুধু মানুষেরই। আর তাই মানুষের চিন্তা ও অনুভব বারবার প্রকাশিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে– কখনো রঙ-তুলি বা মাটি-পাথর বা সুর আর কখনো বর্ণ-শব্দ-বাক্য। তবে বর্ণ-শব্দ-বাক্য দিয়ে যে-কোনো ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি হলেও, প্রকাশভঙ্গির তারতম্যে সেগুলো আবার ভিন্ন-ভিন্ন সংরূপ হয়ে উঠেছে পরবর্তীকালে। যেমন উপন্যাসে, গল্পে কিংবা নাটকে স্রষ্টা পরোক্ষ, সেখানে মূলত চরিত্র এবং চরিত্রের ক্রিয়া-কলাপের মধ্যেই বক্তব্যের প্রকাশ। কিন্তু গীতিকবিতা ও প্রবন্ধ স্রষ্টার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। এই দুইয়ের মধ্যে গীতিকাব্য আবার স্রষ্টার প্রত্যক্ষতা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা আভাস-ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনা সহযোগে এক রহস্যময়তায় আবৃত।

আমরা স্রষ্টার মনন-চিন্তনের সরাসরি ও সাবলীল প্রকাশ শুধু প্রবন্ধেই লক্ষ করি। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, প্রবন্ধও অল্পবিস্তর গীতিকবিতার লক্ষণাক্রান্ত হতেই পারে, বিশেষত আত্মগত প্রবন্ধ; কিন্তু তার প্রকাশ কখনোই কবিতার মতো নয়। অর্থাৎ মনন-চিন্তনের বিষয়বস্তুতে আবেগের পরিমাণ বেশি থাকলে তা তীব্র অনুভূতিলগ্ন চিন্তা হলে প্রবন্ধ অল্পবিস্তর কাব্যগন্ধী হতে পারে। তবুও সে প্রবন্ধের আবেগ-মথিত চিন্তাও যুক্তিনিষ্ঠভাবেই প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ প্রবন্ধের বিষয় যাই হোক, প্রকাশ ভঙ্গির যুক্তিনিষ্ঠতায় বিজ্ঞান মনস্কতার দিকে নিয়ে যায় প্রবন্ধকে।

প্রবন্ধের আঙ্গিকগত দিক থেকে দুটি দিক গুরুত্বপূর্ণ–১. স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রত্যক্ষতা। ২. যুক্তি-শৃঙ্খলিত সাবলীলতা। অর্থাৎ প্রবন্ধের ক্ষেত্রে স্রষ্টা-সৃষ্টি এবং উপভোক্তা– এই ত্রিস্তরের যোগাযোগ প্রত্যক্ষ।– Compton's pictured Encyclopedia-q (Vol-4) তাই দেখা যাচ্ছে–

> "... unlike the novel of the short story or the drama, the essay does not aim primarily to create characters and through them to tell a story. It speaks directly to the readers, giving the author's views on customs or happenings or people, on art, on books, or on life in general. It may Teach, argue, persuade, arouse emotion, or merely amuse."

অবশ্য ব্যতিক্রম একেবারেই নেই যে, তা নয়। কখনো কখনো বক্তব্য অনুযায়ী স্রষ্টা নিজেকে আড়াল করতে চান। যেমন– বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *কমলাকান্তের দপ্তর*-এ একজন কথককে হাজির করেছেন। এ আড়াল করা অন্যভাবেও হতে পারে। যেমন– লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি তাঁর *নোটবই* লিখেছিলেন উল্টো করে। বহুক্ষেত্রে আবার কথোপকথন ভঙ্গি বা কখনো বৈঠকি চালও লক্ষ করা যায়। যেমন– সৈয়দ মুজতবা আলী ও বিবেকানন্দের রচনায়। সেক্ষেত্রে মনে হয় স্রষ্টা কী বলছেন, আর কিভাবে বলছেন, তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই বিষয়ে বলার ধরন অনুসারে প্রবন্ধ সাহিত্যে তাই শ্রেণি বিভাগও করা হয়। যেমন পাশ্চাত্য সাহিত্যে, তেমনি প্রাচ্যেও। তবে যেভাবেই বলা হোক– চিন্তার যুক্তি- শৃঙ্খলিত বিন্যাস প্রায় সর্বত্রই লক্ষণীয়।

প্রকাশভঙ্গিতে যুক্তি-শৃঙ্খলিত সাবলীলতার প্রসঙ্গে এসে পড়ে গদ্যরীতির কথা। বিশেষত, বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তো বটেই। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষক ড. অধীর দে তাঁর *আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা* (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন–

> ''...প্রবন্ধের আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সাধারণত: কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া লেখক যখন কোনো ভাব বা বিষয় যুক্তিযুক্ত ও সংযতভাবে বা পরিপাটিরূপে গ্রন্থনা করেন এবং প্রধানতঃ সরস গদ্যরীতিতে ও দীর্ঘ বা অনদিদীর্ঘ পরিসরে তাহার প্রকাশভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত করেন, তখনই তাহাকে প্রবন্ধ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।''

লক্ষণীয় তিনি 'কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তি অবলম্বন' বলার পরেই বলেছেন 'যুক্তিযুক্ত ও সংযতভাবে' অর্থাৎ কল্পনার কথা হয়তো বলেছেন মৃন্ময় বা আত্মগৌরবী প্রবন্ধের কথা ভেবেই, কিন্তু সে কল্পনা যে 'কবিতা কল্পনালতা' হবে না, তা বোঝা যায় 'যুক্তিযুক্ত' শব্দের ব্যবহারে। কল্পনা তো থাকতেই হবে। বিজ্ঞানের প্রায় সব বিষয়ই এতই কাল্পনিক যে তা বাস্তবে বা অভিজ্ঞতায় আনা প্রায় অসম্ভব। তবু বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সর্বদাই যুক্তিযুক্ত। এখানেই অন্য সাহিত্য সংরূপের সঙ্গে প্রবন্ধের মূল স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই প্রকাশকেন্দ্রিক– যেখানে যুক্তিনিষ্ঠাই বড় কথা। আর 'গদ্যরীতিতে'

* অধ্যপক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

কথাটি বলেছেন হয়তো সাধারণভাবে বাংলা প্রবন্ধ বলতে যা বোঝায়, তার উৎস ও বিকাশের কথা ভেবেই। কেননা বাংলা প্রবন্ধ হিসেবে আমরা যাকে চিনি– যদিও তা প্রথম অবস্থায় 'প্রস্তাব', 'সন্দর্ভ' প্রভৃতি শব্দে চিহ্নিত হতো, তার জন্ম ও সাবালকত্ব প্রাপ্তি বাংলা গদ্যের জন্ম ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই। আর একথাও ঠিক যে, প্রবন্ধ বলতে এক ঝটকায় আমাদের মানসলোকে যা অবলোকন করি, তা আসলে গদ্যের প্রচলিত সিনট্যাক্সেই রচিত। এখানেই আমাদের মূল প্রশ্ন। তাহলে মহাভারতে 'অষ্টাদশ পর্ব'কে প্রবন্ধ বলছেন কেন স্বয়ং রচয়িতা? *চৈতন্যচরিতামৃতে*'র কিছু অংশ কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* বা রামানুজের গাণিতিক চিন্তা? এদিক থেকে ভাবলে আমাদের পৌঁছাতে হবে বিষয়ের দিকে।

বিষয়গত দিক দিয়েও ভাবার আছে। মনন-চিন্তনের একটি অন্যদিক– অন্য বিষয় (যা কল্পনা হলেও আবেগের শতাংশ কম) যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়, অথবা তার উল্টো দিক– ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা মনন-চিন্তনকে পুষ্টি জোগায়, তখন তার প্রকাশ যেভাবেই হোক তা তো আসলে প্রবন্ধই। স্টিফেন হকিং-এর *ব্রিফ্ হিস্ট্রি অব্ টাইম্* কিংবা অমর্ত্য সেনের লেখালেখি যে প্রবন্ধ তা আমাদের চিন্তাই করতে হয় না। তাহলে আর্যভট্ট বা ভাস্করাচার্য্যের গাণিতিক তত্ত্ব, রামানুজের গাণিতিক তত্ত্ব বা কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* কিংবা বটেশ্বরের জ্যোর্তিবিদ্যা বিষয়ক রচনা, লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির *নোটবই* কেন প্রবন্ধ পর্যায়ভুক্ত হবে না? তাই শুধু ফর্ম (form) নয়, বিষয়ও (content) ভাবা দরকার। আর ফর্ম (form) গত দিক থেকে গদ্য না পদ্য এর থেকেও বোধ হয় বেশি গুরুত্বের দাবিদার যুক্তিনিষ্ঠতা, যা প্রবন্ধকে নিয়ে যায় বিজ্ঞান মনস্কতার দিকে। এই কারণেই বোধ হয় *মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব*, কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃতে*'র তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বা *গীতা* ছন্দে লেখা হলেও তার ভাষায় কবিতাসুলভ আবেগের চেয়ে মননের প্রাধান্য। একই কারণেই কালিদাসের শ্লোকের ভাষা আর আর্যভট্ট বা রামানুজের শ্লোকের ভাষা এক নয়। ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* কিংবা *উজ্জ্বল নীলমণি*'র ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। আসলে ব্যাকরণগতভাবে যাকে আমরা গদ্য ভাষা বলি তার জন্ম তখন হয়নি বলেই, তাঁরা তাঁদের মননকে– তা সে গণিত, জ্যোর্তিবিদ্যা, ধর্ম, দর্শন, তত্ত্ব যাই হোক না কেন ধরে রেখেছিলেন শ্লোক আকারে।

তাহলে তত্ত্বগতভাবে দেখতে গেলে প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর পরিধি প্রায় সীমাহীন। সভ্যতা-সংস্কৃতির যাবতীয় দিকই প্রবন্ধের বিষয়। আরেকটু স্পষ্ট করে বলতে গেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে উত্তরাধুনিক চিন্তা-ভাবনা বিকাশের সময় থেকে অন্যান্য সাহিত্য সংরূপেরও ক্ষেত্রসীমা বেড়ে যেতে থাকে। চিত্র-ভাস্কর্য-বিজ্ঞান হয়ে ওঠে গল্প-উপন্যাস ও নাটকের বিষয়। এমনকি একান্ত বিজ্ঞানের বিষয় নিয়েও রচিত হয় কবিতা। ঠিক তার

উল্টোটাও ঘটে। মননশীলতার ক্ষেত্রেও ঢুকে পড়ে আবেগ মথিত ভাষা। এই যে সবার ক্ষেত্রসীমার ভাঙন এবং ক্রমাগত পরিবর্তন, এর দুটি কারণ অনুভব করা যায়–১. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালের যুগপ্রবণতাই হলো দ্রুত গতিতে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রহণ-বর্জন। সেটা শুধু সাহিত্য-শিল্পের জগতেই নয়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও। না হাইব্রিড শস্যের জন্মই হতো না এভাবে। ২. প্রথমটির পরিপূরক এটি, যাকে আবার উত্তরাধুনিকতার বৈশিষ্ট্যও বলা হচ্ছে– প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা ও প্রচলিত ছক ভাঙা। এর ফলে সাহিত্য সংরূপেরই বিষয় এবং আঙ্গিক বদলে যেতে থাকে, তেমনি জন্ম নেয় আন্ত র্বিদ্যক সমালোচনা (ইন্টারডিসিপ্লিনারি ক্রিটিসিজম্) ।

তবে প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বিষয়টি সাম্প্রতিক প্রবণতা নয়, অনেক পুরনো। উত্তরাধুনিক চিন্তা-বিকাশের কালে এই প্রবণতাজনিত কারণে যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, তা প্রবন্ধে বিষয়গত দিক থেকে নয়, প্রকাশগত দিক থেকে হয়ে উঠেছে আরো বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিষয়বস্তু চিরকালই সংস্কৃতির অঙ্গীভূত সমস্ত কিছুই। আমরা তাই প্রবন্ধের স্বরূপ সম্পর্কে বলতে পারি– আবহমান সভ্যতার মননে সংস্কৃতির যাবতীয় দিক সংক্রান্ত যে চিন্তাভাবনা, তা যখন বিজ্ঞানসম্মতভাবে অর্থাৎ শৃঙ্খলিত যুক্তির বিন্যাসে ধরা পড়ে বর্ণ-শব্দ-বাক্য সহযোগে, তখন সেখানেই খুঁজে পাওয়া যায় প্রবন্ধের বিচরণভূমি, সে বিচরণ ছন্দের তাতেই হোক বা আড্ডার মেজাজেই হোক।

'সংস্কৃতির যাবতীয় দিক সংক্রান্ত', বলছি এজন্যই যে, সংস্কৃতি ব্যাপারটিই জীবনের বহুকৌণিক সমগ্রতার সঙ্গে অন্বিত। জীবনের এই সমগ্রতা যেমন কালগত, তেমনি সমষ্টিগত। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'শিল্প-সংস্কৃতির-ইতিহাস' গ্রন্থে সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উন্নত জীবনের এই সমগ্রতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আরো স্পষ্ট ও সরলভাবে বিষয়টি জানিয়েছেন নীলিমা ইব্রাহিম (বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা, ঢাকা) –"কোন একটি জাতি বা মানবগোষ্ঠীর দৈনন্দিন নিত্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম থেকে শুরু করে তার চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশের সম্মিলিত রূপায়ণই ওই জাতি বা গোষ্ঠীর সংস্কৃতি নামে সাধারণ অভিহিত হয়ে থাকে।"

নব নব জিজ্ঞাসা, চিন্তা, সমাজকথা, পরিবার ও ব্যক্তির জীবনাদর্শ– সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তিকে কোনো না কোনো দিক দিয়ে অভিভূত করলো। এর ফলে প্রবন্ধ-নিবন্ধ সাহিত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রয়োগ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের তরল সামাজিক অবস্থার সাময়িক প্রতিফলন হয়েছে তৎকালীন সাময়িক পত্রিকার পত্র মর্মরের মধ্যে সমাজ, রীতিনীতি ও ধর্মান্দোলন সম্পর্কিত দু চারটি নিবন্ধের মধ্যে।

প্রাচীন সংস্কৃত এবং ইউরোপের গ্রিক-রোমান ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট গদ্যরচনা বহু পুরাতন যুগ থেকেই চলে আসছে। মধ্যযুগের ইউরোপে লাতিন ভাষাতেও ধর্ম সংক্রান্ত

বহু আলোচনা স্থান পেয়েছিল। রেনেসাঁসের সময়ে যখন দেশভাষার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তার কিছু পরে ইউরোপে ছাপাখানার কাজ শুরু হলো, তখন নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম-সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা ও বিবাদ বিতর্ক দেশীয় ভাষাতেই প্রচারিত হয়েছিল।

ইউরোপে বিশেষ বিশেষ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে চিন্তাগ্রাহ্য প্রবন্ধ রচিত হতে আরম্ভ করে। বাংলাদেশের সংস্কৃত পণ্ডিতগণ মধ্যযুগে ন্যায়শাস্ত্র ও ষড়দর্শন আলোচনায় সংস্কৃত গদ্যই ব্যবহার করতেন তখন। কিন্তু সে যুগে একমাত্র চিঠিপত্র ও দলিল দস্তাবেজ ছাড়া অন্য কোনো গদ্য ব্যবহৃত হতো না। ঊনিশ শতকে এসে বাঙালির জীবন, সংস্কৃতি ও মনোভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হতে লাগলো। এভাবেই ধীরে ধীরে গদ্য প্রবন্ধের উৎপত্তি হলো। যুক্তি, পারম্পর্য, বৈজ্ঞানিকতা, নিস্পৃহতা– এই সমস্ত হচ্ছে প্রাবন্ধিকের বড় গুণ। কিন্তু আর এক প্রকার গদ্যনিবন্ধ আছে, যাকে প্রবন্ধ না বলে 'রচনাসাহিত্য' বলা যেতে পারে। রচনাসাহিত্য যাকে ইংরেজিতে বলে– Essay Literature. এর জনক হচ্ছেন প্রসিদ্ধ ফরাসি লেখক মিচেল ম'তে'ই (১৫৩৩-১৫৯২)। মিচেল ম'তেই নতুন একটা চেষ্টা করেছিলেন বলে ওই গদ্যের নাম দিয়েছিলেন Essais. পরে বেকন ইংরেজি সাহিত্যে এই আদর্শ অনুসরণ করেন। তারপর আঠারো-ঊনিশ শতকে অ্যাডিসন, স্টিল, হ্যাজেলিট, স্টিভেনসন, গোল্ডস্মিথ প্রমুখ রচনাসাহিত্যের চূড়ান্ত ক্রমবিকাশ দেখিয়ে গেছেন।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য বর্তমান অবস্থানে আসতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। বাংলা গদ্য সাহিত্য অন্যান্য অনেক ভাষার মতো প্রাচীনকাল থেকেই সূচনা হয়। বাংলা প্রবন্ধের সূচনা হয়েছে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা বিভাগ চালু হওয়ার পর থেকেই গদ্য রচনা ব্যাপকতা লাভ করে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরি এবং তাঁর সহযোগী সংস্কৃত পণ্ডিত রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯) প্রমুখের গদ্য রচনাই বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের সূচনা হিসেবে গণ্য। বাংলাদেশে ঊনিশ শতকে অন্যান্য লেখকগণ বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে আলোকিত করলেও রবীন্দ্রনাথই রচনাসাহিত্যের বিচিত্র ঐশ্বর্য ফুটিয়ে তুলেছেন।

রচনাসাহিত্য গদ্যে লেখা এবং কথাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়; আবার তথ্যবহুল কথার বুদ্ধুদও নয়। গদ্যনিবন্ধ যখন রসসৃষ্টি করতে পারে, যখন তাতে বস্তুভারের চেয়ে সূক্ষ্ম রসের ব্যঞ্জনা থাকে বেশি, যখন সেটি রচনাকারের ব্যক্তিসত্তারই প্রতিফলনরূপে প্রতিভাত হয়, তখন তাকে রচনাসাহিত্য বলা যেতে পারে। যে-কোনো বিষয়কে অবলম্বন করে লেখক যখন নিজের মনের কথা বলেন, তখন তা রচনাসাহিত্যের পর্যায়ে

পড়ে। কিন্তু যে-কোনো শিথিল ধরনের মনের কথাই রচনাসাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না। গীতি কবিতার আত্মগতভাব, নাটকের চমৎকারিত্ব, কাহিনীর সরসতা, রোমান্টিক সৌন্দর্য, নি:স্পৃহ দার্শনিকতা, সরস কৌতুকপ্রবণতা, জগৎ ও জীবন, পরিবেশ ও ব্যক্তি সম্বন্ধে উদার সহনশীল ভাব এসব গুণ না থাকলে সার্থক রচনা সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। বিদ্যা বুদ্ধি ও প্রযত্ন থাকলে ভালো প্রাবন্ধিক হওয়া যায়, কিন্তু রচনাসাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে শিল্পীমন, সরসভাব এবং সুগভীর প্রত্যয় চাই। রচনাকারের ব্যক্তিগত কথা যখন পাঠকের মনে গিয়ে অনুরূপ ব্যক্তিগত ভাব সৃষ্টি করতে পারবে তখন তা সার্থক রচনাসাহিত্যে পরিণত হবে।

বাংলা প্রবন্ধের শৈশব থেকে শুরু করে গোটা বিশ শতক পর্যন্ত লক্ষ করলে দেখা যায়, বাঙালি সংস্কৃতির সমস্ত দিকই হয়ে উঠেছে প্রবন্ধের বিষয়। সাধারণভাবে বাংলা প্রবন্ধের বিকাশ লক্ষ করা যায় গদ্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং তা অবশ্যই নবজাগরণ পর্বে। উনিশ শতকের প্রথম পর্বে যুক্তি-বুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালি চেতনার যখন আলোড়ন সৃষ্টি হয় তখন শুরু হয় সমস্ত কিছুকে নতুন করে বিচার করার প্রবণতা। তাই আবহমান কালো বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক– সে সংস্কারের পক্ষেই হোক আর বিপক্ষেই হোক, ধরা পড়ে গদ্য রচনায়। রামমোহনের সংস্কারপন্থী ধারা বা রাধাকান্ত দেবের বিরোধী ধারা কিংবা ডিরোজিওপন্থীদের বিপ্লবাত্মক ধারা– সবাই নবজাগরণের পরিপ্রক্ষিতে তাঁদের মতকে প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গদ্যের আশ্রয় নেন। কেননা মানুষের কাছে পৌঁছাতে গেলে গদ্যই অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই প্রাথমিক পর্বে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য, অন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক প্রাবন্ধিক সামাজিক সংস্কার- বিশ্বাস, ঈশ্বরের অস্তিত্ব-নাস্তিক্য, ইতিহাস, পুরাণ, সমাজ, দর্শন সমস্ত কিছু নিয়েই প্রবন্ধ রচনা করেন। আর অক্ষয়কুমার দত্ত বিজ্ঞান বিষয়ক যে সমস্ত প্রবন্ধ রচনা করতে থাকেন তা পড়ে বিশিষ্ট অধ্যাপক জন অ্যান্ডারসন বলেছিলেন– 'Akshaya Kumar is Indianising European Science .' আবার রামদাস সেন-এর অধিকাংশ প্রবন্ধই পরাতত্ত্ব বিষয়ক। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের একনিষ্ঠ চর্চা লক্ষ করা যায় দীননাথ বসুর প্রবন্ধে। অর্থাৎ উনিশ শতক থেকেই বাঙালি প্রাবন্ধিকদের চিন্তাভাবনা শুধু সাহিত্য বা সমাজকেন্দ্রিক নয়, বহুমুখী।

রবীন্দ্রপর্বে এসে এই প্রবণতা আরও বিচিত্র পথগামী হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সমাজ, রাষ্ট্র, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্যতত্ত্ব, শিল্প– সমস্ত কিছু অবলম্বন করেছেন তাঁর প্রবন্ধে। এই পর্বের বহু প্রাবন্ধিক তাঁদের নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন দিককে গ্রহন করেছেন প্রবন্ধের বিষয় হিসেবে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,

জগদীশচন্দ্র বসু (বিজ্ঞান), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু (শিল্প), ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (সঙ্গীত), রোকেয়া (নারী), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (ভাষা-সংস্কৃতি), অম্লান দত্ত (মুলত অর্থনীতি), এছাড়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু, এস. ওয়াজেদ আলী, গোপল হালদার, অন্নদাশঙ্কর রায়, রেজাউল করীম, হুমায়ুন কবির, কাজী মোতাহের হোসেন, নীরেন্দ্রনাথ রায়, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী আবদুল ওদুদ, বিনয় ঘোষ প্রমুখ প্রাবন্ধিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা প্রবন্ধকে দু'ভাগে রেখে আলোচনা করতে হবে। কেননা মাঝখানের কাঁটাতার বাঙালি প্রবন্ধিকদের অবস্থানকে নতুনভাবে চিহ্নিত করে দেয়। ভারতের– মূলত পশ্চিমবঙ্গের প্রবন্ধ সাহিত্য এই পর্বে আরো বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। এর আগের পর্বে অর্থাৎ সাতচল্লিশ পূর্ববর্তীকালে যাঁরা প্রাবন্ধিক হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন এই পর্বে তাঁরা তো আছেনই, আরো বহু প্রাবন্ধিক উঠে এলো ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র থেকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে। যেমন– ঋত্বিক ঘটক, বাদল সরকার, উৎপল দত্ত, সত্যজিৎ রায় আবার আবু সৈয়দ আইয়ুব, সৈয়দ মুজতবা আলী, সমর সেন, অশোক মিত্র, সুভাষ মখোপাধ্যায, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, তেমনি আবার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অসীম রায়, শিবানারায়ণ রায়, সরোজ আচার্য, অসীন দাশগুপ্ত তেমনি আবার হীতেশরঞ্জন সান্যাল বা অর্মত্য সেন তেমনি আবার রাজেশ্বর মিত্র, নারায়ণ চৌধুরী, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় অথবা সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সমরজিৎ কর, পথিক গুহ প্রমুখ। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর পৃথিবীতে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রেই দেখা যায় একের সঙ্গে অন্যে মিলিত হয়ে তৈরি করেছে একটি নতুন বিষয়– নতুন শাখা। ফলত এই পর্বের বহু প্রবন্ধেরই শ্রেণিবিভাগ করা খুব শক্ত। সেখানে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্র এমনকি শিল্প– সব একের সঙ্গে অন্যে মিলিত হয়ে নতুন নতুন প্রবন্ধের সৃষ্টি হচ্ছে।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেশভাগের কারণে বাঙালি প্রাবন্ধিকদের একটি বড় অংশ বাংলাদেশে বসে লিখেছেন। বাহান্ন-একাত্তর পর্যন্ত সময়কালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম– নানান মতবিরোধ তাঁদের মনন-চিন্তনকে যেমন করেছে ক্ষত-বিক্ষত তেমনি জাগিয়েছে আত্মবিজ্ঞাসা। কাজী মোতাহার হোসেন, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, আবুল ফজল, কাজী দীন মুহম্মদ, মুহম্মদ আবদুল হাই, আহমদ রফিক, হাসান জামান, বদরুউদ্দীন উমর, আবুল কাসেম ফজলুল হক, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ড. নীলিমা ইব্রাহিম প্রমুখ বহু চিন্তাবিদ এই পর্বে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ১৯৪৮-৬৮ পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্যের মৌলিক চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন বিখ্যাত

প্রাবন্ধিক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তাঁর মতে এই সময়ে প্রকাশিত বইগুলি প্রকাশকের নাম বা চিহ্ন তুলে দিলেও ভাবীকালের সমাজ বিজ্ঞানীদের চিনতে অসুবিধ হবে না এগুলি কোথায় এবং কোন সময়ে লেখা। আসলে এই সময় বিষয়ের এই একমুখিনতাই স্বাভাবিক।

স্বাধীন বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশের পরপরই প্রবন্ধের মূল বিষয় হিসেবে দেখা যায় আত্মনুসন্ধানের এক অন্যমাত্রা। ১৯৭১-এ প্রকাশিত 'হে স্বদেশ' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ড. এনামুল হকের 'বাংলাদেশ: সংস্কৃতির লক্ষ্য' প্রবন্ধের কিছুটা অংশ তুলে ধরলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে–

> "হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সর্ব ধর্মালম্বী নির্বিশেষে আমরা 'বাঙলাদেশের বাঙালি'। এই বাংলাদেশের বাঙালি হিসেবে আমাদের বেঁচে থাকা হবে, মরতে হবে এবং বিশ্বের দরবারে পরিচয় দিতে হবে। সুতরাং, এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, আমাদের নতুন রাষ্টের নতুন সংস্কৃতি ও সভ্যতার একমাত্র 'বাঙালিয়ানা' ছাড়া আর কোন লক্ষ্য হতেই পারে না। আমাদের সাহিত্য, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, নৃত্য, চিত্র, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, সর্বোপরি জীবনযাপন পদ্ধতি প্রভৃতি সংস্কৃতি ও সভ্যতার সর্বক্ষেত্রে এখন থেকে এ বাঙালিয়ানা ফুটে উঠবে– এর জন্যই জাতি অধীরভাবে প্রতীক্ষিত।"

পরবর্তীকালে যে সমস্ত প্রবন্ধ রচিত হয়েছে (সময়গত দিক থেকে) অর্থাৎ যাঁরা আগে লিখেছেন এখনও লিখছেন কিংবা পরবর্তীকালে নতুন করে যে সমস্ত প্রাবন্ধিক উঠে এলেন তাঁদের রচনা তাই হয়ে ওঠে বৈচিত্র্যময়। আকবর আলি (বিজ্ঞান বিষয়ক), মোবাশ্বের আলি (শিল্প), জিয়া হায়দার, ড. কবীর চৌধুরী, সেলিম আল দীন (নাট্যবিষয়ক), ড. সন্‌জীদা খাতুন, আলতাফ হোসেন (সংগীত বিষয়ক), ড. মযহারুল ইসলাম (লোকসংস্কৃতি), ড. বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (চিত্র বিষয়ক), এছাড়া আরো বহু প্রাবন্ধিক– ড. আহমদ শরীফ, আবদুল হক, মুনীর চৌধুরী, ড. মুস্তাফা নূরুল ইসলাম, ড. রফিকুল ইসলাম, ড. আনিসুজ্জামান, আহমদ ছফা, আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রমুখ বহু প্রাবন্ধিকের রচনায় বারবার উঠে আসে বাঙালি সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় বহু দিক।

সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, সজনীকান্ত দাস, প্রথম দে'জ সংস্করণ: বৈশাখ ১৩৯৫, এপ্রিল ১৯৮৮, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০৭৩।

২। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, এক বিংশতি সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ২০১৬, ৫৯/১বি পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: বাংলাদেশ যুগ (১৯৪৭-২০২০), ড.উপল তালুকদার, বুকস ফেয়ার, প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০২১, ১২ বাংলাবাজার, সিকদার ম্যানশন, ঢাকা ১১০০।
৪। সাহিত্য তত্ত্ব-কথা (সাহিত্যের রূপ, ছন্দ, অলঙ্কার ও রসতত্ত্ব), দেবাশীষ হালদার, ড. ফাল্গুনী রানী চক্রবর্তী, মো. রবিউল ইসলাম; ১২ বাংলাবাজার, সিকদার ম্যানশন, ঢাকা ১১০০।

এনইউবি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা
(Peer-Reviewed Journal)
ISSN : 2710-4451
বাংলা বিভাগ
নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ
দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২২

পদ্মানদীর মাঝি: রূপ-অরূপ অন্বেষণ

ড. সেতু চট্টোপাধ্যায়*

সার-সংক্ষেপ : বিশ্বের উল্লেখযোগ্য সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল সমুদ্র তীরবর্তী উপকূল ও বৃহৎ নদী তীরবর্তী অঞ্চলে। নদী তার তীর সংলগ্ন জনপদের মানুষকে একটি গোষ্ঠীজীবনে আবদ্ধ করে। একই মানসিকতা, স্বভাব, চরিত্র, সংস্কৃতি গড়ে ওঠে নদীলগ্ন জনপদগোষ্ঠীর জীবনে। নদী সেখানে ধাত্রী ও জননীর রূপ ধারণ করে। বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ইছামতী*, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* এবং *কালিন্দী*, অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম*, সমরেশ বসুর *গঙ্গা*, দেবেশ রায়ের *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* উপন্যাস এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলোতে ব্যক্তিচরিত্র বা ব্যক্তিজীবন প্রধান হয়ে ওঠে না, এখানে বড় হয়ে ওঠে গোষ্ঠীজীবন ও পারিবারিক জীবনকথা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পগুলো পদ্মা তীরের সোনালি ফসল। এখানে একটি বিশেষ জনজীবনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নদীর মতোই সমান্তরাল গতিতে প্রবাহিত। যে সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসের পটভূমির বিস্তার ঘটিয়েছেন, তা হল সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজ। প্রকৃতিনির্ভর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ্যবাদের প্রকাশ যেভাবে ঘটে এই উপন্যাসে তা সেভাবে উপস্থিত হয়নি। মাঝি এবং জেলেদের কাছে নদী ভাগ্যবিধাতার নামান্তর। নদীকেন্দ্রিক জীবন-জীবিকা বলেই এদের মরণ-বাঁচন নদীর দ্বারা নির্ধারিত এবং নদীই এদের নিয়ন্ত্রা শক্তি হলেও পুঁজিবাদ, সামন্ত্রতন্ত্রকে হটিয়ে জেলেপাড়ায় তার জয়যাত্রা সুনিশ্চিত করতে চায়।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে নদী ও জীবিকার সংযোগ স্থাপন সত্ত্বেও নদীর খামখেয়ালিপনা গুরুত্ব পায়নি। পদ্মার ভয়ঙ্কর পাড় ভাঙা এখানে ঘটে না, পদ্মার ঘূর্ণিস্রোতে তেমন

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শহীদ ক্ষুদিরাম কলেজ
কামাখ্যাগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

নৌকাডুবি হয় না, ঝড় ওঠে তবে ঝড় নৌকার তেমন ক্ষতি করে না, ক্ষতি করে ঘরে থাকা মানুষের। পদ্মার সঙ্গে মাঝিদের যে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সম্পর্ক, তাতে মানুষই ব্যাঘাত সৃষ্টি করে; কিন্তু নদী কথার খেলাপ করে না। এই উপন্যাসে ময়নাদ্বীপ পদ্মাবতীর মাঝিদের একে একে সবাইকে টেনে নিয়ে যায়, যদিও পদ্মা কাউকে বাধ্য করে না। ঝড়ে স্ত্রী-পুত্র মারা গেলে আমিনুদ্দি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে ময়নাদ্বীপে যাত্রা করে। কিন্তু ঝড় তো নদীর অভিশাপ নয়, নদী থেকে বহুদূরেও ঝড়ের তাণ্ডব ঘটতে পারে। আমিনুদ্দি তো অন্যত্রও যেতে পারতো। আসলে সে অসচেতন ভাবে একটা কারণ খুঁজছিল যা দেখিয়ে প্রতিজ্ঞা ভাঙা যায়। কেন না তার মেয়েকে ফেলে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক নয়। কুবেরও ময়নাদ্বীপে যাত্রা করে তবে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য নয়, যার জন্য পদ্মাকে দায়ী করা যায়, দায়ী সেখানে মানুষের ষড়যন্ত্র। সে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ফেলে কেতুপুর ছেড়ে ময়নাদ্বীপে যাত্রা করে নতুন জীবন শুরু করার উদ্দেশ্যে। সুখের সম্ভাবনাময় আকাঙ্ক্ষার টানেই এরা ভেসে চলে অচেনা অজানার ময়নাদ্বীপে। জেলেপাড়ার মানুষরা একদিকে অভাব-অনটন ও প্রকৃতির কোপ এবং অন্যদিকে সামন্ত্রবাদ ও পুঁজিবাদের কবলে পড়ে অনিশ্চতার জীবন অতিবাহিত করে। কেতুপুরকে কেন্দ্র করেই দুই সমাজব্যবস্থার (সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদ) দ্বন্দ্ব চলে এবং নব্য পুঁজিবাদের জন্ম হয় দূরস্থান ময়নাদ্বীপে।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাস শুরু হয়েছে জীবিকা অর্জনের জন্য পদ্মার ইলিশ মাছ ধরার দিন-রাত্রি ব্যাপি দরিদ্র জেলেদের প্রাণপণ প্রয়াসের সানুপুঙ্খ বাস্তব বর্ণনা দিয়ে। কুবের মাঝি মাছ ধরছিল 'দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে'। কুবের আর গণেশ অক্লান্ত পরিশ্রম করে পদ্মা থেকে ইলিশ মাছ ধরে, অন্যদিকে জাল ও নৌকার মালিক ধনঞ্জয় বিনা পরিশ্রমে অর্ধেক আয়ের অংশীদার। সে তার মনিব সুলভ (সামন্ততান্ত্রিক) আচরণের প্রকাশ ঘটায় এই পদ্মাকে অবলম্বন করেই। জেলেদের আদিম প্রবৃত্তি তাড়িত, নেশাগ্রস্ত, অসহায়, বিড়ম্বিত অস্তিত্বের চিরবহমানতা এই পদ্মা নদীকে ঘিরে। -"দাবী আছে, প্রত্যাশা আছে, সুখ-দুঃখের ভাগাভাগি আছে, কলহ এবং পুনর্মিলনও আছে।"[১] "দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙন-ধরা তীরে মাটি ধসিতে থাকে, পদ্মার বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধশতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়।"[২] কেতুপুরের মানুষের কোনো শিক্ষা নেই, শিক্ষার্জনের এতটুকু বাসনা পর্যন্ত এদের মধ্যে জন্মানোর অবকাশ পায়নি। শিক্ষা নেই বলেই এদের কোনো নিজস্ব সংস্কৃতিও নেই। অর্থনৈতিক চাপে জেলেপাড়ার মানুষ এমনভাবেই পিষ্ট যে, সংস্কৃতির স্ফূরণ সেখানে সম্ভবই নয়। শিক্ষা তো দূরের কথা মানুষ নামক সামাজিক জীবের জীবনযাপন করছে এরা। এরা নিরুপায়

-অসহায়, বেঁচে থাকার আকুল ইচ্ছাতে এরা ছটফট করছে।–

> জেলেপাড়ার ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধা-তৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনোদিন সাঙ্গ হয় না। এদিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্রমানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে, ওদিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের আঘাত হাড়ে গিয়া বাজে। আসে রোগ, আসে শোক। টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করিয়া তাহারা হয়রান হয়। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ন। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ সঙ্কীর্ণতায় আর দেশি মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাবে না।[৩]

শিক্ষা নেই বলেই সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধিও এই জেলেপাড়ার মানুষদের নেই; সংস্কৃতি নেই বলেই, কোনো রকমে টিকে থাকার জন্য এরা ব্যাকুল। শিক্ষার অভাবের জন্যই এদের মধ্যে আছে অলৌকিক ভূত-প্রেতের বিশ্বাস। কুবের একবার হোসেন সম্পর্কে বিস্মিত হয়ে ভেবেছিল সে বুঝি বেতালসিদ্ধ অথবা উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে রাত্রে নদীর ঘাটে একাকিনী কপিলাকে দূর থেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও কুবের অত্যন্ত ভয় পায় পেত্নী ভেবে কিংবা আশ্বিনের ঝড় হলে মেয়েরা পিঁড়ি পেতে ঝড়ের দেবতাকে বসতে দেয়– এসবই তাদের মূর্খতারই জন্যে। মূর্খতার মধ্যেই বেঁচে থাকে অন্ধবিশ্বাস। আর্থিক সমস্যা, অশিক্ষা আবদ্ধ জীবনযাপন ইত্যাদি তো বটেই, এর সঙ্গে তাদের মানসিক বিকাশ ও স্বাস্থ্য বিকাশের পক্ষে অন্যতম পরিপন্থী হলো তাদের ঘিঞ্জি পরিবেশ যার মধ্যে তারা বাস করতে বাধ্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সে প্রসঙ্গ উল্লেখের ক্ষেত্রে সুনিপুনভাবে সামন্তবাদকে চিহ্নিত করেছেন–

> পূর্বদিকে গ্রামের বাইরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই। কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। ...স্থানের অভাব এ জগতে নাই। তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই এদের ওইটুকুই। সমতল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে। তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পায় না। একটি কুঁড়ের আনাচে-কানাচে তাহারই নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতে আরেকটি কুঁড়ে উঠিতে পায়। পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তারই ফলে জেলেপাড়াটি জমজমাট।[৪]

ঔপন্যাসিক কেতুপুরের জেলে-মাঝিদের জীবনের নিখুঁত বর্ণনা আমাদের সামনে হাজির করতে সম হয়েছেন। একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের মানুষের বিশেষ অর্থনৈতিক অবস্থার, বিশেষ পরিবেশের পারস্পরিক সংযোগের মধ্যে নিরর জেলে-মাঝিদের জীবনধারা, অনুভূতি-উদারতা-সহানুভূতি-ঈর্ষা-হিংসা-প্রেম-কাম ইত্যাদি ঠিক যেমনটি

হওয়া উচিত ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় কোথাও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কাহিনি যদি এর মধ্যেই সীমিত থাকত তবে উপন্যাসটিকে আমরা শুধুই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে পারতাম। ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য আঞ্চলিক উপন্যাস রচনা নয়, তাঁর উদ্দেশ্য পৃথক ও বৃহৎ এবং আরো মহৎ। বৃহৎ ভাবনার কারণেই ঔপন্যাসিক উপন্যাসের কাহিনির পটভূমির বিস্তার ঘটালেন– চরডাঙ্গা, আমিনবাড়ি, আকুরটাকুর এবং অবশেষে ময়নাদ্বীপ পর্যন্ত। তিনি দেখালেন, কেতুপুরের জেলেপাড়ার অসহায়, নিরুপায়, বিপন্ন, নিরক্ষর, নির্বোধ, দরিদ্রতম মানুষগুলো কোন শোষণযন্ত্রে কিভাবে পিষ্ট হয়ে স্বভূমি, স্বকর্ম বা পেশা পরিত্যাগ করে ময়নাদ্বীপে আসতে বাধ্য হচ্ছে; ধণতন্ত্র কিভাবে উপনিবেশবাদে পরিণত হয় এবং অজগর সাপের মতো প্যাঁচ দিয়ে কিভাবে দুর্বল অসহায় মানুষগুলোকে উপনিবেসিকতা শিকার করে ফেলে। যেখানেই ধনতন্ত্র সেখানেই ময়নাদ্বীপের বীজ নিহিত। যেখানেই ময়নাদ্বীপের সম্ভাবনা, সেখানেই শত শত কুবের, গনেশ, রাসু, আমিনুদ্দি, গোপী, মালা, কপিলাদের পরিণাম যা হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাকেই তাঁর উপন্যাসে কৌশলী শিল্পীর মতো উপস্থাপিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে পিয়ের ফাঁলো'র মন্তব্য অবশ্যই গ্রহণযোগ্য–

> লেখক দার্শনিক না হয়েও প্রকৃত দ্রষ্টা ছিলেন; তাঁর সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির গুণে তিনি ঐ সকল মাঝি-মানুষদের অন্তরতম সত্তায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যেখানে তারা আর কেবল পূর্ববঙ্গের দরিদ্র ধীবর তো নয়, বিশ্বজগতের ক্ষুধার্ত পদদলিত নরনারীর প্রতিনিধি।[৫]

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে আঞ্চলিক জীবন রূপায়িত হলেও চিরন্তন মানবজীবন প্রতিবিম্বিত হয়েছে। নানা ঘাত-প্রতিঘাত, বিশ্বাস-সংস্কারের মধ্যেও সামগ্রিক জীবনের রূপটি প্রকাশিত হয়ে সর্বজনীন মানব হৃদয়ের কামনা-বাসনা-বেদনা- প্রার্থনার সুরটি স্বতোৎসারিতভাবে বিশ্বজনীন মানবিক বৃত্তির অস্তিত্ব ঘোষণা করে। উপন্যাসে সমস্ত প্রত্যন্তস্থিত ভূমিখণ্ডে ব্যক্তিজীবন গোষ্ঠীজীবনের দ্বারা সম্পূর্ণ কবলিত। আদিম যুগোচিত বদ্ধমূল সংস্কার ও সমষ্টিগত জীবনাদর্শ ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার কণ্ঠরোধ করে নির্মমভাবে। সেখানে ব্যক্তি পরিচয় অপেক্ষা গোষ্ঠীশাসনই মানব প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয়ে বেশি শক্তিশালী, কেবল সেখানে আঞ্চলিক সাহিত্যের অস্তিত্ব স্বীকৃতি পায়। এই উপন্যাসে কুবের মাঝি দুর্বার পদ্মার মতোই আবেগাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। জন্মভূমির প্রকৃতি তাকে তার জীবন চেতনায় নিয়ন্ত্রিত করেছে। উপন্যাসে সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য লাঞ্ছিত জীবনের যে ছবি ফুটে উঠেছে তা আতিশয্যহীন ও মর্মস্পর্শী। কুবেরের দুঃসাহসিক জীবনের বর্ণনা উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ নয়, পূর্ববঙ্গের এক ধীবর পল্লীর জীবনযাত্রার অকৃত্রিম বর্ণনাও নয়; সাধারণ মানুষের আদিম অমার্জিত মানবতা, অশিক্ষিত ও

কষ্টপীড়িত মানুষের চিরন্তন হৃদয়বেদনা ও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র নিখুঁতভাবে এ উপন্যাসে রূপায়িত হয়ে বিশ্বসাহিত্যের সার্থকতা অর্জন করেছে।

ঔপন্যাসিক সমাজের নিচুতলার মানুষের জীবনের শরিক হয়ে তাদের জীবন কাহিনি শুনিয়েছেন। মেহনতি মানুষের প্রতি তাঁর গভীর দরদ, মমত্ব ও সহানুভূতিবোধ উপন্যাসের কাহিনীকে আন্তরিক জীবন্ত করে তুলেছে। হোসেন মিয়ার মধ্য দিয়ে কখনো তিনি হয়ে উঠেছেন অখ্যাত মানুষের উল্লাসহীন মনের কবি। পদ্মা নদী উপন্যাসে রোমান্টিকতার সঙ্গী না হয়ে সংগ্রামী মানুষের আধার হয়ে উঠেছে। পদ্মানদীর মাঝিকে পদ্মা নদী স্বরূপে ও প্রকৃতিতে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে বলেই হোসেন মিয়া, কপিলা ও কুবের পদ্মার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পদ্মাকে বাদ দিয়ে এই তিন চরিত্রের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। এদের সংগ্রাম প্রকৃতির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে এবং প্রতিকূল ভাগ্যের সঙ্গে। নদীর রহস্যময় অন্ধকার, আলো ও দুর্বোধ্য সংকেত জেলে জীবনে বিশেষ তাৎপর্যময়। মাঝিদের মনের অন্ধকার আর প্রকৃতির অন্ধকার উপন্যাসে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে এবং জোনাকির আলো তাদের আশার আলো। সেই আলো যেন পদ্মা নদী। উপন্যাসে পদ্মা নদী জেলেদের জীবন জীবিকার অঙ্গ হয়ে ঘটনা ও চরিত্রকে বাস্তবিক করে তুলেছে। পদ্মা যেন মাতৃস্নেহে জেলেপাড়ার মানুষদের আবদ্ধ করে রেখেছে। মাতৃস্বরূপা পদ্মার ক্রোধের প্রকাশ ঘটলেও কখনই সে তাদের ক্ষতি করেনি। তাদের অন্নের ব্যবস্থা তো এই পদ্মাই করে।

বাংলাদেশের রহস্যময়ী দুরন্ত নদীর প্রেক্ষাপটে জেলেদের জীবন ও জীবনচর্চাকে ঔপন্যাসিক রূপায়িত করেছেন। পদ্মা ও পদ্মার উপকূলবর্তী শোষিত অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষগুলো যেন একে অন্যের সঙ্গে বন্ধনে আবদ্ধ। এদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম ও প্রেমহীনতা খেয়ালি পদ্মার মেজাজ মর্জির ওপর একান্তভাবে নির্ভর করে। ঔপন্যাসিক জেলেদের এই জীবনবৃত্ত বর্ণনা করেছেন নায়ক কুবেরের জীবনকে কেন্দ্র করে। বর্ষাকালে ইলিশ মাছের কৃপায় এদের দারিদ্র্য পীড়িত জীবনে স্বল্প অর্থাগম হলেও কিঞ্চিৎ সচ্ছলতা থাকে সামন্তপ্রভুর কোপে পড়ে। বছরের বাকি সময়ে তাদের জীবন কাটে সামন্ততন্ত্রের ভিন্নরূপী হোসেন মিয়ার দয়ায়। উপন্যাসে একটি অঞ্চলের উপভাষা, মাটি আর মানুষ নিগূঢ় যোগসূত্রে ঔপন্যাসিকের অনুভূতির গভীরে পৌঁছে এক অখণ্ড জীবন ও জগতের পূর্ণাঙ্গ আবেদনকে প্রকাশ করেছে। প্রকৃতি কেবল পটভূমিকা হিসেবে অবস্থান না করে পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের রূপ নিয়ে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীকে পরিচালিত করে ভাগ্য নিয়ন্ত্রার ভূমিকা পালন করেছে বিশেষ অঞ্চলকে অতিক্রম করে এক অভিনব জীবনরস বিশ্বজনীনতায় উত্তরিত হয়েছে।

উপন্যাসের সৃষ্ট চরিত্রগুলো রূপক নয়, বাস্তব ও জীবন্ত মানুষ। কুবের, মালা, কপিলা,

হোসেন মিয়া, গণেশ, রাসু– সব চরিত্রগুলোই রক্তমাংসের মানুষ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চরিত্রগুলোকে নেপথ্যে পরিচালিত করেননি বলেই চরিত্রগুলি সাহিত্যে রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক চরিত্রই তার নিজ সত্তা বজায় রেখেছে। তবে দোলাচল বৃত্তি নায়ক চরিত্রটিকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলেছে। সংগ্রামী মানুষের প্রতিনিধি কুবেরকে উপন্যাসভূমির নায়ক হিসেবে বিবেচনা করলে তার জীবন পর্যায়ে দুই রীতি অনুসৃত হয়েছে। সেক্সপিয়রীয় ট্রাজেডির নায়ক থেকে গ্রিক ট্রাজেডির নায়ক হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের নাটকীয়তা অতিবাহিত। হোসেন মিয়ার আকাঙ্ক্ষিত এই কুবের অবশেষে এক অমোঘ নিয়তির তাড়নায় হোসেনের জালে ধরা দিয়েছে। কামনাতাড়িত দৃষ্টিতে পর্যবেণ করলে তাকে ট্রাজেডির নায়ক বলা চলে না। যে কপিলার প্রতি তার আসক্তি ছিল তা উপন্যাসের শেষ লগ্নে বাস্তবায়িত হওয়ার মধ্য দিয়েই তা প্রতিভাত হয়েছে–

> কুবের বলে, হোসেন মিয়া দ্বীপে আমারে নিবই কপিলা। একবার জেল খাইটা পার পামু না। ফিরা আবার জেল খাটাইব।
> কপিলা আর কথা বলে না।
> ঘাটের খানিক তফাতে হোসেনের প্রকাণ্ড নৌকাটি নোঙর করা ছিল। একজন মাঝি ঘুমাইয়া ছিল নৌকায়। তাহাকে ডাকিয়া তুলিলে সে নৌকা তীরে ভিড়াইল। কুবের নীরবে নৌকায় উঠিয়া গেল। সঙ্গে গেল কপিলা। ছই-এর মধ্যে গিয়া সে বসিল। কুবেরকে ডাকিয়া বলিল, আমারে নিবা মাঝি লগে?
> হ, কপিলা চলুক সঙ্গে।[৬]

কুবের আদিম জৈবিক জীবনধারার দারিদ্র্য-ক্ষুধা-বঞ্চনা-অসহায়তার মধ্যে আবদ্ধ সমাজের মানুষ। কুবেরের জীবনদ্বন্দ্ব ব্যক্তির জৈব কামনার। বিদ্রোহী সত্তা তার মধ্যে থাকলেও সে সংগ্রামী হয়ে উঠতে পারেনি, এমনকি সমাজকে বদলানোর কোনো চেষ্টাও তার মধ্যে নেই বরং সমাজকে মেনে নিয়েই গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসিয়েছে। নৌকার হাল চালানোর ক্ষমতা থাকলেও সে সমাজের হাল ধরতে পারেনি। তাই ভাগ্যকে মেনে নিয়ে কুবের নিরুদ্দেশের পথে ময়নাদ্বীপে যাত্রা করে। অদৃষ্টবাদী কুবেরের কাছে হোসেন মিয়াই দেবতা। বাধ্য হয়েই কুবের পরনির্ভরশীলতার জীবন পরিত্যাগ করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য স্বাবলম্বী কৃষক জীবনকে বেছে নিয়েছে আর সঙ্গে নিয়েছে তার ভালোবাসার মানুষকে। অস্তিত্বহীনতার লড়াই-এ সে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। অশিক্ষিত, অমার্জিত, মানবিক বোধসম্পন্ন, অসাম্প্রদায়িক, প্রেম-ভালোবাসা, ঈর্ষা, অভিমান পূর্ণ চরিত্র এই জেলেপাড়ার বাসিন্দা কুবের।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসটি একটি ঋতুচক্রের আগেই সমাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ উপন্যাসটি শুরু হয়েছে 'বর্ষার মাঝামাঝি' বা আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে এবং

উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে। আমরা দেখতে পেলাম এক বছর সময়কালের পূর্বেই উপন্যাসটির সমাপ্তি। এই ন'মাস কালসীমার মধ্যেই তিনি উপন্যাসের সমস্ত আবর্তন-বিবর্তন দেখিয়েছেন; যা আমাদের কাছে একটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছে এবং এই স্বল্পকালীন সময়ের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনার কথা উপন্যাসে উল্লিখিত তাতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আশ্বিনের ঝড়। এই উপন্যাসে আশ্বিনের প্রবল ঝড়ের নিদারুণ ধ্বংসলীলার বিশদ, সজীব, মর্মস্পর্শী বর্ণনা আছে। বাতাসের প্রবল বেগে বড় বড় গাছ সশব্দে ভেঙে গেল। জেলেপাড়ার অর্ধেক কুটিরের চালা খসে গেল, বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগলো। ইলিশের এই মরসুমে জেলেপাড়ার সব ঘরের পুরুষেরা নৌকা নিয়ে পদ্মায় মাছ ধরতে গেছে। তাদের ফিরে আসার নিশ্চয়তা নেই। এদের জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় ভীত, কম্পমান জেলেপাড়ার নর-নারী পদ্মাতীরে জিজ্ঞাসাপূর্ণ চোখে তাকিয়ে আছে অসীম জলরাশির দিকে। কুবের মাঝিকে শ্রেণিচরিত্রে আমরা চিনে নিতে পারি শুধু পদ্মার বুকে জীবিকার্জনের মরিয়া তাগিদে নয়, পদ্মার প্রতি তার স্বার্থবিরহিত তীব্র আসক্তিতে; এমনকি ঈর্ষায়-ক্রোধে ভালোবাসায় তিক্ত মধুর দাম্পত্য আচরণেও। নদীকে বড় ভালবাসে, তার কাছে নদীর বুকে ভেসে চলার মতো সুখ আর কিছুতে নেই। আকাশ তটভূমি আর নদীবরে রম্য দৃশ্যাবলী তার কাছে গৌণ হয়ে যায়, মনে হয় নদী ছাড়া সবই বাহুল্য।–

> আকাশের রঙিন মেঘ ও ভাসমান পাখী, ভাঙন ধরা তীরে সুভ্র কাশ ও শ্যামল তনু, নদীর বুকে জীবনের সঞ্চালন, এসব কিছুই যদি না থাকে, শুধু এক বিশাল একাভিমুখী জলস্রোতকে পদ্মার মাঝি ভালবাসিবে সারাজীবন। মানবী প্রিয়ার যৌবন চলিয়া যায়, পদ্মা তো চিরযৌবনা। বৈচিত্র্য কী তার প্রয়োজন? নতুন পৃথিবী কে খোঁজে, কে চায় পদ্মার রূপের পরিবর্তন, শুধু ভাসিয়া চলার অতিরিক্ত মোহ।[৭]

পদ্মানদীর প্রভাব পদ্মা তীরবর্তী মানুষের মতো কুবেরের মধ্যেও সঞ্চালিত। সে কখনো মালার সঙ্গে প্রেমহীন কঠোর ভাষায় কথা বলে আবার কখনো বা প্রেম বিগলিত চিত্তে কথা বলে মালার হৃদয়কে সিক্ত করে–

> আজ রাতেই হয়তো কুবের মালাকে বুকে জড়াইয়া মিঠা মিঠা কথা বলিবে, পদ্মার ঠান্ডা বাতাসে জুড়াইয়া জুড়াইয়া কি যে মধুর হইয়া উঠিবে কুবেরের ব্যবহার। কাল হয়তো আবার কাঁদাইবে মালাকে মেজবাবুর কথা তুলিয়া। এমনি প্রকৃতি পদ্মানদীর মাঝির, ভদ্রলোকের মতো একটানা সংকীর্ণতা নয়, বিরাট বিস্তারিত সংমিশ্রণ।[৮]

কুবের তার তবিত এবং বিধ্বস্ত জীবনে মুক্তির আনন্দ পেয়েছে পদ্মার কাছে। পদ্মা যেন তার জীবন ঢেকে ফেলেছে, সে জন্যই সে কপিলার মধ্যেও পদ্মার রূপ দেখে। তাই তো কুবেরের প্রেম দুটি ধারায় প্রবাহিত; স্বকীয়া ও পরকীয়া। স্ত্রী মালার সঙ্গে তার প্রেম

স্বকীয়া সম্পর্ক এবং তা নিরুত্তাপ আবেগের। কেবল রাতে গভীর সান্নিধ্য এবং সম্ভোগের সময় সেই সম্পর্কে সংরাগের তীব্রতা লাগে; পদ্মার হাওয়ায় কুবের যেন অন্য মানুষ হয়ে ওঠে তখন। কিন্তু দিনের আলোয় বা অন্য সময়ে গৃহিণী হিসেবে, কখনো কন্যা গোপীর বিবাহের ব্যাপারে আলোচনা করে। অলস মুহূর্তে আড়াল থেকে দেখে কখনো কখনো মালাকে তার সুন্দরী মনে হয়। কখনো মালার পঙ্গুত্বের জন্য তার মমতা, কখনো আবার মেজবাবুর কথা তুলে মালাকে সে পীড়ন করে, কাদায়, কখনো রাগের মাথায় জ্বলন্ত অঙ্গারসহ কলকে ছুড়ে মারে আবার তার বিপন্নতায় তাকে রক্ষা করে, লজ্জা নিবারণও সে-ই করে। মালার সঙ্গে এই তার বাস্তব সম্পর্ক, যা কোনো তত্ত্বের নিয়মে একে মাপা যাবে না। তথাপি সামন্তযুগের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রভাব এদের জানতে বা অজান্তে এদের রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। সেইজন্য মালাকে ধমক দিয়ে একবার কুবের বলে, "মাইয়া লোক চুপ মাইরা থাক। পোলা বিয়ানের লাইগা পিরথিমিতে আইছস, বিয়া পোলা যত পারস– রাও করস কেন রে?"[৯] নারী সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র– এই দৃষ্টিভঙ্গি সামন্ত তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি।

কুবেরের মতন অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাব বিস্তার করেছে অজ্ঞাতসারেই কথাটির সম্পূর্ণ অর্থ না বুঝেই। রাগ-অনুরাগ-প্রহার- সম্ভোগ ইত্যাদি মিলিয়ে কুবেরের সঙ্গে মালার দাম্পত্য সম্পর্ক যথেষ্টই সুস্থ। কিন্তু এরই মধ্যে শ্যালিকা কপিলার প্রতি কুবের আকৃষ্ট হয়। কপিলার সঙ্গে কুবেরের এই সম্পর্কই প্রেমের সম্পর্ক। পঙ্গু স্ত্রী মালার প্রতি স্বামী কুবেরের গভীর মমতা। তারই আশ্রয়ে মালার জীবন আবেগে উথলে ওঠে। তাদের এক কন্যা গোপী, তিন পুত্র লখা, চণ্ডী এবং নবজাত পুত্র। সন্তানদের প্রতি তার স্নেহের উচ্ছাসময় বহিঃপ্রকাশ দেখা না গেলেও অনুচ্চারিতভাবেই তার বুকের মধ্য দিয়ে অপত্য স্নেহের স্রোতপ্রবাহ পরিলক্ষিত। ছেলেদের দস্যিপনা নির্বিবাদে সহ্য করে আবার কোথাও গেলে ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে যায়, হাঁটতে হাঁটতে পথে ক্লান্ত হয়ে পড়লে চণ্ডীকে সে কোলে তুলে নেয়। গোপীর পা ভেঙে গেলে তাকে সারিয়ে তোলার জন্য তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সব কাজ ফেলে সে আমিনবাড়ির হাসপাতালে যায়, মেয়ের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে। এমনকি কন্যার বিবাহের ব্যাপারেও দায়িত্ব পালন করার উদ্যোগ নেয় এবং ভালো পাত্রের ব্যবস্থা করে। যুগলের সঙ্গে গোপীর বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করলেও শেষ পর্যন্ত হোসেন মিয়ার মনোনীত বঙ্কুর সঙ্গে বিবাহ স্থির হয়। বিবাহের পর গোপীকে ময়নাদ্বীপে চলে যেতে হবে জেনে বুকের ভেতরটা তার ছটফট করে। এই উপন্যাসে আর কোনো পুরুষ চরিত্রের মধ্যে এইরকম পিতৃত্বের চিরন্তন মূর্তি আমরা লক্ষ করি না। পঙ্গু মালাকে ঘরণী হিসেবে পেয়ে কুবের এক অভ্যস্ত জীবনের স্বাদ পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু সে নিজেও জানতো না যে তার কিছু

বাসনা অবদমিত হয়ে আছে মনের মধ্যে। কপিলার আগমন তার উচ্ছলতা, চঞ্চলতা এবং সেবা-যত্ন-পরিচর্যার মধ্য দিয়ে কুবেরের সুপ্ত বাসনাগুলোকে জাগিয়ে তুলে কুবেরকে আকৃষ্ট করে কপিলা। কুবের নারীর এক নতুন রূপের সন্ধান পায় কপিলার মধ্যে। তার মধ্যে ঘটে গেল এক অদ্ভুত জাগরণ, যে জাগরণ মালা পঙ্গুত্বের কারণে ঘটাতে পারেনি। কিন্তু কপিলা বিবাহিতা, প্রথমে স্বামী পরিত্যক্তা হলেও পরে স্বামী তাকে ঘরে নিয়ে গেলে কুবেরের মনের অন্তরালে একান্ত নীরবে এক অস্পষ্ট আশা-নিরাশার দোলা চলে।

কপিলা যখন দূরে তখন কুবের তার অবদমিত কামনার শিকার হয়েছে কখনো কখনো, মনের মধ্যে জন্ম নিয়েছে উদ্ভট উষ্ণ ভাবালুতা। কিন্তু এতকিছুর মধ্যেও কুবের তার যাবতীয় কর্তব্যকর্ম যথাযথভাবে পালন করে গেছে তার মনের যাবতীয় ভাবনাধারাকে করে রেখেছে একান্ত গোপন। আর্থিক অনটন, সংসারের দায়-দায়িত্ব, কর্তব্যকর্ম, লৌকিকতা, কর্ম পরিবর্তন, নতুন কর্মের আশা-আকাঙ্ক্ষা-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-গ্লানি এসব মিলিয়ে কুবের চরিত্রটিই বিস্তৃত, পূর্ণায়ত এবং জীবন্তরূপে প্রতিভাত হয়েছে উপন্যাসে। উপন্যাসের অন্যান্য পাত্র-পাত্রী তাদের আচার-আচরণ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমস্যা-সংকীর্ণতা, পরিবেশ-পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা উৎসব সমস্ত কিছুই একত্রিত হয়ে ঐ কুবেরকেই দান করেছে এক জীবন্ত পটভূমি, যা ব্যতিরেকে তার চরিত্র আমাদের কাছে এত জীবন্ত হয়ে উঠতে পারত না। এই উপন্যাসে কুবের আশ্রয়। তাকে কেন্দ্র করেই ঔপন্যাসিক তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করেছেন। দরিদ্র কিভাবে আরো নিঃস্ব হয় ও ধনী কিভাবে আরো ধনী হয় এবং ধনী গরীবের বন্ধু সেজে গরিবের দুয়ারে আসে আর তার সরলতা দারিদ্র্য অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাকে নানাভাবে প্যাঁচে ফেলে তার সর্বনাশ করতে আগ্রাসী মনোভাব প্রকাশ করে; ঠিক সেই রকমই হোসেন মিয়া কুবেরের ঘর 'ছাইবার' শন দিয়ে সাহায্য করেছে। আশ্বিনের ঝড়ে তার ঘরবাড়ি ভেঙে গেলে উপযাজক হয়ে তাকে ঋণ দিয়ে তাকে কিছু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়ে তার মাথা কিনে নিয়েছে হোসেন। এরই ফলে সে কুবেরের ঘরে কুবেরের বিনা অনুমতিতে চোরাই মাল রাখার সুযোগ নিয়েছে, কুবেরের মনোনীত পাত্রকে বাতিল করে কুবেরের মেয়ের সঙ্গে নিজের মনোনীত পাত্রের বিবাহ দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে ময়নাদ্বীপে। রাসু যখন উত্তেজিত হয়েছে কুবেরের বিরুদ্ধে তখন তারই সাহায্যে কুবেরকে পুলিশের চোখে চোর সাব্যস্ত করে তাকে আরো বিপদে ফেলে এবং এই বিপন্নতার সুযোগে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে ময়নাদ্বীপ। এই ময়নাদ্বীপে পাঠানোর দুর্নিবার লক্ষ্যেই কুবেরকে হোসেন প্রথম থেকেই সাহায্য করে আসছিল এবং তাকে সম্পূর্ণ গিলে খাবার উদ্দেশ্যে। একটি করে সাহায্য করেছে আর বিষাক্ত অজগরের মতো একটু করে পাকিয়ে নিয়েছে কুবেরকে।

অবশেষে কুবেরকে সে ময়নাদ্বীপে এবং অন্তিমে সে গ্রাস করেছে। হোসেনের কাছে কুবের তখন সম্পূর্ণত ঋণী, এত উপকারে বাধিত যে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করার মত শক্তি তার ছিল না। তাই হতাশাগ্রস্ত কুবের বলেছিল– "হোসেন মিয়া দ্বীপে আমারে নিবই কপিলা।"[১০] শোষণের এই যে রীতি, শোষণের মুখে হারিয়ে যাওয়ার এই যে চিত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসে দেখিছেন তার প্রধান অবলম্বন এই কুবেরই। কুবের যেমন একটি ব্যক্তি চরিত্র, তেমনি আবার সে কেতুপুরের জেলে-মাঝিদের প্রতিনিধিও; একদিকে সে ব্যক্তি চরিত্র অন্যদিকে শ্রেণিচরিত্র। হোসেন মিয়াকে চিনতে পারার মধ্য দিয়ে কুবেরের সত্য উপলব্ধির ক্ষমতা আমরা লক্ষ করি। দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও উপন্যাসের মধ্যে যেটুকু রোমান্সের স্বাদ মিলেছে তা কুবেরের হাত ধরেই। এই চরিত্রকে বিশ্লেষণের জন্য অবশ্যই আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট জানার প্রয়োজন। যে সমাজ ভূমিতে কুবের জন্ম নিয়েছে সেখানে শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, আনন্দ নেই, ঈশ্বর বিশ্বাস নেই আছে শুধু জীবন যন্ত্রণা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ। এই সমাজ প্রেক্ষাপটে রেখে দেখলে আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করবো কুবেরের মধ্যে অনেক আদর্শগুণ রয়েছে। এই সমাজ-অর্থনীতিতে কি কুবেরের চেয়েও সুস্থ চেতনাসম্পন্ন মানুষ জন্ম নেওয়া সম্ভব? কখনোই নয়; কুবেরই এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সুস্থ, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, বিবেকবান ব্যক্তি; যদি তাকে আরো আদর্শায়িত করতে যেতেন ঔপন্যাসিক তাহলে তা অবাস্তব হত। তার ট্রাজেডিতে আমাদের বুকের ভেতর কেঁপে ওঠে, আর তারই অশ্রুসজল দুঃখের কাহিনির প্রেক্ষাপটে আমরা বুঝতে পারি জেলে-মাঝিদের জীবনের কঠিন কঠোর বাস্তবতাকে। যেহেতু কুবেরের জীবনের প্রেক্ষাপটেই আমরা সবটাই দেখি তাই উপন্যাসের মূল কথাবস্তুর প্রধান আশ্রয় সে। সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রবল প্রভাব ও টানকে স্বীকার করে তারই মধ্যে নায়কোচিত আদর্শ মানবিক গুণাবলী পরিলক্ষিত বলেই তাকেই উপন্যাসের অবিসংবাদিত নায়ক হিসেবে আমরা স্বীকার করি। উপন্যাসের নায়ক হোসেন মিয়া বা অন্য কেউ নয় তার সর্বময় কর্তা কুবের। কুবেরের অপমৃত্যু ঘটেছে। পুঁজিবাদী শোষণের চাপে এবং চক্রান্তে মানুষ কীভাবে জীবন-মৃত হয়ে পড়ে আর কীভাবেই বা সেই নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হয়। কেতুপুরবাসী পদ্মানদীর মাঝি কুবেরের জীবনকে আশ্রয় করে সেই চিত্র এঁকেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেতুপুর যতদিন আমাদের মনে বেঁচে থাকবে ততদিনই কুবেরও থাকবে সেখানেই ।

ঔপন্যাসিক মালা-কপিলা-গণেশকে ভালোবেসে ছিলেন বলে তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা ও পরম আত্মীয়তায় তাদের রূঢ় অসভ্যতা, নৈতিক দুর্বলতা, দোষ-গুণকে *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে জীবন্ত করে তুলেছেন। সমগ্র উপন্যাসে কুবের প্রাধান্য লাভ

করেছে বলেই তার স্ত্রী মালা চরিত্র নায়িকা প্রসঙ্গে উত্থাপিত। যদিও তার পরিপন্থী চরিত্র হিসেবে কুবেরের শ্যালিকা কপিলা হাজির হয়েছে। কিন্তু ঘটনার বিশ্লেষণে মালা চরিত্রটিকে নায়িকা বলে মনে হয়। কেতুপুরের জেলেপাড়ার অন্য নারী চরিত্রের তুলনায় সে স্বতন্ত্র। স্নেহময়ী মালা পঙ্গু, অলস হলেও শান্ত ও নিরীহ। তাই তাকে জেলেপাড়ার রূঢ় কঠোর বাস্তবতা অনেকটাই রেহাই দিয়েছে। গতিবিধির নির্দিষ্ট সীমাগণ্ডি আছে বলেই সংসারই তার জগত। দারিদ্র্যের কষ্টকর পরিস্থিতি তাকে গ্রাস করতে পারে না বলেই কুবেরকে সে সুখী রাখতে পারে। দক্ষ কথকের মতো সন্তানদের রূপকথা শুনিয়ে সংসারের চিত্রই বদলে দেয় স্নেহপরায়ণা মালা। সন্তানদের গল্প বলে ভাত খাওয়ানোর রীতি জেলেপাড়ার মাঝিদের ঘরের ব্যতিক্রমী ও দুর্লভ চিত্র; যেখানে মালা একজন পুরোদস্তুর ভদ্র মহিলা।অভিভাবক, মাতা, পত্নী, পরামর্শদাত্রী– সব ভূমিকাতেই সে অতুলনীয়া। কুবেরের চোখে সে রাজরাণি। বাড়ির বাইরের জীবন ও জগতের সঙ্গে মালার সম্পর্ক ছিল নিতান্তই কম, তাই তার জীবন অন্তরের পথ দিয়ে বিকশিত হয়েছিল। মমতাময়ী হলেও পঙ্গুত্ব তার অনেক কিছুতেই বাধা সৃষ্টি করে। চরডাঙ্গার বন্যার কথা শুনে তার প্রাণ ডুকরে কেঁদে ওঠে, জানতে চায় বাপের বাড়ীর খবরা-খবর, অভিযোগের তীর ছুড়ে দেয় স্বামী কুবেরের দিকে। - "আই গো তোমার পাষাণ প্রাণ। আমার বাপ-ভাই ডুইবা মরে, একবার নি খবর নিলা।"[১১] পঙ্গু জীবনই তাকে ক্ষুব্ধ, বিষণ্ন করে তুলেছে। অতিথিপরায়ণা মালা ভাই-বোনদের আতিথ্য যেমন সমাদরে করেছে তেমনি ক্ষুধার্ত হোসেন মিয়াকে দেখে বিচলিত হয়েছে। নিজের অক্ষমতার কথা ভেবেই সে গোপীর পা সারিয়ে তোলার জন্য আগ্রহী। মাতৃত্বের সংস্কার মালাকে নাড়া দিয়েছিল বলেই সে গোপীর বিবাহ দিতে চায় এবং মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরন্তর মায়ের ভাবনাই তার মধ্যে কাজ করেছে। নিজের খোঁড়া পা ভালো হবার আশায় আশান্বিত মালাকে কুবের সাড়া না দিলে সে অবরুদ্ধ সঞ্চিত ক্ষোভে কুবেরকে কপিলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কটাক্ষ করতেও ছাড়ে না। নারীত্বের অবমাননা মালা কিছুতেই সহ্য করতে পারেনি। তাই কপিলার আগমন সে মেনে নেয় না। সেবায়, মমতায়, ধৈর্যে, মায় মালা একদিকে যেমন প্রকৃত জননী অন্যদিকে সে প্রকৃত নারী হয়েও অন্তর্মুখী। নারী ধর্মের সমস্ত গুণের বন্ধনে মালা স্বামী-সংসারকে বেঁধে রাখতে চাইলেও শেষ রক্ষা হয়নি; কুরের অন্তর্মুখিনতার জাল ছিঁড়ে নৌকা ভাসিয়েছে বহির্মুখীর টানে। উপন্যাসের শেষে শোষণ ও পুঁজিবাদের ষড়যন্ত্রের মুখে সে বাস্তুহারার স্ত্রী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। উপন্যাসিক মালা চরিত্রকে বাস্তব ও জীবন্ত নারী হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন; চরিত্রটিকে 'গড়ে তোলা' চরিত্র না বলে 'হয়ে ওঠা' চরিত্র বলাই যুক্তিসঙ্গত।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে যেটুকু চারিত্রিক সংঘাত অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে তা কপিলা

চরিত্রের জন্য। চরিত্রটি উপন্যাসের স্রোত প্রবাহের খাত বদলে দিয়েছে। উপন্যাসে নায়িকা না হয়েও মুখ্য নারী চরিত্র হিসেবেই তার উপস্থিতি। ব্যক্তি পরিচয়ে সে শ্যামাদাসের বিবাহিত পত্নী, মালার বোন এবং কুবেরের শ্যালিকা। উপন্যাসে কপিলার দুঃখ কথাকে ঔপন্যাসিক একঝলক বলেই থেমে গেছেন। মনস্তাত্ত্বিক ভাবনায় হয়তো পূর্বকথাই বৃহৎ, বহির্মুখী কপিলার জন্ম দিয়েছে– "কপিলার বিবাহ হইয়াছে, একটি মেয়ে হইয়া আঁতুড়ে মরিয়া গিয়াছে বছর দুই আগে।"[১২] পুরুষতান্ত্রিক সমাজের জন্যই কপিলা দুখিনী। যে সমাজ তাকে তার যোগ্য সম্মান দেয়নি; সেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি কুবেরকে সে আজ শাসন করতে চায় ভালোবাসার জালে আবদ্ধ করে। কুবেরের মধ্যে কপিলা দেখেছিল পৌরুষ কঠিন দেহ, বলিষ্ঠতা ও সজীবতা। কুবেরের মধ্যে সে তার মনের মানুষের সন্ধান পেয়েছিল। *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসটি আমাদের জন্য বয়ে আনে আপাতকালীন সময়ের বার্তা। এ উপন্যাসে প্রকৃত সময়ের তাৎপর্য নানাভাবে নির্ণিত হচ্ছে ব্যক্তি পাঠকের ভাবনার ভিন্নতায়। উপন্যাস যতই এগিয়ে চলে কপিলা চরিত্রটিও ততই প্রস্ফুটিত হয়। পরকীয়া কপিলা চঞ্চলা, গতিময়ী, সেবাপরায়ণতা, হাস্যপরিহাস মুখর, উচ্ছ্বাসময়ী, সহনশীলা, যুক্তিবাদী, অভিমানী, ভালোবাসার কাঙালি, স্নেহপরায়ণা, আত্মবিশ্বাসী, প্রাণোচ্ছল, বুদ্ধিমতী হয়েও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের খামখেয়ালীপনার শিকার হয়েছে। কপিলাকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর তার স্বামী শ্যামাদাসের বিবাহিত দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে শুধুমাত্র প্রয়োজন মেটাতে স্বামী নিতে এলে সে শ্বশুরবাড়ী ফিরে গেছে। লেখক এখানে খুবই সন্তর্পনে দেখিয়েছেন নারী যেন শুধু সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রভূমি। পরিত্যক্তা হয়েও চরিত্রটি আত্মমর্যাদায় উন্নীত হয়নি।–

> সে বড় দুঃখের কাহিনী। সুখে ঘরকন্না করিতেছিল কপিলা, কী যে শনি ভর করিল তাহার কপালে, শীতের গোড়ায় স্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া সে চলিয়া আসিল বাপের বাড়ী। রাগ করিয়া তাহার স্বামী শ্যামাদাস আবার বিবাহ করিয়াছে, কপিলাকে নেয় না।
> এ খবর কুবের জানিত না। সে বিস্ময়ে বলিল, হ।
> তারপর কপিলাকে স্বামীর কাছে পাঠানো হইয়াছিল- ফাগুন মাসে।
> শ্যামাদাস তাহাকে বাড়ীতে উঠিতে দেয় নাই, খেদাইয়া দিয়েছে।[১৩]

রহস্যময়ী কপিলার মোহজাল বিস্তারের জন্য তাকে বহির্মুখী বলা যায়। তার যৌবনদীপ্ত অচরিতার্থ জীবন পিপাশা কুবেরের চারিদিকে যেন মোহজাল বিস্তার করে তার আদিম জৈবিক প্রবৃত্তিকে উদ্দাম করে কুবেরের মনের অতলে সে এক জৈবিক আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু অপরদিকে কপিলার প্রতি কুবেরের যে তীব্র আকর্ষণ তা' কুবেরের সামাজিক মন স্বীকার করতে চায়নি। সে শুধু কপিলার হাসি, সেবা ও রসিকতাটুকুই

ভোগ করতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘর ছাড়ার সঙ্গী করেছে সেই কপিলাকেই। যে কপিলা চিরকাল অধরা ছিল সেও অবশেষে কুবেরের কাছে পরাজিত হল। কপিলা যেন *চোখেরবালি*'র বিনোদিনীর এক রূপ। ঘরছাড়া কপিলার নতুন ঘর বাঁধার স্বপ্ন বা ইচ্ছা কিনা এটা ঔপন্যাসিক স্পষ্ট করেননি। তার মনের ইচ্ছা বোঝা বড় দায়। -"কপিলার মন বুঝিবার ক্ষমতা ভগবান কুবেরকে দেন নাই।"[১৪] লীলাময়ী, রহস্যময়ী কপিলার অভিসারিকায় উত্তরণ ঘটেছে।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে মানুষের সংযোগকারী চরিত্র হিসেবে হোসেন মিয়ার আবির্ভাব। জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার আকাঙ্খা তার চিরকালের। তাই নিজের জীবিকা যেমন বদলাতে সক্ষম হয়েছে তেমনি দরিদ্র মানুষের জীবিকা পরিবর্তন করতেও সচেষ্ট হয়েছে, তবে সেখানে নিজের দূর ভবিষ্যতের স্বার্থে কাজ করেছে। সৃষ্টির সুপ্ত বাসনা যেন তাকে শ্রেণিধর্ম নিরপেক্ষ মানবে পরিণত করেছে। দিশাহীন মানুষের প্রাণ সঞ্চার ঘটায়, হৃদয়ে দোলা তোলে হোসেন মিয়া। সে প্রশস্ত করে তার অর্থের হাত, বন্ধুত্ব করে নিঃস্ব রিক্ত কেতুপুরের জেলেপাড়ার মানুষগুলোর সঙ্গে; সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় দীন দরিদ্রের দিকে। বিপদে-আপদে সে কেতুপুরের জেলেপাড়ায় দেবতার মতো আবির্ভূত হয়। ঔপন্যাসিক হোসেন মিয়ার পূর্ব জীবনকথা নেপথ্যে একঝলক বলেছেন। দক্ষ প্রশাসকের মতোই সে তার চারপাশের মানুষদের পরিচালনা করে। আশ্বিনের ঝড়ে জেলেপাড়ার ঘরগুলি ভেঙে পড়লে হোসেনই দাঁড়িয়ে থেকে নির্দেশ দেয় ঘর সারাবার কাজে। -"ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া বেড়াইল, তাহার পর দাড়ি নাড়িয়া বলিল, না, টাকা কর্জ দিমু না, ছণ দিমু, বাঁশ দিমু, নিজে খাড়াইয়া তোমাগো ঘর তুইল্যা দিমু,"[১৫] –হোসেন মিয়া অত্যন্ত কর্মদক্ষ, নির্ভীক, চতুর, পরিশ্রমী, কুটিল, রাজনীতিক ও নির্মম। যে তার ক্ষতি করে তাকে সে কঠিন শাস্তি দেয় কিন্তু তাকে কোনোদিনই কেউ রাগ করতে দেখেনি, সদাই হাস্যমুখর তার চেহারা। তুলনাহীন রহস্যময় এই চরিত্র। সুন্দরবনের অভ্যন্তরীণ পরিচয়ের মতোই তার জটিল মনের খোঁজ মেলা কঠিন। সে কেতুপুরের দরিদ্র মাঝিদের কাছে রহস্যময়, দুর্জ্ঞেয়, দৈবশক্তির প্রতীক রূপে প্রতিভাত হয়েছে। গরিব মানুষকে হাতিয়ার করে চতুরতার মাধ্যমে সে তার ব্যবসায় সাম্রাজ্য চালনা করে। তাই মানবদরদি হোসেন জেলেপাড়ার পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে রাখে প্রতিনিয়ত। তার এই মেলামেশা তাকে অনেকটা সাহায্য করেছে শ্রমজীবী থেকে সামন্ত প্রভুতে উত্তীর্ণ হতে। সে সর্বধর্মের সমন্বয় ঘটিয়েছে তার নব্য জীবনভূমি ময়নাদ্বীপে। এ তার আধুনিক জীবন ভাবনার এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় সে তার চরিত্রের নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়েছে; ছলে-বলে-কৌশলে অর্থ উপার্জনই তার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।

তাই হোসেন ধর্মকে নয়, কর্মকেই প্রাধান্য দিয়েছে। সে নিজে নিজের ভবিষ্যৎ রচনায় বিশ্বাসী। নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণ তার কাছে আত্মহত্যার সামিল। শক্তিমান প্রতিপত্তিশালী এই হোসেন চরিত্রের এক বিরোধী ভাবাবেগপ্লুত কবি-প্রাণ উপন্যাসে পরিলতি। লাজুক হোসেনের গানটি সমগ্র জীবনের সারার্থ।–

"আঁধার রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইরা থোও
বোনধু কত ঘুমাইবা।"[১৬]

ঔপন্যাসিকের শিল্প সৃষ্টি ও চরিত্র সৃষ্টির কৌশলে হোসেন মিয়া চরিত্রটি *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসের স্বত্বাধিকারীতে পরিণত হয়েছে।

উপন্যাসে পদ্মা নদী রোমান্টিকতার সঙ্গী হয়নি। পদ্মার পটে জীবনকে দেখানো হয়েছে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে। ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ম অন্তরসৃষ্টির বলে জেলেপাড়ার মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন; ফলে চরিত্রগুলো তাদের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য অতিক্রম করে সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিক জেলে-মাঝিদের জীবন ও প্রকৃতিকে নিয়ে কবির খেয়ালিপনায় ভেসে যায়নি; সহজ বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের আশ্রয়ে তাদের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। চরিত্রগুলো ভাবমন্ডিত না হয়ে অন্তরঙ্গ বলিষ্ঠতা ও পরমাত্মীয়তার গুণে চরিত্রের অসভ্যতা ও নৈতিক দুর্বলতা দর্শনে তিনি অবজ্ঞা করেন নি। এ উপন্যাসের সমস্যা মূলত: অর্থনৈতিক দারিদ্র্য এবং অশিক্ষা যা, মানুষকে পাশব জীবনের নিকটবর্তী করেছে এবং সেই চিত্রটি উপন্যাসে বড় হয়ে উঠেছে। অবৈধ যৌন আকর্ষণ উপন্যাসটির পরিণতি দান করেছে। চরিত্রগুলির মধ্যে মধ্যবিত্ত জীবন সুলভ রোমান্টিক বিকার নেই। নদী এখানে জীবন-জীবিকার অঙ্গ হিসেবে উপস্থাপিত হয়ে ঘটনা ও চরিত্রকে বাস্তবিক করে তুলেছে। আঞ্চলিকতা প্রসঙ্গ অতিক্রম করে *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসটি জনজীবন কাহিনি হিসেবেই খ্যাতি লাভ করেছে।

সহায়ক গ্রন্থ

১. 'পদ্মানদীর মাঝি'- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বৈশাখ- ১৩৯৭, কলকাতা।
২. 'বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা'- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৬, কলকাতা।
৩. 'মানিক বিচিত্রা'- বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত- প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৬- সাহিত্যম-১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,কলিকাতা ১২।

পাদটিকা -

১ থেকে ৪- 'পদ্মানদীর মাঝি' - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বৈশাখ- ১৩৯৭, কলকাতা।

৫ - 'বিদেশির শ্রদ্ধা নিবেদন' প্রবন্ধ - পিয়ের ফাঁলো এস.জে. - 'মানিক বিচিত্রা'– বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত - প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৬- সাহিত্যম-১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা ১২।

৬ থেকে ১৬ - 'পদ্মানদীর মাঝি'- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বৈশাখ- ১৩৯৭, কলকাতা।

এনইউবি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা
(Peer-Reviewed Journal)
ISSN : 2710-4451
বাংলা বিভাগ
নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২২

ফোকলোর : বাংলা ও বাঙালির শেকড়সন্ধানী রূপভেদ

জান্নাতুল যূথী*

সার-সংক্ষেপ: বাঙালি শংকর জাতি। এর রয়েছে হাজার বছরের ইতিহাস। কালের বিবর্তনে ভ্রমণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মীয় শাসন-শোষণের কারণে অনেকেই ভারতবর্ষে পাড়ি জমিয়েছিল। এর মধ্যে কেউ কেউ বংশ পরম্পরায় এদেশে বসবাস করেছেন কেউ আবার নিজের দেশে ফিরে গেছে। এই আসা- যাওয়ার মাঝখানে বাঙালি বিভিন্ন আচার-আচরণ আয়ত্ত করেছে। যুগের পরিবর্তনের হাওয়ায় সব সংস্কৃতি রক্ষিত না হলেও থেকে গেছে অনেক কিছুই। যা ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মাধ্যমে রূপলাভ করেছে আধুনিক সমাজব্যবস্থা। মানুষের স্মৃতি ও শ্রুতির মাধ্যমে আমরা পেয়েছি সাহিত্যের নানান উপাদান। যেগুলো আমাদের সাহিত্য সম্ভারকে করে তুলেছে উজ্জ্বল। 'ফোকলোর' বাংলা সাহিত্যের এমন একটি অংশ, যা না থাকলে বাংলা ও বাঙালিকে জানার মধ্যে ধোঁয়াশা থেকে যাবে! ফোকলোরের শাখা-প্রশাখা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, লোকনাট্য, লোককাহিনি, গীতিকা, লোকগান–প্রভৃতি এ স্তরকে বিশেষায়িত করেছে। লোকসংস্কৃতি, লোকবিশ্বাস, লোকবিজ্ঞান ও ফোকলোরের অংশরূপে পরিগণিত। যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বাঙালি জাতির আত্মকথনের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে।

বাঙালি একক কোনো নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী নয়। মূলত একে শংকর জাতিরূপে অভিহিত করা হয়েছে। এই শংকরায়ণের পেছনে লুকিয়ে আছে নানা ইতিহাস-ঐতিহ্য। ধারণা করা হয়, বাংলাদেশে প্রথম যে জনগোষ্ঠী বসবাস শুরু করে, তারা নিগ্রোয়েড বা অস্ট্রালয়েড শ্রেণির অন্তর্গত। কালের পরিক্রমায় তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দ্রাবিড়, কোল, মুন্ডা, মঙ্গোলয়েড, আলপিয়ান, নার্ভিক, আরব জাতি প্রভৃতি। খ্রিষ্টপূর্ব ৫ শতকের আগেই বাংলায় আর্যদের আগমন ঘটে। এরপরও মিশ্রণ অব্যাহত থাকে। অনেক জাতির সমন্বয়ে বাঙালি জাতি গঠিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মুসলিম অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত

* গবেষক, শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ।

এর মূল কাঠামো সৃষ্টির কাল। ফলে রক্তের স্রোতধারায় মিশে আছে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর অস্তিত্ব। বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই যে রূপ চোখের সামনে চির উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সেগুলোই মূলত ফোকলোরের ক্ষুদ্র উপাদান। কালের ধারাবাহিকতায় বিন্দু-বিন্দু জল জমে তা সিন্ধুর সৃষ্টি করেছে। এখনো অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান নাগরিক জীবন থেকে বহুকাল আগে সেই অতীতের চিন্তা-ভাবনা ফোকলোরে স্থান পেয়ে বিচিত্র পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক যুগে এসে উপনীত হয়েছে। এর সঙ্গে অতীত জীবনের রূপটিও বহন করে এনেছে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকসংস্কৃতি জীবনাচরণ বদলে গেলেও শেকড় থেকে তা লুপ্ত হয়ে যায়নি। জীবনের বিচিত্র ধ্যান-ধারণাকে ঘিরেই এর ডালপালা গজিয়েছে। ক্রমাগত পরিবর্তন ও পুনরাবৃত্তির ভেতর দিয়ে তা পরিণামে একটা সামগ্রিক রূপ লাভ করেছে। যাকে আমরা একত্রে ফোকলোর (Folklore) নামে অভিহিত করছি।

Folklore শব্দটি মূলত 'Folk' এবং 'Lore' এই দুটির সমন্বয়। ফোক শব্দের অর্থ লোক। যারা মূলত একই ভৌগোলিক পরিসীমায় অবস্থান করে। ভাষা ও সংস্কৃতি একই। অন্যদিকে 'লোর' শব্দকে বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় লোক সম্পর্কিত জ্ঞান, বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, মতবাদ, জাতিগত ঐতিহ্য, প্রথাগত বিদ্যা প্রভৃতি। ইংরেজিতে Folklore শব্দটি যে ব্যাপক অর্থে গৃহীত হয়েছে, বাংলায় তাকে লোকসাহিত্য বললে পূর্ণ রূপ প্রকাশ পায় না। এই Folklore-এর প্রতিশব্দ হিসেবে বিভিন্ন গবেষকগণ লোকবিজ্ঞান, লোকশ্রুতি, লোকলোর ইত্যাদি বৈচিত্র্যপূর্ণ নাম ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে লোকসাহিত্য নামটাই প্রাধান্য পেয়েছে। যার কল্যাণে লোকসাহিত্য বা ফোকলোর শব্দটি বর্তমান বিশ্বে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে তিনি হলেন William Jhon Thoms. ১৮৪৬ সালের ২২ আগস্ট 'The Athenaeum' পত্রিকায় লিখিত একটি পত্রে শব্দটি প্রথম উল্লেখ করেন। পরবর্তীকালে নানা পণ্ডিত এবং প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় বিশ্বব্যাপী তা ছড়িয়ে পড়ে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকসাহিত্য সম্পর্কে বলেছেন,

> 'লোকসাহিত্য আমরা যে রূপে লোকমুখ হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকি, তাহা সমষ্টিরই সৃষ্টি, ব্যষ্টির সৃষ্টি নহে। লোকসাহিত্যের এই অংশই সাহিত্য সংজ্ঞালাভের অধিকারী। ব্যক্তিবিশেষের মনে যে ভাবটির উদয় হয়, তাহার প্রকাশ অপরিণত ও অপরিস্ফুট থাকিবার কথা, ইহা দশজনের হাতে পড়িয়াই প্রকৃত সাহিত্যের রূপ লাভ করিয়া থাকে। অতএব ব্যষ্টির মনে যে সকল অপরিণত ভাবের উদয় হয়, তাহাই সমষ্টি লোকসাহিত্যের রূপে সমাজকে পরিবেশন করে। অতএব লোকসাহিত্যের বহিরঙ্গগত পরিচয়ের জন্য সমষ্টির দান স্বীকার করিয়া লইলেও, ইহার অন্তর্নিহিত ভাব-মূলে যে ব্যষ্টির প্রেরণাই কার্যকরী হইয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতএব, লোক-সাহিত্য ব্যষ্টি ও সমবেত সৃষ্টি; ব্যষ্টির মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহার অসম্পূর্ণ রূপায়ণকেই সমষ্টি নিজের আদর্শে সম্পূর্ণ করিয়া লয়।'[১]

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Alan Dundes বলেছেন,

> `Floklore as a mirror of culture frequentlz reveals the areas of special concern. It is for this reason that analzses of collections of folklore can provide the individual who takes advantage of the opportunities afforded bz the studz of floklore a waz of seeing another culture from the inside out instead of from the outside in the usual position of a social scientist or teacher.'[২]

ড. মযহারুল ইসলাম এ সম্পর্কে বলেন,

> 'ফোক তারাই যারা সুদূর অতীত অর্থাৎ আদিম কাল থেকে ফোকলোর সৃষ্টি করে এসেছে এবং এখনো সৃষ্টি করে চলেছে। লোক কোনো নির্দিষ্ট স্তরের মানুষ নয়, সমাজের যে কোনো স্তরে লোক বাস করতে পারে (...) শহরে, নগরে, গ্রামে সে থাকতে পারে। ফোক যেমন একটি জনগোষ্ঠী হতে পারে, একটি বিশেষ সমাজবদ্ধ শ্রেণি হতে পারে, একটি বিশেষ ভাষার ও সংস্কৃতির বলয়ে আবদ্ধ সমাজ হতে পারে, তেমনি হতে পারে একটি দল বা গ্রুপ।'[৩]

ইংরেজি ডিকশিনারি অনুযায়ী ফোকলোর অর্থ লোকাচারবিদ্যা। সেহেতু ফোকলোরের কাজ মানুষ, সমাজ-সংস্কৃতি। ফলে এটিকে সমাজবিজ্ঞানের একটি অন্যতম অংশ হিসেবেও ধরা হয়। ফোকলোর মূলত সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত সাহিত্যকে বোঝায় যা বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে ছড়িয়ে পড়ে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায়। লোকসাহিত্যের প্রধান ধর্মই এটা চির সজীব। ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমেই এটি অগ্রসর হয় এবং মৌখিক আবৃত্তি ও পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে এটির জীবনী শক্তি রক্ষা পায়। মানবজীবনের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, ইতিহাস, ঐতিহ্য জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ধ্যান-ধারণা এখানে স্থান পেয়েছে নানা রূপে।

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট অংশজুড়ে আছে লোকসাহিত্য বা ফোকলোর। সাধারণ কোনো সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর অলিখিত সাহিত্যই লোকসাহিত্য। পূর্ববর্তীকালে অশিক্ষিত সমাজের লোক দ্বারা সৃষ্ট কোনো সাহিত্যই লিখে রাখা হয়নি। স্মৃতি ও শ্রুতিতে এ সাহিত্যগুলো এক যুগ থেকে আরেক যুগে পাড়ি জমিয়েছে ফলে তা অনেকটা কল্পনা পরম্পরায় পরিবর্তিত হয়েছে। ফোকলোরের যে অংশগুলো লোকসমাজে বেঁচে আছে তা মূলত এক চিরন্তন মানবিক বৃত্তির ওপর নির্ভর করে রচিত হয়েছে। সেজন্য এগুলো দেশ কালোত্তীর্ণ হতে পেরেছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে লোকসাহিত্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টি হয়েছে সে অনুযায়ী ফোকলোরকে প্রাথমিকভাবে ৪ ভাগ করা যায়। যথা-

* লোকসাহিত্য
* লোকসংস্কৃতি
* লোকশিল্প
* লোকবিজ্ঞান।

মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত সাহিত্যই লোকসাহিত্য। কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টির জন্য লোকসাহিত্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এমনকি অনুবাদ সাহিত্যের ওপরও লোকসাহিত্যের প্রভাব বিদ্যমান। মধ্যযুগের কবিরা আরিক অনুবাদের পাশাপাশি লোকসাহিত্য থেকেও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন প্রতিনিয়ত। লোকসাহিত্য গড়ে উঠেছে প্রাচীন বিভিন্ন কাহিনি বা আখ্যানকে কেন্দ্র করে। রাধা-কৃষ্ণ, দ্রৌপদী-অর্জুন, রাম-সীতা, বেহুলা-লখিন্দর, পরীর কাহিনি, ঈশপের কাহিনি প্রভৃতির মিশ্রণে রূপ লাভ করেছে ফোকলোরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ লোকসাহিত্য। মাটির সঙ্গে ফোকলোরের সংযোগ নিবিড়। সাধারণ জনগণের স্মৃতি এবং শ্রুতির মাধ্যমে কালের পরিক্রমায় এ সব সাহিত্য মানব সমাজে স্থান লাভ করেছে। লোকসাহিত্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ নিদর্শন বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। এগুলো হচ্ছে–ধাঁধা, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, লোককাহিনি, লোকগান, লোকগীতিকা, কথা প্রভৃতি। লোকসাহিত্যের সব শাখা-প্রশাখায় লেগে আছে বাঙালির আবহমান ইতিহাস-ঐতিহ্য। বাংলা ও বাঙালির শেকড়ের সন্ধান করতে তাই বার বার আমাদের ফোকলোরের কাছে যেতে হয়। আমাদের হৃদয়ের খোরাক জোগায় এ সব উপাদানগুলো।

ফোকলোরকে চিনতে বা জানতে হলে এর সব শাখার সঙ্গে পরিচয় ঘটানো দরকার। ফোকলোরের সবচেয়ে প্রাচীনতম ও বিশেষ অংশ ছড়া। এই শাখার সঙ্গে সবারই পরিচয় রয়েছে। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার পরই শিশুর জীবনাচরণে ফোকলোরের নানান উপাদান জড়িয়ে পড়ে ক্ষেত্র বিশেষে। শিশুকে ঘুম পাড়াতে, আনন্দ দানে, মানুষের কু-নজর থেকে বাঁচাতে, শিশুর দুষ্টামি রুখতে মায়েরা ফোকলোরের আশ্রয় নেন। ছড়া লোকসাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীনতম শাখা। মানব জীবনের সর্বস্তরে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত যা মৌখিক আবৃত্তি করা হয়, তাই ছড়া। তবে গান ও ছড়ার মধ্যে যে পার্থক্য তা সুর, তাল, ছন্দ এবং লয়ের। ছড়ার সুর বৈচিত্র্যহীন কিন্তু গানের সুর বৈচিত্র্যময়। ছড়া সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'মৌখিক আবৃত্তির জন্য মুখে মুখেই যাহা রচিত হয় তাহাই ছড়া। মৌখিক ঐতিহ্য (Oral tradition) হইতেই ছড়াটি রচিত হইয়াছে, তাহার একটি প্রধান প্রমাণ এই যে, ইহারই একটি রূপ বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঁকুড়া জিলার লোক-মুখ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।'[৪] ছড়াগুলোকে কাজের প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। ছেলে খেলার ছড়া, ছেলে ভোলানো ছড়া, ঘুম পাড়ানি ছড়া, মেয়েলি ছড়া, নৈসর্গিক ছড়া, নীতিমূলক ছড়া, ঐন্দ্রজালিক ছড়া প্রভৃতি। ছড়ার সঙ্গে মিশে আছে বাঙালির আজন্ম লালিত স্মৃতি। মাটির মৃদু গন্ধে যেমন মাতৃভূমির ছোঁয়া লেগে থাকে ঠিক, তেমনি ছড়াগুলোর সঙ্গে মিশে আছে জীবনের সুখস্মৃতি। বড় কিংবা ছোট; সবার কাছেই এগুলো

সুখপাঠ্য। শিশুকে ঘুম পাড়াতে নানি-দাদি, মায়েরা গুন গুন করে ছড়া আবৃত্তি করে থাকে। পরবর্তীকালে একটা সময় শিশুর মনস্তত্ত্বের সঙ্গে মিশে যায় ছড়াগুলো। তখন শিশুকে ছড়া বলে বলেই ঘুম পাড়াতে হয়। শিশুর ঘুমের সঙ্গে গীত ছড়াগুলোকে প্রকৃতপক্ষে ছেলেভোলানো ছড়া নামেই আখ্যায়িত করা হয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর *বাংলার লোকসাহিত্য-ছড়া* গ্রন্থে এমন অসংখ্য ছড়ার রূপভেদ তুলে ধরেছেন। একই ছড়া অঞ্চল ভেদে পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। রাজশাহী অঞ্চলে যে ছড়াগুলো গৃহীত হয়েছে তাদের আঞ্চলিক ভাষা বা ঐতিহ্যে সেগুলোই পাবনা, চট্টগ্রাম, সিলেট প্রভৃতি অঞ্চলে ভিন্ন।

শিশুর ঘুম বাঙালি মায়েদের কাজকে সহজ করে তোলে। গ্রামবাংলার আবহমান মায়েরা সন্তানকে কোলে-পিঠে করে গড়ে তোলে। তাদের একাধিক কাজের মাঝে একটুও ফুরসত নেই নিজের সন্তানকে বাড়তি সময় দেওয়ার। তবু শিশুকে বুকে আগলে রাখে পরম মমতায়। শিশুর একটু ঘুম তাই মায়ের কাছে পরম পাওয়া। শিশুকে দুই হাঁটুর ওপর নিয়ে এমনকি বুকে নিয়ে মায়েরা তাকে দোলাতে দোলাতে ঘুম পাড়ান। আবার শিশুর খাওয়ানোটা অধিক কষ্টের। সেক্ষেত্রেও মায়েরা তাকে বিশেষ মন্ত্রে মুগ্ধ করেন ছড়ার মাধ্যমে। মায়ের কণ্ঠস্বরের ভেতরে শিশু নিজের কণ্ঠের স্বর শুনতে পায়। এজন্য মাতৃকণ্ঠের আবৃত্তি তাকে আনন্দ দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'ছেলে-ভুলানো' ছড়ার আলোচনায় বিস্তৃত ছড়া সাহিত্যের একটি রূপ তুলে ধরেছেন। যা থেকে এর সমগ্র পরিচয় ফুটে ওঠে। অতএব বাংলার লোকসাহিত্যে ছড়া বিশেষভাবে উল্লখযোগ্য। বাঙালি জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা বিরাজমান। রাজশাহী অঞ্চলে ছেলে ভুলানোর ছড়াটি আবৃত্তি করা হয় এভাবে,

> ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
> বর্গী এলো দেশে
> বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
> খাজনা দেবে কিসে!
> ধান ফুরাল পান ফুরাল
> খাজনার উপায় কি?
> আর কিছুকাল সবুর করো
> রসুন বুনেছি।[৫]

একই ছড়াটি চট্টগ্রাম অঞ্চলে আবৃত্তি করা হয় ভিন্ন পন্থায়। 'মণি ঘুমাইল পাড়া জুড়াইল 'গরকী' আইলো দ্যাশে গুলগুলিয়ে ধান খাইয়াছে খাজনা দিবে কিসে।'৬ অঞ্চল ও ভাষার পরিবর্তনে ছড়াগুলোরও বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড় গ্রাম থেকে ১৩০২ সালে এই ছড়াটি সংগ্রহ করা হয়। বর্গীর হামলা একটি ঐতিহাসিক

ঘটনা। মারাঠা সাম্রাজ্য কর্তৃক (১৭৪২-১৭৫১) সাল পর্যন্ত দীর্ঘ নয় বছরব্যাপী বাংলাকে বারবার আক্রমণ করা হয়। এই মারাঠা আক্রমণই বাংলায় বর্গী হামলা নামে পরিচিত। জনশ্রুতিতে এই ছড়াটি এখনো জীবন্ত কিন্তু কালের পরিক্রমায় কিছু সংযোজন বা বিয়োজন হয়েছে। বাঙালি জাতির যে ইতিহাস তার সঙ্গে ফোকলোরের সম্পর্ক নিবিড়। ফোকলোরকে কাটাছেঁড়া করলেই বাঙালি জাতির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাক্ষাৎ মেলে। বর্গী শব্দটি কালের পরিক্রমায় 'গরকী'তে পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু এর শেকড় সন্ধান করলে ইতিহাসের বর্গীকেই পাওয়া যায়।

ধাঁধা লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও এর সংগ্রহ যথেষ্ট নয়। এ ব্যাপারে আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর *বাংলার লোকসাহিত্য পঞ্চম খণ্ড-ধাঁধা* গ্রন্থের নিবেদন অংশে উল্লেখ করেছেন,

> 'বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ধাঁধা সবচেয়ে উপেক্ষিত বিষয়। এ যাবৎ ইহার সংগ্রহ ও যেমন অকিঞ্চিকর হইয়াছে, তেমনি ইহার বিষয়ে কাব্য-কিম্বা সমাজবিজ্ঞান সম্মত আলোচনাও কিছুই হয় নাই। ইহার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ছড়া, গান এবং কথা সম্পর্কে তাঁহার যে গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা প্রকাশ পাইয়াছে, ইহার সম্পর্কে ও যদি তাহা প্রকাশ পাইত, তবে তাহা দ্বারা বাঙালী সংগ্রহক এবং সমালোচক অনুপ্রাণিত হইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হয় নাই বলিয়াই, ইহার প্রতি বিদগ্ধ সামাজের দৃষ্টি যথাযথ আকৃষ্ট হইতে পারে নাই।'[৭]

ধাঁধার মাধ্যমে জ্ঞান বুদ্ধিচর্চা হয়ে থাকে। প্রশ্নকর্তা নিজে উত্তর গোপন রেখে প্রতিপক্ষকে প্রশ্ন ছুড়ে দেন। ফলে বিপরীতপক্ষ যদি সঠিক উত্তর দিতে পারে, তাহলে তাকে জ্ঞানী ধরা হয়। না পারলে বোকা ভাবা হয়। ধাঁধার উত্তর জনশ্রুতিমূলক। আগে থেকে যদি ধাঁধাগুলোর সঙ্গে পরিচয় না থাকে, তবে এর উত্তর দেওয়া অনেকটা কঠিন হয়ে পড়ে। লোকমুখে এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। ধাঁধার মূলত দুটিরূপ সমাজে বিদ্যমান। প্রকৃতি ও গার্হস্থ্যবিষয়ক ভাবনার সঙ্গে কল্পনা এবং রসের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ব্যক্তির বুদ্ধি পরীক্ষার একটি কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এখানে ছন্দের ব্যবহারও বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এ কারণে অনেকেই ধাঁধা থেকে রূপক অলংকারের সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করেন। তবে এটা কতটা যুক্তিসঙ্গত, সে বিষয়ে ঢের মতপার্থক্য রয়েছে। পাশ্চাত্য সমাজে ধাঁধার শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে বলে ধারণা করা হয়। কারণ প্রাচীন গ্রিক শব্দ থেকে Riddle শব্দটির উৎপত্তি। যার অর্থ উপদেশ দেওয়া। তবে সংস্কৃত ভাষায় এর অর্থ প্রহেলিকা। ধাঁধা শব্দটি মূলত প্রহেলিকা বা হেয়ালির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর উদ্দেশ্য আরও ব্যাপক। ধাঁধার সাহায্যে সমাজের প্রাচীনতর রূপটির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ কিভাবে কোন পথে এতদূর পাড়ি জমিয়েছে, তা জানার উপায় নেই। এমনকি এ বিষয়ে অনুমানও সবসময় নির্ভুল হয় না। মননশীলতায় কিছুদূর

অগ্রসর না হয়ে কেউ ধাঁধা রচনা করতে পারেনি। এখানে হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের পাশাপাশি বুদ্ধি প্রয়োগ আবশ্যক। ফলে মানব সমাজে বুদ্ধির বিকাশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে সৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে ধাঁধার যে রূপ বর্তমান সেখানে ধাঁধাগুলোতে সুপ্রাচীন কালের স্বাক্ষর সঠিকভাবে মুদ্রিত হয়নি। তবে এগুলোর সঙ্গে সমসাময়িক কালের ভাষার রূপ পরিলক্ষিত হয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গেই মানুষের প্রথম পরিচয় ঘটে। ফলে সংখ্যা গণনায় আজও মানুষ আঙুলের ব্যবহার করে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন অংশ নিয়ে ধাঁধা প্রচলিত আছে। যা মানবসমাজের প্রাচীনতম ইতিহাস ও ঐতিহ্যবাহী রচনাকে স্মরণ করায়। প্রাচীনতর রূপের পরিবর্তন ঘটলেও শেকড়ের ধারা অনুসরণ করেই এ যুগের ধাঁধাগুলো রচিত হয়েছে। ফোকলোর বাঙালি জাতির শেকড়ের ধারা অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছে যদিও কালের পরিক্রমায় এর প্রকাশ ভাবনা ভিন্ন রূপে প্রকাশিত।

আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হওয়ার পূর্বে শিশুর আত্মার বিকাশ ঘটানোর জন্য এই ধারায় শিক্ষা দেওয়া হতো। এ শিক্ষা মুখে মুখেই প্রদান এবং গ্রহণ করতো শিশুরা। কিন্তু যেদিন থেকে লিখিত পাঠ্য-পুস্তক এলো সেদিন থেকে এ ধারাটা লুপ্ত হতে শুরু করলো। লৌকিক ধারার পরিবর্তে তা সাহিত্যিক ধারায় আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু লৌকিক ধাঁধাগুলো এখন গ্রাম্য শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, নিরক্ষর মানুষের মনে আনন্দ সঞ্চার করে। ধাঁধার সাহায্যে আদিম সমাজের মানুষ যে মননশীলতার চর্চা শুরু করেছিল, তা কালের বিবর্তনে হারাতে বসেছে। সভ্যতার প্রভাব ব্যক্তিজীবনে যতই জটিল হচ্ছে ধাঁধার প্রভাব ততটাই বিলুপ্ত হচ্ছে। একদিন বাবা-মায়ের জীবনে অবসর ছিল। তারা সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারতো। তাদের জ্ঞানের বিকাশে এগুলো আনন্দদানের উত্তম সঙ্গী ছিল। কিন্তু শহরায়ন ও নগরায়ণের ফলে ধীরে ধীরে প্রাচীন প্রথার ধারাবাহিকতা মুখ থুবড়ে পড়ছে। বিবাহ অনুষ্ঠান, চৈত্রসংক্রান্তি, অনাবৃষ্টি, বৃষ্টিপাতের জন্য, শস্যসম্পদ বৃদ্ধির জন্য, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি উপলক্ষে আদিম সমাজে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করার রীতি ছিল। বুদ্ধি পরীায় উত্তীর্ণ হলে তাকে জ্ঞানী আর না পারলে তাকে নির্বোধ ভাবা হতো। মৌখিক এই প্রশ্ন ও উত্তর দানের মাধ্যমে সবার মধ্যে হাসি-তামাশার আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হতো। যা বাঙালি জাতির প্রাচীন জীবনাচরণের প্রতি দিক নির্দেশ করে। প্রাচীন ধর্মীয় শাস্ত্র বাইবেল, বেদেও ধাঁধার প্রভাব বিদ্যমান। বৈদিক যুগ থেকেই সমাজে সাহিত্যিক ধাঁধাগুলোর প্রচলন ছিল। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদে যে সব ধাঁধার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, তা মূলত লৌকিক ধাঁধারই রূপান্তর। লৌকিক উপদান নিয়েই সাহিত্যিক ধাঁধা গড়ে উঠেছে। ফোকলোর সম্পর্কে জানতে গেলে বাঙালির আবহমান ইতিহাসকে জানা হয়ে যায়। ফোকলোরের উপদান

বাঙালির আবহমান সংস্কৃতি-ঐতিহ্যেরই অবিচ্ছেদ্য রূপ। সমাজে আজও প্রচলিত কিছু ধাঁধা নিম্নরূপ:

* বন থেকে বেরুল টিয়ে
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।
(আনারস)

* একটু খানি পুষ্কুনি কইয়ে ভুর ভুর করে
রাজা আইলে প্রজা আইলে তুইল্যা সেলাম করে।
(হুঁকা)

* রাজার বাড়ির মেনা গাই মেনমেনাইয়া চায়
হাজার টাকার মরিচ খাইয়া আরো খাইতে চায়।
(শিলনোড়া)

ধাঁধাগুলোর মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজ, প্রকৃতির রূপ পরিলক্ষিত হয়। যা ফোকলোরকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। ধাঁধার মতোই ফোকলোরের অবিচ্ছেদ্য অংশ প্রবাদ-প্রবচন (Proverb)। এটি ফোকলোরের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। প্রাচীনকাল থেকে সমাজের রীতি-নীতি, নৈতিকতা, জীবনাচরণ, সংস্কৃতি, কৃষি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবাদ-প্রবচনের সৃষ্টি। মানুষের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার একটি সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয় আলোচ্য অংশে। প্রবাদে আছে জ্ঞান ও সত্য প্রচারের অপরিসীম প্রচেষ্টা। প্রবাদ ব্যক্তিবিশেষের একক সৃষ্টি হলেও লোকপরম্পরায় তা স্থান করে নিয়েছে মানুষের মনে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বাঙালির জীবন ধারণের সঙ্গে এগুলো মিশে আছে ওতোপ্রোতোভাবে। কথাপ্রসঙ্গে নিজের অজান্তেই এগুলোর ব্যবহার ঘটে থাকে।

> "প্রবাদ সম্পর্কে ইউরোপের স্পেনদেশীয় একটি সংপ্তি সংজ্ঞার ইংরেজি অনুবাদ করিলে এই দাঁড়ায়, A proverb is a short sentence based on long experience. বলাবাহুল্য ইহা প্রবাদের পরিপূর্ণ পরিচয়বাহী নহে। কারণ, সর্বদাই প্রবাদ যে সংক্ষিপ্ত বাক্য তাহা নহে, ইহা প্রধানত একাধিক কবিতার পদ এবং অনেক সময়ই ইহা খুব সংক্ষিপ্তও হয় না। চারটি এবং ততোধিক পদেও একটি প্রবাদ সম্পূর্ণ হইতে পারে। সুতারাং ইহা যেমন সর্বদা সংক্ষিপ্ত নহে, তেমনই কেবলমাত্র বাক্যও নহে, কদাচিৎ সংক্ষিপ্ত বাক্য হইতে পারে মাত্র। বিশেষত এই সংজ্ঞা দ্বারা ইহার বিষয় এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই জানিতে পারা যায় না। তারপর long experience কিংবা দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথাও যে সর্বদা ইহার মধ্যে প্রকাশ পায়, তাহাও নহে। 'বন পোড়ে সবাই দেখে, মন পোড়ে কেউ দেখে না।' আগুনে যে পোড়ায় একবার দেখিলেই তাহার অভিজ্ঞতা হয়, মনও দগ্ধ হইতে পারে, তাহা ব্যক্তিগত জীবনের একক অভিজ্ঞতা দ্বারাই অনুভূত হয়। সুতরাং দীর্ঘ অভিজ্ঞতার এখানে আবশ্যক নাই। অনেক সময় প্রবাদ কোন বিশেষ শ্রেণির মানুষের বিশেষ কোন আচরণের সমালোচনা মাত্র, অনেক সময় ইহার মধ্য দিয়া শ্রেণিবিশেষের প্রতি ব্যঙ্গের ভাব প্রকাশ পায়, এই ব্যঙ্গ শ্রেণীগত হইলেও তাহা সমাজ দ্বারা সমর্থিত।"[৮]

বিভিন্ন দেশে একই ধরনের প্রবাদ প্রচলিত। এক দেশের প্রবাদ যেমন অন্য দেশে প্রচলিত তেমনি একই ভাব নিয়ে বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রবাদ সৃষ্টি হয়। প্রবাদের মাধ্যমে মানুষের সামাজিক আচার-আচারণ, ধ্যান-ধারণার পরিচয় ফুটে ওঠে। বাংলা প্রবাদের উৎস অনেক। জীবনাচরণকে কেন্দ্র করে ক্ষেত্রবিশেষে এর সৃষ্টি। লোকমুখে প্রচলিত প্রবাদ কবি-সাহিত্যিকদের রচনায় বিশেষ স্থান করে নিয়েছে যুগের সঙ্গে সঙ্গে। এর মধ্যে দিয়ে জীবনের একটি চিত্র ফুটে ওঠে। সত্য কথা বিশেষভাবে যখন প্রকাশ করা হয়, তখন সেটা প্রবাদে রূপ নেয়। যেমন আমরা বলি কোনো কাজ করার ইচ্ছাশক্তিটাই বড়। যদি ইচ্ছে থাকে পাহাড়সম কঠিন কাজ নিমিষেই সমাধান করা যায়। এত ব্যাখ্যা না দিয়ে আমরা বলি 'ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়।' এমন আরও অনেক প্রবাদ অহরহ আমাদের জীবনে ব্যবহার করে থাকি।

* নাম মানুষকে বড় করে না কর্মই মানুষকে বড় করে
* পরের পিঠে বড় মিঠে
* দশের লাঠি একের বোঝা
* পরের মুখে ঝাল খাওয়া
* কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ পাকলে করে ঠাস ঠাস
* যে সয় সে রয়
* মুখে এক মনে আর
* নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা
* পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা
* পরের ধনে পোদ্দারি
* পরের মুখে ঝাল খাওয়া
* ধান ভানতে শিবের গীত
* মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশি
* পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার করা
* রাজার বাড়ির হাতি নিত্য খায় লাথি
* বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।

এছাড়া সমাজে প্রচলিত অসংখ্য প্রবাদ বিদ্যমান। যার মাধ্যমে বিশেষ একটি নির্দিষ্ট ভাব প্রকাশ পায়। ফোকলোরের অন্যান্য শাখার মতো এরও কোনো একক স্রষ্টা মেলা ভার। স্মৃতি ও শ্রুতিতে কালের পরিক্রমায় মানুষের মুখে মুখে আজও এগুলোর বাস। প্রবাদ এমন একটি সৃষ্টি যাকে বাঙালি জীবনাচরণ থেকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবাদে জ্ঞানের পরিচয় অপেক্ষা অভিজ্ঞতার পরিচয় বেশি পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীনকাল থেকে মানুষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে প্রবাদগুলো জীবন্ত রূপ পেয়েছে। কিভাবে প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে, তা বলা সহজ নয়। ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের পর দেশ রক্ষার দায়িত্ব চলে যায়, সামন্ত রাজদের হাতে তখন থেকেই ডোম জাতির সামাজিক পতন শুরু হয়। কিন্তু

তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল। তাই তারা তাদের জীবনের বহু রূপ সংরক্ষণ করে রাখতে সমর্থ হয়। সেজন্য ডোমজাতির মধ্যে কিছু প্রবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে কিছুই রক্ষিত হয়নি। যে সব জাতির নিজস্ব প্রচীন ঐতিহ্য নাই তাদের মধ্যে এদের ব্যবহার নেই বললেই চলে। মূলত যে জাতির ভাষার সমৃদ্ধি যত বেশি তাদের মধ্যেই প্রবাদগুলো বেশি সংরক্ষিত হতে দেখা গেছে। প্রবাদগুলোতে অন্তঃপুরের জীবন প্রধান্য লাভ করেছে এবং মেয়েলি ভাষারই একটি বিশেষ শক্তি এর মধ্যে ফুটে উঠেছে। নিরক্ষর বা অর্ধশিক্ষিত নারীসমাজেই প্রবাদের প্রথম উদ্ভব হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। কেননা প্রাচীনকালে নারীরা একইসঙ্গে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতো যেমন ধান ভানা, চিড়া কোটা, মুড়ি ভাজা, ধান মাড়ানো, কাঁথা সেলাই, পিঠা বানানো, গল্প-গুজবে অংশগ্রহণ করা প্রভৃতি। এ সময় স্ত্রীসমাজের মধ্যে পরস্পরের কথায় কথায় এমন একটি বাক্য সহসা বের হয়ে আসতো যা একটি চমক সৃষ্টি করতো এবং পরবর্তীকালে সবার মধ্যে এই চমৎকারিত্বের গুণ মনে গেঁথে যায়। এইভাবে বংশ পরম্পরায় যুগ থেকে যুগান্তরে মুখে মুখে তা লোকসাহিত্যের স্বাভাবিক ধারা হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অংশ ফোকলোরে রূপ লাভ করেছে।

বাঙালি চিরকালই গীতিপ্রবণ জাতি। গানের সুর মানেই বাঙালির অন্তরের সুর। বাঙালি জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য তথা ফোকলোরের সঙ্গে পরিচয় হবে আর সেখানে গান থাকবে না তা হতেই পারে না! জয়দেব থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাঁর সর্বোত্তম ফলই তাঁর গীতি বা গীতি-কবিতা। বিশ্ব কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি হিসেবে খ্যাত। তবে বাংলা সহিত্যের প্রধান গীতিকবি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় বিহারীলাল চক্রবর্তীকে। যাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভোরের বিহঙ্গী' রূপে আখ্যায়িত করেছিলেন। তাঁর কবিতায় ছন্দের যে মূর্ছনা ফুটে তাতে গীতিপ্রাণ ছন্দ বিদ্যমান। যদিও গান আর কবিতার ছন্দ এবং সুরে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। তবুও গীতি কবিতার এ সব ছন্দের সুরই গানের উৎস হিসেবে মনে করা হয়। বাংলা সহিত্যের যে প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদ সেখানেও এই গীতিময়তা লক্ষ করা যায়। যদিও এটা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাধন সংগীত। ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচনের মতো লোকসংগীত ফোকলোরের একটি সুবিশাল স্তর দখল করে আছে। বাংলা ও বাঙালির শেকড় এসব লোকসংগীতে নিহিত। জাত বাঙালির চিরন্তন মনোমুগ্ধকর শোভা এসব গানের মধ্যে ফুটে উঠেছে। লোকসাহিত্যের বিশেষ অংশ গানের মাধ্যমে বাঙালি জাতির জীবনাচরণ, তাদের নীতি-নৈতিকতা, ধ্যান-ধারণা, দুঃখ, সুখ, হাসি-কান্না, প্রেম, বিরহ, মরমি গীত সবই স্থান পেয়েছে। স্থানীয় বিশেষ আচারও গানের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে যার দ্বারা বাঙালি জাতির শেকড়ের সন্ধান মেলে। লোকসংগীত হলো লোকমানস থেকে উদ্ভূত সংগীত যা সাধারণ শ্রুতি এবং স্মৃতিকে নির্ভর করে

বহমান। গীত, বাদ্য ও নৃত্য; এ সবার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে সংগীত। অন্যদিকে লোকগীত, লোকবাদ্য ও লোকনৃত্যকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় লোকসংগীত। লোকসংগীতে কাহিনি থাকে না বরং বিশেষ বিশেষ ভাব অবলম্বনেই এ গানগুলো রচিত হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানবজীবনের প্রতিটি অবস্থাই গানে প্রকাশিত হয়। শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে অন্যান্য লোকসাহিত্যের চেয়ে কয়েকগুণ ওপরে অবস্থান লোকসংগীতের। হৃদয় মন ব্যাকুল করা এ সংগীতগুলো মানব মনের খোরাক। লোকসংগীত সম্পর্কে বিশিষ্ট ফোকলোর গবেষক আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন,

> 'লোকসংগীতের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, কোন দেশে কোনোকালেই লোকসংগীত অনুশীলনের কোনো বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা থাকে না। কিভাবে ইহা রচনা করিতে হয়, কিভাবে ইহাকে স্মৃতিপথে রা করিতে হয়, কিংবা কিভাবে ইহার সুর ও তাল শিক্ষা লাভ করিতে হয়, তাহার সুনির্দিষ্ট প্রণালী নাই। যাহারা ইহা আয়ত্ত করে, স্বভাব-দত্ত ক্ষমতার গুণে কেবল মাত্র কানে শুনিয়াই তাহা আয়ত্ত করিয়া থাকে। লোক সামাজের মধ্যে এই প্রণালীতেই ইহা চিরকাল ধরিয়া প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সেইজন্য পল্লী সমাজ হইতে যখন আমরা আজ এক নূতন সমাজ জীবনের মধ্যে উত্তীর্ণ হইলাম, তখন ইহাকে রা করিবার কোন বর্হিমুখী প্রণালীও অনুসরণ করিতে পারিলাম না।'[৯]

বিষয় ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে লোকসংগীতসমূহ কতকগুলো বিশেষ ভাগে বিভক্ত। সব ভাগই নিত্যদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ড. আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর *লোকসাহিত্য* গ্রন্থে লোকগীতির বিশেষ ছটি ভাগ উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিক গীতি যা প্রকৃতপক্ষে অঞ্চলবিশেষে প্রচলিত। বিবাহ উৎসব প্রভৃতি উপলক্ষে যা গীত হয় তাই ব্যবহারিক গীতি। এছাড়া আনুষ্ঠানিকভাবে বা হাসির বিষয় নিয়ে যেগুলো গাওয়া হয় সবই হাসির গান। যা নানা কাজ অর্থাৎ কৃষিকাজ, নৌকাবাইচ, ছাদ পিটানো, ধান কাটা, ঘর ছাওয়া প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গীত তাই কর্মসংগীত বা শ্রম সংগীত। সবিশেষ প্রেমসংগীত এবং বারমাসী গান বলতে মূলত বিরহী নারী-পুরুষের নানা হৃদয়বেদনা ও চিরন্তন প্রেম সম্ভাষণ নিয়ে রচিত গান। বিরহবেদনার রূপ এ সব গানে প্রকাশ পায়। লোকসঙ্গীতের দিক থেকে বাংলাদেশকে চারভাগে ভাগ করা যায়। রাঢ়, পশ্চিম বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ, উত্তর-পূর্ববঙ্গ। বাংলার লোকসংস্কৃতির রূপ আজও প্রান্তিক অঞ্চলগুলোতে রক্ষিত আছে।

আঞ্চলিক সংগীতের মধ্যে রয়েছে পটুয়া গান। গ্রামাঞ্চলে পটুয়া নামক এক শ্রেণি সম্প্রদায় পট এঁকে গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে সংগীতসহ তার প্রদর্শনী করতো। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে এ রীতির প্রচলন ছিল কিন্তু কালের পরিক্রমায় এখন তা বিলুপ্তির পথে। রাঢ়ের বীরভূম অঞ্চলে খুঁজলে হয়তো এখনো কিছু অস্তিত্ব পাওয়া

যেতে পারে। তৎকালীন সমাজের এ সব গানের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে বাঙালি জাতির সমাজব্যবস্থার গোড়ার কথা।

গরু নাড় গরু চাড় গরু বড় ধন
যার ঘরে গরু নাই তার বৃথাই জীবন।
গরুর সেবা করেছিলেন প্রভু নারায়ণ
ইদ্র রাজা দেবগণ বসিয়া আকনে
কপার পৃষ্ঠ কথা কহেন সেখানে।
কপিলা ডাকিয়া তবে বলিছে বচন
তোমায় যেতে হবে মা রবনী মণ্ডল।
আমি তো যাবো না রবনী মণ্ডলে
আমার মহিমা নরলোকে কিবা জানে।[১০]

বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের গরুর প্রতি যে শ্রদ্ধা তা আলোচ্য গানে পরিলক্ষিত। তৎকালে এগুলোর মাহাত্ম্য কীর্তন করে চিত্র ফুটিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো কিছু মানুষ। মুসলমান সমাজে এগুলো গাজীর গান নামে পরিচিত। আঞ্চলিক সংগীতের একটি বিশেষ শাখা ভাদু গান। ভাদ্র মাসে রাঢ় অঞ্চলে যেসকল গান গাওয়া হতো সেগুলোকে ভাদু গান বলা হতো। এই আঞ্চলিক সংগীতের মধ্যে আরো রয়েছে টুসু গান, সাথী গান, গম্ভীরা যা এখনও রাজশাহী অঞ্চলে বিশেষভাবে গীত হয়, ভাওয়াইয়া রংপুর এবং ভারতের কোচবিহার অঞ্চলের গান, চটকা, জাগ গান, ঝুমুর গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ব্যবহারিক গান (Functional song) পারিবারিক জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনে গাওয়া হয় এর মধ্যে রয়েছে বিবাহের গান, রাম-সীতার গান, শকুন্তলার গান, সাধ খাওয়ানোর গান, সন্তান জন্মকালীন গান, সুভদ্রা সাবিত্রীর গান, বর সাজানো, কনে সাজানো, হলুদ কোটা এবং বাটার গান, ভাত কাপড়ের গান, পাশা খেলার গান, বধূবরণের গান, কন্যা বিদায়ের গান প্রভৃতি। হাসির গানগুলো মজার সব বিষয় নিয়ে রচিত। পার্বণ সংগীত, মনসা পূজার গান, জন্মাষ্টমীর গান, দুর্গাপূজার গান, রামলীলা, কালীপূজা, দুর্গাপূজা, ভাইফোঁটা, শীতল পূজা প্রভৃতি। লৌকিক পৌরাণিক, বারমাস্যকে কেন্দ্র করে রচিত প্রেমসংগীত। কর্মসংগীত বলতেই কাজ করার সময় যেগুলো গাওয়া হয় তাকে বোঝায়। এগুলো শুধু লোকগানই নয় বরং বাঙালি জাতির ভিত্তিমূল। পরিপূর্ণভাবে এ জাতিকে চিনতে বা জানতে বার বার আমাদের শেকড়ের সন্ধান করতে হয়। কালের পরিক্রমায় এগুলোরই কিছু পরিমার্জন বা সংযোজন ঘটে গড়ে উঠেছে আজকের জাতিসত্তা ও ফোকলোরের উপাদান।

লোকসংগীতের মতো ফোকলোরের আরও একটি বিস্তৃত অংশজুড়ে আছে লোকনাট্য। মানুষের মধ্যে গল্পে গল্পে যে নাটক গড়ে ওঠে, তাই সাধারণত লোকনাট্য। আরও

পরিষ্কার করে বলা যায়, সাধারণ মানুষের মধ্যে কথ্যরীতিতে যে নাটক গড়ে ওঠে, সেগুলোই মূলত লোকনাট্য। নাটক ও লোকনাট্যের কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই দুটোকে মিলিয়ে ফেললে চলবে না। লোকনাট্য সাধারণত মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে সংশ্লিষ্ট সবাই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া লোকনাট্য আঞ্চলিক ভাষায় দর্শক মহলে অভিনীত হয়। সব লোকনাট্যে একটি ভাঁড় চরিত্র থাকে, যার সাক্ষাৎ পাওয়া মাত্র সামনে উপবিষ্ট দর্শকরা হাসিতে ফেটে পড়ে। লোকনাট্যের আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলো একান্তভাবে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় চিত্রায়িত হয়। লোকনাট্যের নির্দিষ্ট কোনো রচিয়তার পরিচয় মেলে না। এগুলো অঙ্ক বা দৃশ্যে বিভক্ত নয়। কুশীলবরা অতি সাধারণ পোশাক, যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এগুলোর চিত্রায়ণ করেন। রাম-সীতা, অর্জুন- দ্রৌপদী, রাধা-কৃষ্ণ, নিমাই-সন্ন্যাস, বেহুলা-লখিন্দর, ঈসা খাঁ, দেওয়ান, ফিরোজ দেওয়ান, সখিনা- কাসেম প্রভৃতি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও লৌকিক কহিনির বিষয় নিয়ে রচিত ও পরিবেশিত হয় লোকনাট্য। এর দুটি অংশ থাকে। একটি প্রস্তুতিপর্ব, অন্যটি মূলপর্ব। লোকনাট্য যে সব বিষয় নিয়ে রচিত, তার সবই প্রায় বাঙালির আবহমান সংস্কৃতির অংশবিশেষ।

ফোকলোরের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা লোককাহিনি। সাধারণ মানুষের মুখে মুখে রচিত হয়ে বংশপরম্পরায় প্রবহমান থাকে। লোককাহিনির প্রতিশব্দ হিসেবে ইংরেজি Folktales-কে নির্দেশ করা হয়। বাংলায় একে রূপকথা বা পরী কাহিনি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। যা ইংরেজিতে Fairz tales নামে পরিচিত। লোককাহিনিগুলো পরী, রাক্ষস খোক্কস, রাজপুত্র, রাজকন্যার উদ্ধার ও বিবাহ, ঐদ্রজালিক ক্ষমতা, দৈব সাহায্য ইত্যাদিকে কেদ্র করে গড়ে উঠেছে। জার্মান ভাষায় এরূপ কাহিনিকে Marchen নামে অভিহিত করা হয়েছে। বাংলায় দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সম্পাদিত *ঠাকুরমার ঝুলি*, *ঠাকুরদাদার ঝুলি*, *ঠানদিদির থলে* প্রভৃতি এই গল্পের সংকলন। যেসব গল্পে জীবজন্তুকে প্রধান করে উপদেশ বা নীতিকথা প্রচারিত হয়েছে সেগুলিকে ইংরেজিতে Fable বলা হয়। ইংরেজি *ঈশপের গল্প*, *সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র* ও *হিতোপদেশ* এরূপ নীতিকথার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইংরেজিতে যাকে Anecdote বলা হয়। Fable এসকল নীতিকথা থেকে মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে শিলাভ করতে পারে এজন্য একে উপদেশকথাও বলা যেতে পারে। গ্রিক সাহিত্যে Hercules, Prometheus, আরব্য উপন্যাসের Sindabad প্রভৃতি বীর চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বাংলায় যাকে বীরকথা বলা হয়। আর একপ্রকার লোককাহিনি সমাজে প্রচলিত আছে যেগুলো বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য। এগুলোকে বাংলায় ধাঁধামূলক গল্প বলা হয় এবং ইংরেজিতে Enigma বলা হয়। নতুন বর- কনে, রাজসভায় বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য এগুলো রচিত হতো। এ ধরনের একটি অতি

সুপরিচিত চরিত্র গোপাল ভাঁড়। যার অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল শিশু-কিশোর এমনকি বড়দেরও আকৃষ্ট করে। আমাদের সমাজের টুকরো টুকরো নানান উপাদানের সমন্বয়ে ফোকলোরের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। জীবনযাত্রার সঙ্গে এগুলো মিশে আছে ওতোপ্রোতোভাবে। বাঙালির আবহমান ইতিহাস ঐতিহ্যের সমন্বিত রূপ এই লোককাহিনিগুলো।

লোককাহিনির মতো আরও একটি সমৃদ্ধ শাখা লোকগাথা। ইংরেজিতে একে Ballad বলে। শব্দটি ফরাসি Ballet থেকে গৃহীত। যার অর্থ নৃত্য। একটি বিশেষ কাহিনি সুদৃঢ়ভাবে এতে স্থান করে নেয় বলে একে কাহিনি প্রধান রচনাও বলা চলে। ক্রিয়া বা Action এ সব গীতিকার প্রধান উপজীব্য। কাহিনির মাধ্যমেই গাথাগুলোর রস পাঠক বা শ্রোতার কাছে ফুঠে ওঠে। নাথগীতিকা, ময়মনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকা বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত গীতিকাগুলো মূলত এ কয় ভাগে বিভক্ত। শতাব্দীর পর শতাব্দী খেটে খাওয়া মানুষের মুখ থেকে মুখে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এগুলো টিকে আছে। গ্রামকে নিয়েই যেহেতু আমাদের অস্তিত্ব তাই পল্লী জীবনের সঙ্গে মিশে থাকা এসব উপাদান ফোকলোরের শেকড়ের সন্ধান দেয়। আমরা খুঁজে পাই বাংলা ও বাঙালির আবহমান ঐতিহ্য।

একজন ইংরেজ সমালোচক গীতিকারের মতে,

> "A ballad is a flok- song that tells a storz with stress on the crucial situation, tells it bz letting the action unfold itself in event and speech, and tells it objectivelz with little comments or intrusion of personal bias."[১১]

লোকসংস্কৃতির শেকড় থেকেই আবহমান জনসংস্কৃতির অংশ গড়ে উঠেছে। লোকসংস্কৃতিতে আবহমান মানুষের সমষ্টিগত মনের ছাপ বিদ্যমান। মানুষ যা কিছু উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করে তাই লোকসংস্কৃতি। গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে লোকসংস্কৃতি সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে। বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে যে সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয় সবই ফোকলোরের অংশ। সংস্কৃতি সম্পর্কে ড. ওয়াকিল আহমদ বলেন,

> 'জীবন ছাড়া সংস্কৃতির বিকাশ নেই। এ জীবন অচল, অবাক, অম হলে চলে না, সজীব, সবাক ও সম হওয়া আবশ্যক। প্রাণহীন জড় প্রকৃতির সংস্কৃতি নেই, প্রাণী হয়েও অচল, অবাক উদ্ভিদের সংস্কৃতি নেই।... মোট কথা সংস্কৃতি জীবনসম্পৃক্ত, বস্তু সংলগ্ন এবং মানস ফসল। সংস্কৃতি একাধারে জীবনযাত্রার নিয়ম-পদ্ধতি, যথা: আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, ধর্মকর্ম, প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ, শিক্ষাদীক্ষা, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি ; অন্যদিকে জীবনযাপনের যাবতীয় বস্তু ও উপকরণ, তথা-ঘরবাড়ি, খাদ্যদ্রব্য, আসবাবপত্র, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, বস্ত্র, অলংকার ইত্যাদি। তৃতীয়ত মানসফসল যথা সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, মূর্তি,

স্থাপত্য, ভাস্কর্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি। এসব কিছুর সমন্বয় হলো সংস্কৃতির সাধারণ পরিচয়।'[১২]

ফোকলোরের আরও একটি বিশেষ অংশ লোকশিল্প। এটি মূলত চারু ও কারুশিল্প নির্ভর। কামার-কুমার, কাঁসারি, তাঁতি, ঘরামি, গৃহশিল্প, আল্পনা, দেওয়াল চিত্র, মুখোশ, বাঁশ-বেত শিল্প, ডালা, কুলা, পাটি, নকশীকাঁথা, নকশী পাখা, সোনা রুপার বিভিন্ন অলংকার, পিঠা-পুলি, মাটির পুতুল এবং বিভিন্ন এলাকার বিখ্যাত জিনিসপত্র সবই লোকশিল্পের অন্তর্গত। আর এগুলো বৃহত্তর অর্থে সবই ফোকলোরের অংশ। লোকশিল্পের মতো লোকবিজ্ঞানও ফোকলোরের বিশেষ অংশ জুড়ে আছে। যার মধ্যে বাঙালির আদিমযুগ থেকে সভ্যতার আলোয় আসার পথে সব লোক বিজ্ঞানসম্পৃক্ত। গুহাবাসী মানুষ একসময় ছালবাকল পরে লজ্জা নিবারণ করতো। পাথরে পাথর ঘর্ষণের ফলে যে বিজ্ঞানের সূচনা তা আজও অব্যাহত তবে কালের পরিক্রমায় তার ব্যাপক পরিবর্তন সাধন হয়েছে। গ্রামীণ জীবনে যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হতো সবই লোকবিজ্ঞানের অংশ। লাঙল, মই, কোদাল, জোয়াল, গোখাদ্য সংরক্ষণের ভাঁড়া, বিভিন্ন রকম জাতা, হামানদিস্তা, ঘানি, বিভিন্ন ধরনের চুলা, গ্রামীণ চিকিৎসা সবই লোকবিজ্ঞান। বাংলা সাহিত্যের একটি বলিষ্ঠ অংশজুড়ে আছে ফোকলোর। যদিও বাংলাদেশে ফোকলোরের চর্চা বেশি দিনের নয়। উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের শুরুতে ফোকলোর সংগ্রহ ও সম্পদনায় মনোনিবেশ করেন পণ্ডিতগণ।

মানুষের মুখে মুখে প্রবহমান নদীর স্রোতের মতো ভেসে চলেছে ফোকলোরের নানামুখী উপাদান। ফোকলোর বাঙালির পরিচয়কে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। এর সঙ্গে আমাদের নাড়ির সম্পর্ক। মা যেমন সন্তানকে ভুলতে পারে না ঠিক তেমনি ফোকলোরের অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করলে বাঙালি জাতিসত্তাকেই অস্বীকার করা হয়। ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, লোকনাট্য, লোকসংগীত, লোকগীতিকা, লোককাহিনি প্রভৃতির সংমিশ্রণে একক সত্তা হিসেবে রূপলাভ করেছে ফোকলোর। ফোকলোর বাঙালি জীবনাচরণের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এগুলো বাঙালির চিরায়ত সম্পদ। গ্রামকে কেন্দ্র করেই আমাদের সভ্যতা গড়ে উঠেছে। পল্লী জনের সঙ্গে মিশে থাকা লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকবিজ্ঞান, লোকসংস্কৃতিই বাঙালির অস্তিত্ব। নগরজীবনের আড়লে যতই এগুলো চাপা পড়ে থাক। তবু শেকড়ের টান আমরা অনুভব করি প্রতিনিয়ত। সেদিক থেকে ফোকলোর মূলত বাংলা ও বাঙালির শেকড়ের আত্ম-অনুসন্ধান ও কালের বিবর্তনে তার রূপভেদ।

তথ্যপঞ্জি

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় সং, ১৯৬২, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, পৃ. ৫-৬
২. Alan Dundes, Floklore as a mirror of culture, National Council of teachers of english, 1996, p.471
৩. মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর পরিচিত ও পঠন- পাঠন, অবসর, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৮-১১
৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য দ্বিতীয় খণ্ড: ছড়া, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃ. ০১
৫. তদেব, পৃ. ৭৯
৬. তদেব, পৃ. ৮৩
৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য , বাংলার লোকসাহিত্য পঞ্চম খণ্ড: ধাঁধা, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃ. ০৪
৮. তদেব, বাংলার লোকসাহিত্য ষষ্ঠ খণ্ড : প্রবাদ, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ১-২
৯. তদেব, বাংলার লোকসাহিত্য তৃতীয় খণ্ড: গীত ও নৃত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৫৪, পৃ. ০৪
১০. তদেব, পৃ. ৬৯
১১. তদেব, বাংলার লোকসাহিত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৫৪, পৃ. ২৮১
১২. ড. ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ২-৩

এনইউবি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা
(Peer-Reviewed Journal)
ISSN : 2710-4451
বাংলা বিভাগ
নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২২

শহীদ কাদরীর কবিতা: নিঃসঙ্গতার অভিজ্ঞান

রাহিমা আকতার বিথী*

সার-সংক্ষেপ : শহীদ কাদরী যাপিত জীবনের যাবতীয় অবয়-স্খলন-পতন ও বিষাদ-নৈরাশ্য, ক্ষোভ-ক্রোধ-নিঃসঙ্গতা আক্রান্ত সংবেদী কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। মোট চারটি কাব্যের মধ্য দিয়ে বাংলা কাব্যাঙ্গনে প্রথিতযশা এ কবি তাঁর স্বকীয় আসনটিকে সুনির্দিষ্ট করে নিতে সক্ষম হন। মূলত যাপিত জীবনের প্রতি পদপে অনাস্থা, অবিশ্বাস, রিরংসা, রুগ্ণতা, জরা-জীর্ণতা, শঠতা, হীনতা-নীচতা, অশ্লীলতা, ঘৃণা-তাচ্ছিল্যবোধ, অবক্ষয়িত মূল্যবোধ, কেদ-গ্লানি, বীভৎস বিবমিষা, জিঘাংসা, হতাশা সহ সামূহিক নেতিবাস্তবতার সব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রসূত যে নিরাসক্ত নৈঃসঙ্গের উন্মেষ ঘটে কবিচিত্তে- কবিতায় সেই নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গতার নির্মেদ নিঃসরণের অনুসন্ধান প্রয়াস এখানে ক্রিয়াশীল। প্রবন্ধটি বাংলা ভাষার প্রমিত রীতিতে লিখিত হয়েছে এবং বানানের জন্য অনুসরণ করা হয়েছে বাংলা একাডেমি প্রণীত 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম'।

বাংলাদেশের আধুনিক কাব্যাঙ্গনে শহীদ কাদরী (১৯৪২-২০১৬) গুরুত্বপূর্ণ কবিব্যক্তিত্ব। মাত্র চারখানা কাব্য রচনা করে স্বীয় আলোকচ্ছটায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে আছেন স্বেচ্ছানির্বাসিত এ কবি। প্রথম কাব্য *উত্তরাধিকার* (১৯৬৭), তারপর যথাক্রমে তোমাকে অভিবাদন *প্রিয়তমা* (১৯৭৪), *কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই* (১৯৭৮) এবং *আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও* (২০০৯) কাব্য প্রকাশিত হয়। পাঁচের দশকের সমাপ্তিলগ্নে কবিপ্রতিভার উন্মেষ ঘটলেও উৎপূর্ণতা পায় ছয়ের দশকে। মূলত সমকালীন কবিতায় আধুনিকতা ও নাগরিক জীবনবোধের সংলিপ্ততার মধ্য দিয়ে শহীদ কাদরীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। পাঁচের দশক পরবর্তী বাংলাদেশের যেসকল কবির কবিতায় আধুনিক মনস্বিতার ছাপ ও শাহরিক তথা নাগরিক জীবনচৈতন্যের সুষম সংলেপন পরিলতি হয় তাঁদের মধ্যে শহীদ কাদরী অন্যতম।

* গবেষক ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী, বাংলা ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।

সমকালে অনিকেত চেতনার কবি-সম্প্রদায় প্রতিবাদমুখর হয়ে রুখে দাঁড়ান সকল বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে। মনন-সৃজনের সম্পৃক্ততায় গড়ে তোলেন নব-নব শিল্প-আন্দোলন। বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে এক নতুন ধারার উন্মেষ ঘটে ছয়ের দশকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে। লিটল ম্যাগাজিন কেন্দ্রিক এ সাহিত্য আন্দোলনের সাহিত্যিকগোষ্ঠী প্রচলিত নীতি ব্যবস্থাকে অস্বীকার করেন। কবিতাকে তাঁরা করে তোলেন সমকালের ইশতেহার স্বরূপ। স্যাড জেনারেশনের আন্দোলনের মূলে প্রোথিত শহীদ কাদরীর কাব্যচেতনার শিকড়। একজন উন্মুল সমাজ-শিল্পীর বিচণ বোধ তাঁর কবিতা-কলেবরের ভেতর-বাইরে নিহিত থাকে :

> পায়নিতো খুঁজে মিত্রতা কারও
> প্রাণের শ্রমের কান্তির শেষে শুয়ে,
> অথবা ব্যর্থ কালির আঁচড়ে কেঁদে
> বিবর্ণ ভোরে মাথা কুটে তার দোরে
> ফিরেছে আবার নরকের টানে
> অমোঘ প্রহরে একা,
> (শহীদ কাদরী, ২০১৭: ৫৬)

মূলত এমন কবিতাচর্চার মধ্য দিয়ে বাংলা আধুনিক কবিতার উৎকর্ষই সাধিত হয়। শহীদ কাদরী ও তাঁর কবিতা সম্পর্কে শিহাব সরকার অভিমত ব্যক্ত করেন এভাবে :

> শহীদ কাদরীরও (১৯৪২-২০১৬) বরাবর ছিলো এক অনন্য কবিতার ভুবন। তিনি অস্বীকার করেছিলেন সব প্রচলিত সংস্কার। তাঁর কবিতার পাঠক আবিষ্কার করেন সম্পূর্ণ অনাস্বাদিত এক থিম, যা ত্রিশের দশকের পর বাংলা কবিতায় দীর্ঘদিন অনুপস্থিত ছিলো। আমরা একে বলতে পারি আধুনিক মানুষের নৈঃসঙ্গ্য ও নিরাসক্তি। প্রচ্ছন্ন এক বিষাদ হিসেবেও একে অভিহিত করা যায়। (তদেব: ভূমিকা)

বাংলা আধুনিক কাব্যসাহিত্যে শহীদ কাদরীর কবিতার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় নিঃসঙ্গ রাতের নৈঃসঙ্গ্য আক্রান্ত চাঁদের দেদীপ্যমান জঙ্গমতাকে। সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা যখন মানবিকতা বহির্ভূত অবয়ের তামসে আচ্ছাদিত; তখন সেই বিপন্ন, বিষণ্ন, পরাধীন, রিরংসাপীড়িত সমাজবাস্তবতায় নিরাসক্ত নিঃসঙ্গ চাঁদের মতো যাযাবর হয়েই তিনি ঘুরে ফেরেন পৃথিবীর দেশ থেকে দেশান্তরে, স্বাত্ম-সংবেদের উপরিভাগ থেকে অন্তর্প্রদোষ পর্যন্ত। এভাবেই তাঁর নৈঃসঙ্গ্য চেতনা প্রবহমান থাকে স্বপ্ন নামের অলৌলিক সত্তার মধ্য দিয়ে, যার প্রমূর্ত রূপায়ণ তাঁর কবিতা :

> আজীবন লোকালয় থেকে আমি
> পালাতে চেয়েছি– অন্ধকারে টর্চের আলোর চেয়েও
> নির্ভরযোগ্য ভেবে জ্যোতিষ্মান পুষ্পরাজিকে,

মেধার চেয়ে অধিক মেধাবী ব'লে জেনেছি জ্যোৎস্নাকে।
(তদেব : ১৪৬)

মানুষ তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে মানুষ ও পৃথিবী সম্পর্কে প্রশ্নবোধ উত্থাপনের মধ্য দিয়ে। ফলে যে নৈঃসঙ্গ্যবোধ সম্বন্ধে ব্যক্তি তার জন্মলগ্নে ওয়াকিবহাল থাকে না, সেই নৈঃসঙ্গ্যবোধই প্রকটিত হতে থাকে প্রাত্যহিকজীবনচর্যায় প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে:

> শহীদ কাদরীর ব্যক্তিসত্তা এই বিচ্ছিন্নতা, নৈঃসঙ্গ্যবোধের চেতনা নিয়ে পরিদৃশ্যমান। অস্তিত্বের বিপন্নতা শিল্পসত্তার অন্তঃমূলে নিয়ে আসে অবরুদ্ধতা ও অনিকেত নৈঃশঙ্গ্যে ঈশ্বরবিহীন স্বাধীন মানুষ পালাতে থাকে সমাজ-সংস্কৃতি ও লোকালয় থেকে। (বায়তুল্লাহ কাদেরী, ২০০৯ : ৬৭)

আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বিবর্তনচক্রে সংবর্ত সমন্বিত সময়ে মানুষের বিচ্ছিন্নতা ও নৈঃসঙ্গ্যতা নিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্যক্তি মানুষ ক্রমশ আত্মস্বরূপকে উপলব্ধি করতে থাকে একজন নিজ গৃহে পরবাসী মানুষের অস্তিত্বসম। যার সাথে রিরংসাপীড়িত, মানবিকতাহীন, স্বার্থান্ধ, পোড়ো জমির [The Waste Land (1922)] এই পৃথিবীর কোনো আপাত সংলিপ্ততা দৃষ্টিসাম্যে ধৃত হয় না। শহীদ কাদরীর কবিতাকান্তিতে নৈঃসঙ্গ্যবোধের সেই অনুরণনই তাঁর শাণিত শব্দবুননের প্রাখর্যে প্রমূর্ত প্রতিমারূপে প্রতিভাত হয় :

হে নবীনা,
আমার তামাটে তিক্ত ওষ্ঠের ও অবয়বের জন্যে
যেসব চুম্বন জমে উঠবে সংগোপনে,
তাদের ওপর থেকে আমার স্বত্বাধিকার আমি ফিরিয়ে নিলাম
আমাকে শীতের হাওয়ার হাতে ছেড়ে দাও,
স্বনির্বাচিত এই নির্বাসনে
নেকড়ের দঙ্গলের মতো আমাকে ছিঁড়ে খাক বরফে জ্বলতে থাকা ঋতু
(শহীদ কাদরী, ২০১৭ :১৬০)

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাকে কবি স্বাত্মসত্তায় ধারণ করে নিজেকে পরিণত করেন নিরাসক্ত নৈঃসঙ্গ্যের একাকী দূর্গস্বরূপ। প্রতিনিয়ত কবি যেনো পলায়নব্রত পালন করেন স্বার্থান্বেষী পৃথিবীর আগ্রাসী জঙ্গমতা থেকে। নির্লিপ্ত কবি সাম্যহীন ধ্বংসের প্রতিচ্ছবি প্রতিভাসিত করে তোলেন কবিতায় গ্রথিত শব্দ, উপমা, প্রতীক, রূপক, চিত্রকল্পের সুষম সমন্বয়ের মাধ্যমে। এক নির্মোহ শূন্যতায় একাকী জীবনযাপনে কবি লীন হয়ে যেতে থাকেন ক্রমশ। নগর পঙ্কিলতার নষ্ট জরায়ু থেকে জন্ম নেওয়া শহীদ কাদরী বোদলেয়ারীয় [Charles Pierre Baudelaire (1821-1867)] প্রবণতা দ্বারা আক্রান্ত

হয়ে যাপন করতে চান বীভৎস একাকিত্ব, নিরাসক্ত নৈঃসঙ্গ এবং মানবিক পতন-স্খলনসহ সামূহিক নেতিবিশ্বকে।

নিষ্ঠুর বাস্তবতার নির্মমতা থেকে কবি নিজেকে সচেতন-সক্রিয়তায় গুটিয়ে রাখতে চান। ফলে তাঁর নৈঃসঙ্গ্য চেতনায় বারবার সম্মিলন ঘটে রোমান্টিকতা, মৃত্যুভাবনা নিরবচ্ছিন্ন শূন্যতার মতো বিষয়-আশয়ের। একান্ত আত্মগত অপরাধবোধ নিঃসৃত অনুশোচনা তাঁর অন্তর্সত্তাকে করে দগ্ধ-পীড়িত ও গ্লানিলিপ্ত:

পথে পথে আর পান্থশালায়
হয়ে গেল বড় দেরি
কাধে নিয়ে শব মৃত হরিণের
দুয়ারে দুয়ারে স্বপ্ন করেছি ফেরি
তোমার বাগানে মালাকার নেই
বাগানে ঝরছে চেরি
দরোজা জানলা বন্ধ সকলই
হয়েছে কি খুব দেরি ?
(তদেব :১৬৯)

মূলত বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে ক্রমবর্ধমান নৈতিক অবক্ষয়, অমানবিক জিঘাংসা, জাতি-ধর্মকেন্দ্রিক বিশৃঙ্খলা, বর্ণবিদ্বেষী হিংস্রতা তথা সামগ্রিক জীবন পরিচালন প্রক্রিয়ার বিপর্যস্ত রূপ কবি সহজ-সাবলীল যাপিত জীবনের অনুষঙ্গ হিসেবে মেনে নিতে পারেন না। একারণেই কবি ক্রমশ নৈঃসঙ্গ্যভাবে আবিষ্ট হতে থাকেন। আর এই নিঃসঙ্গতার বহুমুখী বিস্ফোরণ তাঁর কবিতায় প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। উত্তরাধিকার কাব্যের 'বৃষ্টি বৃষ্টি' কবিতায় কবির ব্যক্ত মনোভাব :

এইক্ষণে আঁধার শহরে প্রভু, বর্ষায়, বিদ্যুতে
নগ্নপায়ে ছেঁড়া পাৎলুনে একাকী
হাওয়ার পালের মতো শার্টের ভেতরে
ঝকঝকে, সদ্য, নতুন নৌকোর মতো একমাত্র আমি,
আমার নিঃসঙ্গে তথা বিপর্যস্ত রক্তমাংসে
নূহের উদ্দাম রাগী গরগরে লাল আত্মা জ্বলে
কিন্তু সাড়া নেই জনপ্রাণীর অথচ
জলোচ্ছ্বাসে নিঃশ্বাসের স্বর, বাতাসের চিৎকার,
কোন আগ্রহে সম্পন্ন হয়ে, কোন শহরের দিকে
জলের আহাদে আমি একা ভেসে যাবো?
(তদেব :২৫)

এটা সর্বজনবিদিত যে, ছয়ের দশকের বিভীষিকাদীর্ণ তমসাচ্ছন্ন সংকটকালে নিঃসঙ্গবোধে ভারাক্রান্ত হওয়া ভিন্ন অন্য কোনো পথ উন্মুক্ত ছিল না সমকালীন কবিদের

সম্মুখে। অবরুদ্ধ ব্যক্তিস্বাধীনতার নর্দমায় তাঁরা স্বতন্ত্র সত্তাকে পর্যবেণ করেন ছিন্ন-ভিন্ন, খণ্ডিত-বিখণ্ডিত রূপে। অনন্যোপায় অন্ধ সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার বিকৃতরূপ নাগরিক জীবনকে লাগামহীন অনৈতিক ভোগলিপ্সার বাসনাদেবীতে রূপান্তরিত করে তোলে। অন্যদিকে মননসমৃদ্ধ কবিকুলকে বিকারগ্রস্ত ছন্নছাড়া দর্শক হিসেবে স্বেচ্ছানির্বাসনের জরাজালে বন্দি করে রাখে। কবি নিজের অন্তর্প্রদোষের নৈঃসঙ্গ্যকে জীবনানন্দ দাসের (১৮৯৯-১৯৫৪) মতোই 'অদ্ভুত আঁধার এক' এর মাঝে আবিষ্কার করেন নিরাসক্ত নির্লিপ্ততার মধ্য দিয়ে। যে অন্ধকারে শহরে 'বর্ষা', 'বিদ্যুৎ' সমান্তরালভাবে উপস্থিত। বিবমিষাগ্রস্ত নাগরিক জীবনের রূঢ় বাস্তবতায় নিঃসঙ্গ কবি নিজেকে অবলোকন করেন 'নগ্নপায়ে ছেঁড়া পাৎলুনে' আর যেখানে কবির আত্মা জ্বলতে থাকে 'নিঃসঙ্গ তথা বিপর্যস্ত রক্তমাংসে নূহের উদ্দাম রাগী গরগরে লাল আত্মা' স্বরূপ।

শহীদ কাদরীর নিঃসঙ্গতার অনুভবের বর্ণনাত্মকভঙ্গির দৃশ্যপট সমেত আবির্ভাব হলো 'জানলা থেকে' কবিতাটি। পরাবাস্তবতার আচ্ছাদনে কবি তাঁর মর্মনিহিত শূন্যতা, তাঁর আত্মিক টানাপড়েনকে যেভাবে প্রতিভাসিত করেন– সেখানে এক শূন্যতা পরিকীর্ণ নিঃসঙ্গ কবির আর্তনাদ উচ্চকিত হয়ে ওঠে। ছয়ের দশকের কালিমালিপ্ত সময়ে বাঙালির সকল গৌরব-গরিমা একে একে ম্লান হয়ে ক্রমশ লীন হয়ে যেতে থাকে, কবি সেই হৃতসর্বস্বতার প্রতীক রূপেই 'ত্রস্ত ভিত ঘোড়ার কঙ্কাল' এর আবাহন ঘটান কবিতায়। নৈতিক অধঃপতন, রুচির বিকৃতি, মানবিক সত্তার পচন সমকালে বিগতকালের সকল নিমজ্জমান গ্লানিকে পুনর্জাগরিত করে তার সকল সীমারেখা উৎক্রম করে ফেলে। আর এই জরা-জঙ্গমতা কবিকে দৈশিক এবং বৈশ্বিকভাবে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন মানবাত্মায় পরিণত করে :

আর আমি অপরিসর শয্যার চৌদিকে
অস্তিত্বের সীমা টেনে
দীর্ঘশ্বাসের কালোফুলে সাজাবো স্মৃতির বাসর!
নিঃসঙ্গতাকে যৌবনের পরম সুহৃৎ জেনে
তার সহোদরা কান্নার বাহুবন্ধে সঁপে দেবো
স্বপ্নের সত্য আর সত্তার সার
এবং আমার জানলা থেকে
নিরুপায় একজোড়া আহত পাখির মত চোখ
রাত্রিভর দেখবে শুধু
দূর দর-দালানের পারে
আবছা মাঠের পর নিঃশব্দে ছিন্ন ক'রে জোনাকির জাল
ছুটে গেলো যেন এক ত্রস্ত ভীত ঘোড়ার কঙ্কাল!
(তদেব : ৩৬)

নিঃসঙ্গ কবির তমসাচ্ছন্ন পরিপার্শ্ব ক্রমশ নিমজ্জিত হতে থাকে নিবিড় কৃষ্ণ গহ্বরের গহীনতম প্রদোষে। যেখানে নিপতিত কবির একমাত্র সঙ্গী হয় দীর্ঘশ্বাস ও নিঃসঙ্গতার যুগলবন্দি নিরবচ্ছিন্নতা। একারণেই কৈশোরের প্রাণোচ্ছল স্মৃতিবিজড়িত দিনগুলো হয়ে যায় 'দীর্ঘশ্বাসের কালোফুল', আর নৈঃসঙ্গ্যদীর্ণ দৈনন্দিন জীবন হয়ে ওঠে 'যৌবনের পরম সুহৃৎ'। শাশ্বত শ্রেয়বোধ ক্রমশ নিঃশেষিত হতে থাকে সমকালের প্রবল নৈরাজ্য আর সামাজিক অবয়ের সংরব্ধ সান্নিধ্যে এসে। নিঃসঙ্গ মানবাত্মার নীরব বেদনা ভারাক্রান্ত কান্নার অনুরণন শ্রুত হয় শহীদ কাদরীর কবিতায় সৃজিত শব্দের ঝংকারে। ভোগলিপ্সামগ্ন রগরগে নগরীর লীলানিকেতন কবির যাপিত জীবনে আনন্দের লেশমাত্র এনে দিতে পারে না। তাই তো বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতাই তাঁর পরম সুহৃদে পরিণত হয়। কবির জীবনদেবতার আসনে সমাসীন হয় এই নিরবচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গতা। 'সমকালীন জীবনদেবতার প্রতি' কবিতায় কবির ব্যক্ত মনোভাব :

কবির নিঃসঙ্গতা নয়, প্রেমিকের নিঃসঙ্গতাও নয়,
কেননা গোলাপ কিংবা দয়িতার আসঙ্গে মরে না
জলোচ্ছ্বাসে নাচে না সে, বৃষ্টিতে ভেজে না, তবু যেন
আমারই কুটুম্ব কোন ভাবেসাবে পরম বান্ধব,
শূন্যতার অদ্ভুত আদল যেন দেখা-না-দেখায় মেশা
ঝুলে থাকে মাঝরাতে রেস্তোরাঁর কড়িকাঠ থেকে,–
বাদুড় না বেলুন বন্ধু, স্বপ্ন না হতাশায় ঠাসা?
ভোজনরসিক যদি, নাও তবে জ্বলজ্বলে আত্মাটিরে আমার!
তোমারই ত' পরামর্শে আমি শুয়ে থাকি
যে বিছানায়, কবরের মতো রুক্ষ আর ছোট তার প্রসার,–
(তদেব :৪২)

শহীদ কাদরীর কবিতায় উপমার অন্তর্লীন হয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে তাঁর নিঃসঙ্গ অস্তিত্বের ভয়াবহ বেদনার্ত রূপ। শূন্যতার অদ্ভুত চেহারা ঝুলন্ত 'বাদুড়', 'বেলুন'প্রভৃতি উপমায় কবির কবিতায় প্রায়শই দৃষ্টিসীমায় ধৃত হয়। অমরাবতীর সকল প্রাপ্তি, অমৃতবারির মাঝেও যে সত্তার অবিচ্ছিন্ন সারথি হিসেবে নিঃসঙ্গতার নির্মমতা উপলব্ধ হতে পারে- তেমন রূপই কবিতাচরণে ক্রমবিন্যাস্ত রূপে গ্রথিত হতে থাকে তাঁর কবিতায়। কবির দার্শনিক প্রত্যয় এমন এক নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গতার প্রতি অনিমেষ মনোসন্ধিতে আবদ্ধ থাকে যে- তা বৃষ্টি কিংবা জলোচ্ছ্বাসে ভেজে না বা নাচে না, আর কবি পরম ঐকান্তিকতা নিয়ে যেনো বারংবার সেই নিঃসঙ্গতাকেই বরণ করে নিতে চান। কেননা কবি শাহরিক জীবনের কলুষিত যাপন ব্যবস্থার সাথে সহমত প্রকাশ করতে নারাজ, স্বার্থপর জীবন-জৌলুসের সান্নিধ্য পেতে নাখোশ, তারচেয়ে বরং নিঃসঙ্গতার সহচর সান্নিধ্যই কবির

পরম আরাধ্য। এভাবেই সভ্যতার উপরিভাগের যে আরাম-আয়েশের পসরা মানুষকে মনুষ্যত্বহীন করে তোলে, একে অন্যের প্রতি ঈর্ষাকাতর, হিংস্র করে তোলে- কবি সচেতন প্রয়াসে নিজেকে সেই সংঘবদ্ধতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। নিঃসঙ্গতাজাত হতাশাকেই কবি শুদ্ধতম নন্দনসৌকর্যে বিন্যস্ত করে স্বতন্ত্র জীবন পরিসীমায় সুখী থাকার ঈপ্সিত বাসনায় নিমগ্ন থাকেন:

আমি ত' চাই নি কখনও পাঁচ শ' সুন্দরী কিংবা হারেম,
ক্রীতদাস ক্রীতদাসী মনোরম রাজ্যপাট, গোপন বাগান
প্রোজ্জ্বল গালিচা আর মুক্তাখচিত কোন মখমল লেবাস
নেকাব সরিয়ে কোন ইহুদি রমণীর মুখ, দামী আসবাব

বরং কুঞ্চিত ভ্রু বিরক্তি আর উৎকণ্ঠায় ভরা,
ভেবেছি তুমিই আমার পরম রমণীয় ঝাড়বাতি
রাশি রাশি সোনার মোহর ভর্তি রূপালি এক ঘড়া,
দেখা দেবে মাঝরাতে মন্ত্রে-তন্ত্রে ভরা চন্দ্রের মতন
অথবা বাড়াবে মুখ, উৎসুখ জানালা বেয়ে সলাজ উদ্ভিদ।
(তদেব : ৪৩)

নৈঃসঙ্গ্যের এমন নির্মেদ ওস্বতঃস্ফূর্ত নির্মাণ কুশলতায় শহীদ কাদরীর প্রাতিস্বিক প্রাখর্যগুণ সর্বসময়ে প্রকটিত হয়ে ওঠে। মূলত বাংলা কবিতায় নিঃসঙ্গতা যে নিপাট হাহাকারের বিষয় হিসেবেই চিত্রিত হতো, সেখানে তার সঙ্গে আশয় হিসেবে কবি সংযোগ ঘটিয়ে দেন নান্দনিক রূপের তাৎপর্য। ফলে নবরূপা নৈঃসঙ্গ্যের সান্নিধ্য লাভের আকাড়াও পর্যবসিত হয় ঈপ্সিত বাসনায়।

কবি অন্ধকারের যাত্রী হয়ে জীবনকে আর্তনাদের সহচরী করে সমগ্র জীবন অতিবাহিত করতে চান। তেমন জীবনই কবির আরাধ্য, যে জীবন সত্যাসন্ধ সন্তের, দার্শনিকের। মোহগ্রস্ত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আবর্তনের সাথে কবি নিজেকে যুতসই সাহজিকতার সূত্রে সংলিপ্ত করতে পারেন না। জন্মলগ্নে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে দুর্বিষহ আতঙ্ক কবির প্রিয় মাতৃভূমিকে নিকষ কালো ধ্বংসাত্মক প্রতিবেশের মধ্যে নিপতিত করে, সেসব স্মৃতিচিহ্ন থেকে কবি কিছুতেই নিজেকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন না। দেশভাগের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক পটভূমি, মন্বন্তর-মহামারী, জরাজীর্ণতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভীষিকাময় ক্ষত, নিয়ত একাকিত্বের যন্ত্রণায় কবিকে করে তোলে ডানাভাঙা আহত পাখিসম কাতর। সেই কাতরতার সাথে যুক্ত হয় স্বদেশের পরাধীনতার ঐতিহাসিক কালবৃত্তি- আত্মদ্বন্দ্বে দ্বৈরথ কবি রোমন্থিত স্মৃতিতাড়না ও নষ্ট সময়ের প্রতিবাদমুখরতায় বারবার আত্মসত্তাকেই করে তোলেন প্রশ্নবিদ্ধ। স্বীকারোক্তির অবয়বে নির্মাণ করেন অসীম শূন্যতার নিঃসঙ্গ চিত্ররূপ:

... হরিদ্রাভ আকাশের ওষ্ঠে জমে ওঠা
আমি কি হঠাৎ কোন পথভ্রষ্ট চুন?

দৈবাৎ বিশ্তি এই বিশ্বলোকে
মুহ্যমান নগরশীর্ষে
লুটিয়ে পড়া এক নির্বাসিত কেতন
অথবা শূন্যতার সৌরগলার নত্রোচ্ছল বমন ?
(তদেব :৫৮)

নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গ শহীদ কাদরী স্বাধীনতার কাঠামো দেখেছেন ঠিকই, তথাপি পূর্ণতার কোনো অবয়ব সেখানে খুঁজে পাননি। অর্থাৎ তাঁর স্বীয় নিঃসঙ্গতা এবার গ্রাস করে সমষ্টির পরিব্যাপ্তিকে। তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা কাব্যে নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্নতার প্রতিমূর্তি সর্বসম্মুখে প্রমূর্তরূপে প্রতীয়মান। জনসম্মুখে অগ্রসরমান কবি স্বাধীনতার নবরূপায়ণে নিঃসঙ্গতার মাত্রাকে প্রতিস্থাপিত করেন মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত স্মৃতি বিজড়িত সৌধউচ্চতায়। আশা-নিরাশার যুগপৎ সম্ভাবনায় আপামর জনতার সামনে কবি স্বাধীনতার রক্তিমসূর্যকে বিকশিত করে তোলেন। অন্যদিকে নিজের একান্ত নিঃসঙ্গতাকেও স্বাধীনতার সাথে যৌথযুগপৎভাবে সূত্রবদ্ধ করে দেন। স্বাধীনতার শহর কবিতায় কবির ভাষ্য :

স্বাধীনতা, তোমার জরায়ু থেকে
জন্ম নিলো নিঃসঙ্গ পার্কের বেঞ্চি,
দুপুরের জনকল্লোল
আর যখন-তখন এক চক্কর ঘুরে আসার
ব্যক্তিগত, ব্যথিত শহর, স্বাধীনতা!
(তদেব :৮৫)

আধুনিক বিশ্বের ক্ষয়িষ্ণুতার মাঝে মানুষ ক্রমশ নৈসঃঙ্গ্যের অতল গহ্বরে নিপতিত হয়, মানব নৈঃসঙ্গ্যের এমতাবস্থাকে সিগমুন্ড ফ্রয়েড [Sigmund Freud (1856-1939)] লিবিডোর মাঝে উপলব্ধি করেন। মূলত এখানেই দ্বিধা-দ্বৈরথের সংশয় দাঁনা বেধে ওঠে শহীদ কাদরীর কবিতায় জারিত নিঃসঙ্গতার সঙ্গে। কেননা একজন মানুষ শূন্যতাকে জীবনদেবতার মর্যাদায় অভিষিক্ত করলেও তাঁর অন্তর্ভুবনে প্রতিনিয়ত তাড়না সৃষ্টি করে হাজারও বৈচিত্র্যময় উপলব্ধি। কেবল নিখাদ শূন্যতাকে আশ্রয় করে কেউ যাপিতজীবনের বহুমুখী অভিঘাতের মাঝে টিকে থাকতে অপারগ। তাই শূন্যতাকে জীবনদেবতা করলেও কবির কবিতায় বহুমাত্রিক সেসব উপলব্ধির শিঞ্জনও শিহরণ তুলে যায়। নিতান্ত গাঠনিক সমাধানের মধ্যে তাঁর অনুভূতির ভিত্তি স্থাপিত নয়, বরং বহুবর্ণিলতার মাঝেই তার উন্মীলনক্রিয়া পূর্ণতা পায়। নান্দনিক উৎপূর্ণতার সেই

নিঃসঙ্গচিত্রকে লিবিডোচেতনায় প্রতিভাসিত করে রোমান্টিক প্রেতি সৃজন করেন মননসমৃদ্ধ কবি। কবিতায় ঘটে তার ঋদ্ধ প্রকাশ। এখানে যথাক্রমে 'অলীক' ও 'শূন্যতা' কবিতা থেকে কবির মনোভাব উৎকলন করা হলো :

১. একটি নর্তকীর নাচ তার অন্তিমে
পৌঁছানোর আগে, দশল কথার ঝনৎকারে
বোঝা যায় আমি আর একা নই
এই সুন্দরতম শহরে
(তদেব : ৪১)

২. এখন যখন সকলি শূন্য কোথাও কিচ্ছু নেই
এক্ষনি আমি চাই
চক্ষেবক্ষে মহিলা তোমার সোনালী চুলের ঝাপটা
কেটে যাক এই হতাশাদীর্ণ মৃত ও শীর্ণ কৃশকায় কালো রাতটা।
(তদেব :১৭৪)

উল্লিখিত 'একটি নর্তকীর নাচ' অথবা 'মহিলা তোমার সোনালি চুলের ঝাপটা'র শিহরণের মধ্য দিয়ে কবি তাঁর নিঃসঙ্গতাজনিত সমূহ হতাশাকে বিলীন করে দিতে উদ্যত। অসীম শূন্যতার সীমাহীন ভারাক্রান্তি কবির সহ্যসীমা অতিক্রম করে ফেলে এ পর্যায়ে। তাই তো যৌবনের যে নিঃসঙ্গতাকে কবি সংশপ্তক রাজাধিরাজের জয়ধ্বজা স্বরূপ বরণ করে নেন, প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে তা আর একই শৌভিক দার্ঢ্য নিয়ে কবির উপলব্ধিকে আন্দোলিত করে তোলে না। তখন যুক্তিনিষ্ঠ সর্বজ্ঞ কবির জীবনসঞ্জাত অভিজ্ঞান হলো : 'এখন যখন সকলি শূন্য কোথাও কিচ্ছু নেই', অর্থাৎ কবির মনন নিঃসৃত অনুধাবন এটাই যে, নিঃসঙ্গতার এই দীর্ঘ পরিব্রাজন অভ্যন্তরীণভাবে তাঁকে সংরব্ধ সংকীর্ণতা ও জনবিচ্ছিন্নতা ব্যতীত জীবনচর্যার পরিধিতে কোনো ইতিবাচকতার দ্বার উন্মোচন করেনি।

১৯৭৮ সালের পরবর্তী সময়ে কবি স্বদেশ বিচ্ছিন্ন বিদেশ-বিভূঁইয়ে থেকে যে দীর্ঘ একাকিত্বের জীবন অতিবাহিত করেন- তা কেবলই নীলকণ্ঠের মতো নির্ভেজাল গরল পানের সদৃশ। যা কবিকে কান্ত-শ্রান্ত-তন্দ্রাচ্ছন্ন করে কিন্তু শান্তি প্রদায়িনী ঘুমের পরশ বোলাতে পারে না। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রাত্যহিক জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই তিনি আর নিঃসঙ্গতার নির্নিমেখ দৃষ্টিপাত প্রত্যাশা করেন না। নিঃসঙ্গতার আসঙ্গলিপ্সা তাঁকে দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখুক তা আর কবির কাম্য নয়। কবির মনোবাসনা থেকে নিঃসঙ্গতার সকল মোহমায়া দূরীভূত হয় :

প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্যে
অন্য এক উল্লাস-মত্ত পতাকার নিচে

এই যে নতজানু নির্বাসন– কাম্য নয় আর
প্রেম থেকে অপ্রেমে
ধর্ম থেকে ধর্মান্ধতায়
প্রগতি থেকে প্রতিক্রিয়ার মধ্যযুগীয় আবর্তে
চুম্বন থেকে চুম্বনহীনতায়
জীবনের ওপারে কোনো অন্তহীন কফিনে
এই যে নির্বাসন
আমার কাম্য নয় আর,
কোনো নির্বাসনই কাম্য নয় আর।
(তদেব :১৭৭-১৭৮)

শহীদ কাদরীর কবিতায় বিচ্ছিন্নতা, শূন্যতা, একাকিত্ব, নৈঃসঙ্গ্যের রূপকল্প এভাবেই ভাষিক প্রতিকৃতি লাভ করে।

শহীদ কাদরী এমন ভীষণ বিভীষিকাময় নৈঃসঙ্গ্যের মধ্য দিয়ে যাপিত জীবন অতিবাহিত করেন- যেখান থেকে তিনি উপলব্ধি করতে থাকেন যে; তাঁর সকল প্রিয়জন, তাঁর সুহৃদ-স্বজন-বন্ধুরা, এমনকি তাঁর চেনা প্রকৃতি পারিপার্শ্বিকতাও তাঁকে পরিত্যাগ করেছে নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততায়। 'সবাই তাকে ছেড়ে গেছে' কবিতাটির মধ্যে কবির সেই বোধের প্রতিফলন প্রতিচিত্রিত হয়ে ওঠে। অনিবার্য কারণেই সম্পূর্ণ কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

'মরুক খরায় এই ব্যাটা অকাল কুষ্মা- !'
মেঘ বললো, 'ওকে আমি কোনোদিনও বৃষ্টি দেবো না।'
তাল ঠুকে চিৎকার করে উঠলো বাতাস, 'ওর
ঘর্মাক্ত শরীরে চুলে অথবা চিবুকে মহিলার নরম স্পর্শের স্বাদ
আমি কখনো দেবো না'
ঠিক তুনি পূর্ণিমা নিভিয়ে
রাত্রি উঠলো হেঁকে, ঘুরুক, ঘুরতে থাকুক বেয়াড়া, বেয়াদপ এই লোকটা
জিপসিদের মতন, ওকে আমি তাবু ফেলার নিঃশব্দ কোনো জ্যোৎস্নালোকিত
প্রান্তর দেবো না; দেবো না সুনিদ্রা, স্বপ্ন, নিরাপদ ঘর।
ভোরবেলার সূর্যের উজ্জ্বল মুখে সেই একই প্রতিধ্বনি, 'ওর
মেদ-মাংস-মজ্জা আমি রান্না করে নেবো রৌদ্রে
অথবা বিঁধবো ঠিক বল্লমের মতো; 'ওর মাথার ওপর
ধারালো বঁটির মতো হানবো বৈশাখ'।
শতহাতে করতালি বাজিয়ে তরঙ্গ ভরা নদী
নিপুণ নটীর মতো নেচে নেচে উঠলো বলে, 'ওর জন্যে
তৃষ্ণার পানীয় আমার কাছে নেই'
নিরবধি কাল পিতামহ– ঘড়ির মতন ঘন্টা নেড়ে নেড়ে
বলে উঠলো নিস্পৃহ গলায়, এই ব্যাটা অকালকুষ্মান্ড
বজ্জাত, মাতাল তবু রাত্রির নদীতে ভাসা ও তরঙ্গে কেঁপে ওঠা
সারি সারি নৌকোর লণ্ঠনের মতো ঝলমলে

কিছু কবিতার পঙক্তি লিখে রেখে
কোথায় যে চলেছে কে জানে।
কেউ বলে কীর্তিনাশার কালো জলে
যাযাবর এই লোকটা ডুবে গেছে নিঃশব্দে
ওর কণ্ঠস্বর আর শুনবে না কেউ কোনোদিন।
(তদেব :১৭১-১৭২)

প্রতিকূল সমাজ-প্রতিবেশে সহজাত জীবন পরিচালন প্রক্রিয়া যখন নিয়ত ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হতে থাকে, তখন কবি প্রচলিত সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির সামগ্রিক অসাড়ত্বকে বাড়ময় করে তোলেন কবিতা-আয়ুধের মাধ্যমে। অবাঙমানসগোচরে থাকা অনুভবেরও প্রাঞ্জল প্রস্ফূটন পরিলক্ষিত হয় কবির কবিতায়। স্বেচ্ছানির্বাসনের বেদনাবিধুর সময়গুলোতে নিঃসঙ্গতার আধিক্য ও ভয় কবিকে আদ্যপান্ত এমনভাবে আঁকড়ে ধরে যে, কবির মনে হতে থাকে চার দেয়ালের মাঝে নিভৃতবাসে অভ্যস্ত কবি মৃত্যুর সময়ও তাঁর একান্ত আপন প্রিয় সত্তাসারথির শেষ চুম্বন-স্বাদ ব্যতিরেকেই চরম নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গতার মধ্য দিয়ে মহাকালের মহাশূন্যতায় পাড়ি জমাবেন! 'অপেক্ষা করছি' কবিতায় কবির ভয়দীর্ণ মনের শঙ্কাচিত্র এমন :

সকাল সাতটায় তুমি বেরিয়ে গেছো,
এখন বিকেল পাঁচটা। তবে কি আমাদের আর
দেখা হবে না কোনোদিন ?
... ...
টুইন টাওয়ারে যেদিন বিমান আক্রমণ হ'লো
সেদিন তুমি নিউইয়র্কে।
আর গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর সময়
আমি কলকাতায়। প্রায় আজীবন
বিচ্ছেদভারাতুর আমি।
বেরিয়েছো সেই সাত-সকালে
এখনও ফেরার সময় নেই।
মৃত্যুর আগে প্রত্যেকেরই প্রাপ্য
একটি শেষ চুম্বন- আমি কী তাও পাবো না!
(তদেব :২০২)

মূলত ক্রমবর্ধিত বয়সের কান্তি, নির্বাসিত জীবনের অবসাদ ও নিঃসঙ্গতা, স্বদেশের জন্য নিষ্ফল ব্যাকুলতা এবং জীবনসায়াহ্নে ব্যাধির অবিরাম সান্নিধ্য কবিকে ক্রমশ ভয়বিহ্বল ও আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে।

কবির প্রথম কাব্য উত্তরাধিকার থেকে বাংলা কাব্যসাহিত্যে তাঁর যে আবাহন, তা একদিকে যেমন সমাজ-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত তথা সমকালীন দৈশিক ও বৈশ্বিকাঙ্গনে

সংঘটিত বহুমাত্রিক অস্থিতিশীলতার দিকচিহ্ন নির্ণয় করে, তেমনি সেখানে পরিব্যাপ্ত থাকে-এক নৈঃসঙ্গ্যে নিমজ্জমান আত্মভুক মানুষের হতাশা-শুন্যতা-বিচ্ছিন্নতার সরল-অকপট স্বীকারোক্তি। তাঁর শেষ কাব্য *আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও* এর কবিতার মাঝেও কবির অতৃপ্ত মনোবাসনা ও নিজস্ব একটি সুনির্দিষ্ট ঘর খুঁজে ফেরার তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে :

পৃথিবীকে মায়াবী নদীর তীরে এক দেশ ব'লে
আমারও হয়েছে মনে'
কিন্তু আমি
সেখানে আমার গাঁ কিংবা শহর
কিংবা বাড়ি কিছুই এখনো খুঁজে পেলাম না।
(তদেব :১৯৭-১৯৮)

শিল্পসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রয়াসে রত কবির কবিতায় বিষয় হিসেবে নির্বাচিত হয় নৈঃসঙ্গ্য, আর তা প্রকাশে জড়ো হয় বিচ্ছিন্নতার একরাশ শব্দবন্ধ। এই বিচ্ছিন্নতা বিজড়িত শব্দবন্ধের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করলেই অনুধাবন করা যায় একজন স্বকাল সচেতন মানুষের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রণা, মর্মপীড়া ও সত্তার দৃতাজনিত ক্রন্দন কতটা তীক্ষ্ণ-তীব্র হৃদয়বিদারী হতে পারে। নাগরিক চিন্তার গহীনে বোদলেয়ারের ক্লেদজ কুসুম [Les Fleurs du Mal (1857)]এর মতো সুন্দরের ভেতরের অসুন্দরের প্রস্ফূটন এবং সেই অগোছালো অসুন্দর, কলুষ-কুৎসিতের মাঝে জীবনযাপনের উল্লাস তাঁর কবিতার স্বরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন স্বদেশকে বারবার নৈতিক অবক্ষয় ও ধ্বংসের দিকে ধাবিত হতে দেখে ক্রমশ কবিতায় হয়ে ওঠেন হতাশা, ক্লেদ-কীন্নতা, বীভৎস-বিবমিষার নিঃসঙ্গ রূপকার; হন ভিনদেশে পরবাসী। মূলত বিশ্বরাজনীতির অভ্যন্তরীণ শঠতা, স্বার্থপরতা একজন মননঋদ্ধ শিল্পীকে ও একজন সাধারণ মানুষকে কীভাবে আত্মগ্লানির নিগূঢ় তলদেশ থেকে পরিত্রাণ পেতে দেয় না- তা কবির উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> যে কোন দেশ বা জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক জীবন নানান সময়ে অবয়ে কবলিত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু সে কালের যে কোন লেখকই যে অবয়কে ধারণ করতে পারবেন এমন নয় এমনকি কবি হিসাবে শক্তিমান হলেই যে তিনি ঐ অবয়ের নায়ক হয়ে বসবেন তাও নয়। আমার ধারণা, এক ধরনের বিশেষ মানসিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিল্পী কেবল হয়ে ওঠেন অবয়ের শিল্পী, সে যুগের ক্লেদ ও পাপের রূপকার, যুগের ভেঙে পড়া মূল্যবোধের নিঃসঙ্গ ও অশ্রুময় সন্তাপকারী।
> (আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ২০০২ : ৭৬)

স্বদেশ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত কবি স্বভূমির প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি, শিল্পের প্রতি সত্যনিষ্ঠা ও দায়বদ্ধতা থেকে বৈশ্বিক আগ্রাসনের জিঘাংসা-হীনমন্যতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চান অথচ জাগতিক সমূহ সম্পর্ক-সম্বন্ধ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েও তিনি নির্নিমেখ আর্দ্র দৃষ্টি প্রসারিত রাখেন তাঁর স্বদেশের দিকেই। পুনরায় অপশাসনের বিরুদ্ধে উচ্চকিত শব্দমুখরতায় প্রমূর্ত হয়ে ওঠে তার কবিতাপ্রেয়সী। স্বদেশভূমির প্রতি তীব্র আবেগপূর্ণ ভালোবাসার বয়ানে তাঁর কবিতা ফের হয়ে ওঠে নিঃসঙ্গ কবির প্রাণের বেদনার্ত অথচ দার্ঢ্য চারণভূমি :

১. জলের দিকে জল ভেসে যায়
হাওয়ার দিকে হাওয়া।
তাকিয়ে থাকি, চোখ চলে না
সমুদ্দরের পারে,
একা-একা একলা অন্ধকারে
আমার আছে কেবল নৌকো বাওয়া।
(তদেব : ১৮৯)

২. ... তবুও আমার
গানগুলো ঠিক পোষা পায়রার মতো
পৌঁছে যাবেই চিরচেনা সেই
বিষাদলিপ্ত প্রদীপদীপ্ত বাংলার রাঙা
ঘাটে-ঘাটে মাঠে-বিলে।
বিজন বিভূঁইয়ে নতজানু হয়ে একা একা আমি রয়ে যাবো বিব্রত।
(তদেব : ১৮২)

এভাবেই আত্মভুক কবির নিঃসঙ্গতা ধূলিমলিন আর্তনাদের জরায়ু চিরে তীব্র-তীক্ষ্ণ হাহাকারধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। কবির শিল্পচৈতন্যের এমন বিচ্ছুরণ তাঁর নৈঃসঙ্গ্যবোধ প্রসূত সকল যন্ত্রণাকে অমৃতে রূপান্তরিত করে। স্বতঃস্ফুর্ত লেখনীর ঘোর লাগা উদ্দাম বিলাসী হাওয়ায় বাংলা কবিতাকে অভিনব সজ্জায় প্রতিভাসিত করে তোলেন স্বীয় অভিজ্ঞান আলোকে।

৬.

শহীদ কাদরী অনুভূতিপ্রবণ কবি। তথাপি যুক্তির সীমারেখাকে উৎক্রম করে যান না। বরং কবির কাছে কবিতা তাঁর সামগ্রিক আবেগ-অনুভূতি-অভিজ্ঞানের আয়ুধ। রাষ্ট্রব্যবস্থার উপরিকাঠামোতে থাকা সমাজ-জীবনকে তিনি নিপাট নিরাসক্তিতে নাকচ করে দেন। শহরের আপাত ঝলমলে কিংবা ব্যস্ততম মানুষের দৈনন্দিন কাতার থেকে তিনি নিজেকে সচেতনভাবে দূরে রাখেন। বরং যাবতীয় কেদ-পঙ্কিলতাকে সেই

জীবনচর্যা থেকে উৎকলন করে আড়ম্বরপূর্ণ সমাজব্যবস্থার মেকি ও ঠগবাজ প্রবণতাকে সকলের সামনে উন্মুক্ত করে দেন। মূলত আবেগপ্রবণতা ও অভিজ্ঞতালব্ধ অভিজ্ঞানের শৈল্পিক বুননসৌকর্য এবং প্রাতিস্বিক প্রকরণের প্রাখর্যগুণই তাঁকে বাংলাদেশের ছয়ের দশকের প্রতিনিধিস্থানীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করে।

তথ্যসূত্র

১. আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। ভালোবাসার সাম্পান। ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২
২. বায়তুল্লাহ কাদেরী। ষাটের দশকের কবিতা বিষয় ও প্রকরণ। ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী, ২০০০
৩. শহীদ কাদরী। কবিতাসমগ্র। ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৭
৪. শহীদ ইকবাল। বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাস। ঢাকা : আলেয়া বুক ডিপো, ২০০৯

এনইউবি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা
(Peer-Reviewed Journal)
ISSN : 2710-4451
বাংলা বিভাগ
নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২২

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা: বাঘা যতীনের অবদান

রকিবুল হাসান

সার-সংক্ষেপ: ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্বের সর্বপ্রধান নায়ক ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)। তিনি বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠনগুলোকে একত্রিত করে, তার নেতৃত্ব নিজে গ্রহণ করে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংগঠিত সশস্ত্র বিপ্লবের নতুন ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। নিজের পারিবারিক জীবন ও উচ্চশিক্ষা লাভ সব তুচ্ছ করে দেশের মুক্তিই তাঁর কাছে সর্ববৃহৎ স্বার্থে পরিণত হয়েছিল। জার্মানি থেকে অস্ত্র-অর্থ সাহার্য্য লাভের সব ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। ব্রিটিশবাহিনীর সঙ্গে অপরিকল্পিত ও অসম যুদ্ধে বাঘা যতীন নিজের মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও, পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ ও অনুরোধ থাকা সত্ত্বেও, মরণযুদ্ধকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য। দৃঢ়চিত্তে বলেছিলেন, 'আমরা মরবো, দেশ জাগবে'। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁরই সৃষ্ট-পথে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড ব্যাপকতর রূপ নিয়েছিল। সেই পথেই অর্জিত হয়েছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা।

ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণের একটি বিশেষ সময়কে চিত্রিত করবার মুহূর্তে শিবনাথ শাস্ত্রী সে-যুগের প্রতীকরূপে রামতনু লাহিড়িকে নির্বাচন করেছিলেন। ওই সময় বাগ্মিতায়, রচনাশৈলীতে, মননের উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠতর আরো অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তারপরও রামতনু লাহিড়িকে কেন তিনি সে-যুগের প্রতীকরূপে অভিহিত করেছিলেন, তাঁর কারণ হলো, তাঁর চরিত্রে বাংলার তাজা প্রাণ ও পরিশীলিত বুদ্ধির যে সমন্বয় ঘটেছিল তা ছিল অভাবনীয়। অন্যদের থেকে এখানেই তিনি অনেক বেশি পৌরুষদীপ্ত ছিলেন। যা সে সময় সকলকে মুগ্ধ করতে পেরেছিল।

* প্রফেসর ও ডিন, বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গবেষণা অনুষদ।
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ।

কয়েক দশক পরে সেই জাগরণ রীতিমতো অভ্যুত্থানে পরিণত হয়েছিল। যার প্রধান পুরুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দর মতো বিস্ময় প্রতিভা। কিন্তু সমগ্র আন্দোলনটির প্রতীকরূপে অনেকেই চিহ্নিত করেছেন বাঘা যতীনকে– তাঁর মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯১৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় একটি যুগ বাংলার বিপ্লবী সংগঠনকে যিনি প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দিয়ে, ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে প্রথম সংঘবদ্ধ সশস্ত্র সম্মুখ যুদ্ধ করে আত্মাহুতির মাধ্যমে নিজের জীবনদীপ নিবিয়ে দিয়েছিলেন, সেই মৃত্যুর ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা লাভের প্রকৃত মন্ত্র তিনি উচ্চারণ করে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই প্রেরণা অব্যাহত ছিল স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত। দেশের মুক্তির অনিবার্য হিসেবে বাঘা যতীনের দেখিয়ে দেওয়া বিপ্লবী সশস্ত্র কর্মপন্থাই প্রধান হয়ে উঠেছিল। বাঘা যতীন এ কারণেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

কিন্তু দুঃখজনক হলো, বর্তমান প্রজন্মের কাছে মহান বিপ্লবী বাঘা যতীন বিস্মৃত হয়ে গেছে। যেসব বিপ্লবীরা জীবন দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য অদম্য অপ্রতিরোধ হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের নেতা ছিলেন বাঘা যতীন। বিশেষ করে অগ্নিযুগের দ্বিতীয় পর্বে। তাঁর নেতৃত্বে ও নির্দেশিত বিপ্লবী পথে বিপ্লব করে যুগ যুগ ধরে গণমানুষের মনে চির ভাস্মর হয়ে থাকলেও, সে তুলনায় বাঘা যতীন অনেক কম পরিচিত ও অবহেলিত একটি নাম বর্তমানে। অবস্থা দৃষ্টে ব্যাপারটা এরকম হয়ে গেছে, সাইড নায়কেরাই প্রধান নায়ক হয়ে গেছেন, প্রধান নায়ক হয়ে গেছেন সাইড নায়ক–নির্মম বাস্তবতা। বাঘা যতীনকে নিয়ে একসময় বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হলেও, তাঁকে নিয়ে নাটক-চলচ্চিত্র নির্মিত হলেও, বর্তমানে সেগুলো দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। তাঁকে নিয়ে কাজী নজরুল ইসলামু কবিতা রচনা করেছেন, উপন্যাস লিখেছেন। পরবর্তী সময়ে বাঘা যতীনকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে তুলণামূলক অনেক কম, তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সেভাবে বর্তমান প্রজন্মের কাছে উপস্থাপিত হয়নি। তাঁকে নিয়ে গান-কবিতা উল্লেখযোগ্যভাবে সৃষ্টি হয়নি, গ্রন্থ রচনা হয়েছে সামান্য। তরুণ প্রজন্মের কাছে তাঁর অবিশ্বাস্য দেশপ্রেম তুলে ধরার জন্য বিশেষ কোনো উদ্যোগ বা বিশেষ কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমান সময়কালে তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ড নিয়ে নাটক-চলচ্চিত্র নির্মিত হয়নি। ভারতবর্ষে শাসন-শোষণকারীদের নাম বিভিন্ন পাঠ্যবইয়ে ইতিহাসের দোহায়ে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও বাঘা যতীনের মতো বিপ্লবী উপেক্ষিত রয়ে গেছেন দীর্ঘকাল। বর্তমান প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করার জন্য বাঘা যতীনের মতো বিপ্লবীদের জীবনাদর্শ ও কর্মকাণ্ড বিভিন্নভাবে বর্তমান প্রজন্মের কাছে উপস্থাপনের দীর্ঘস্থায়ী কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। যে কারণে যাঁদের রক্তের ওপর, যাঁদের আত্মদানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীনতা, তাঁদের নাম হারিয়ে যাচ্ছে, বর্তমান প্রজন্ম তাঁদের দীর্ঘকালের ইতিহাসের গভীর তেজস্বীতার তাপ

কখনোই অনুভব করতে পারছে না। এভাবেই কালে কালে জন্ম নেওয়া বহু সূর্যসন্তান হারিয়ে যাবে দেশের ইতিহাস থেকে, ইতিহাস সুষ্টি করেও ইতিহাসে থাকবে তাঁদের নাম। যাঁদের জন্য তাঁদের জীবন দান, তাঁরাও জানবে না সেই সব মহাপুরুষের নাম। বাঘা যতীনের ক্ষেত্রেও যেন সেই ট্রাজিক পরিণতিই বাস্তবে রূপ নিচ্ছে।

ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনের মহানায়ক ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)। তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিপ্লবী সংগঠনগুলোকে একত্রিত করে সংঘবদ্ধভাবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছিলেন। 'যতীন্দ্রনাথ ছিলেন বিপ্লববাদের ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্বের অন্যতম প্রসিদ্ধ নায়ক।'[১] তাঁর তৈরি সেই পথ ধরেই জাতীয় জাগরণের উন্মেষ ঘটেছিল। তরুণ বিপ্লবীরা দেশের মুক্তির জন্য সশস্ত্র বিপ্লবকেই অনিবার্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

> জাতীয় জাগরণের একটি মাহেন্দ্রক্ষণকে চিত্রিত করবার মুহূর্তে শিবনাথ শাস্ত্রী সে-যুগের প্রতীকরূপে নির্বাচন করেছিলেন রামতনু লাহিড়ীকে। বাগ্মিতায়, রচনাশৈলীতে, মননের উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠতর একাধিক পুরুষের অবস্থিতি সত্ত্বেও লাহিড়ী মশাই কেন বিশেষভাবে গণ্য হলেন প্রতিভূর ভূমিকায়, সে কৈফিয়ত কেউই চাই না; তাঁর চরিত্রে বাংলার তাজা প্রাণ ও পরিশীলিত বুদ্ধির পরিমাণ সমন্বয় ঘটেছিল তার পরিচয়ই মুগ্ধ করে আমাদের। কয়েক দশক পরে সেই জাগরণকে সুতীব্র অভিব্যক্তি দিল অভ্যুত্থান, আমরা তার বাস্তবিক হেতুর সন্ধানে সাক্ষাৎ পাই রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দের মতো প্রতিভার। কিন্তু সমগ্র আন্দোলনটির প্রতীকরূপে কেউ কেউ চিহ্নিত করেছেন বাঘা যতীনকে–১৯১৫ সাল পর্যন্ত প্রায় একটি যুগ–বাংলার বিপ্লবী সংগঠনকে যিনি প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দিয়ে আপন জীবন-দীপ নিবিয়ে গেলেন, কয়েক প্রজন্মের স্মৃতিতে তাঁর প্রেরণা অব্যাহত রইলো অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো।[২]

কী অবিশ্বাস্য দেশপ্রেম ছিল তাঁর, কী অমিততেজ শক্তি ছিল, দেশের মুক্তিই ছিল তাঁর একমাত্র স্বার্থ এবং সবচেয়ে বড় স্বার্থ। 'যতীন্দ্রনাথ যেন একজন মানুষই ছিলেন তা নয়, তিনি একটি আন্দোলনের প্রতীক ছিলেন।.. যতীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিবিশেষ মনে করা ভুল হবে। রামমোহন হতে বিবেকানন্দ পর্যন্ত বাঙালী জীবনে যে ভাবধারা প্রবাহিত হয়েছিল, যতীন্দ্রনাথ ছিলেন তারই প্রতীক।'[৩] বাঘা যতীন সুপরিকল্পিত ও নিজস্বধারায় বিপ্লব-কর্মপন্থা তৈরি করেছিলেন। যেখানে ব্রিটিশদের সঙ্গে কোনো আপসরফা নয়, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিপ্লবীদের সংঘবদ্ধ করে সংগঠিতভাবে বিপ্লব ঘটাতে হবে। এজন্য তিনি অনুধাবন করেছিলেন বিদেশি সাহায্য-সহযোগিতায় অস্ত্র ও অর্থ প্রয়োজন। সেই ভাবনা ও পরিকল্পনামাফিক তিনি তা বাস্তবায়নে কার্যকরি উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

> ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য তিনি বিভিন্ন কর্মপন্থা নির্ধারণ করে তা কার্যকরী করার জন্য নিজে অবিশ্বাস্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। স্বদেশি যুগের বিখ্যাত বিপ্লবী-

> দার্শনিক মানবেন্দ্রনাথ রায় (নরেন্দ্র ভট্টাচার্য) সান্ ইয়াৎ সেন, লেনিন, ট্রটস্কি প্রমুখ মহামানবের সংস্পর্শে এসেও ভুলতে পারেননি তাঁর প্রথম জীবনের দীক্ষাগুরু যতীন্দ্রনাথকে: এঁরা সবাই মহামানব (great men); যতীনদা ছিলেন ভালো মানুষ (good man) এবং তাঁর চেয়ে ভালো মানুষ (a better man) আমি এখনো খুঁজে পাইনি। মহামানবদের চাঁদের হাটে ক্বচিৎ আমরা ভালো মানুষদের আসন দেই। এই রেওয়াজই চালু থাকবে যতদিন না সততা (goodness) স্বীকৃতি পাচ্ছে সত্যকার মহত্ত্বের পরিমাপ রূপে। .. কোনও একটা যুগের গণ্ডীতে বাঁধা যায় না যতীনদাকে; তাঁর অন্তরের মূল্যবোধ ছিল ষোল আনাই মানবীয় এবং ফল, দেশ-কালের সীমানার উর্ধ্বে। যেমন তিনি দয়ালু ও সত্যনিষ্ঠ তেমনি ছিলেন অসমসাহসিক সন্ধিবিমুখ (uncompromising)। তাঁর সাহসিকতা হৃদয়হীন ছিল না, আর তাঁর সন্ধির অনীহা ছিল না ক্ষমাবর্জিত। ..নিজেকে তিনি কর্মযোগী বলে জানতেন এবং সেই আদর্শই আমাদের সকলের পক্ষে শুভঙ্কর বলতেন। ..কর্মযোগী অর্থাৎ মানবতাবাদী; যিনি বিশ্বাস করেন যে মানুষের কর্মের মধ্য দিয়েই আত্মসিদ্ধি সম্ভব, তাঁর পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করা স্বাভাবিক যে মানুষই তার নিয়মিত স্রষ্টা।.. যতীনদা ছিলেন মানবতাবাদী, সম্ভবত বর্তমান ভারতবর্ষের প্রথম মানবতাবাদী।[৪]

তাঁর পারিবারিক বিপ্লববাদ চেতনা, বিপ্লবী কর্মপন্থা ও উড়িষ্যার বালেশ্বরে ব্রিটিশ-সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে অবিশ্বাস্য সম্মুখযুদ্ধ ও আত্মাহুতি বাঙালির জীবনে তা এক বিস্ময়কর ঘটনা।

জাতির জীবনে বাঘা যতীন সত্যিকার অর্থেই আশীর্বাদ ছিলেন। যখন ব্রিটিশরা এদেশকে দীর্ঘ শাসন-শোষনে রেখে এদেশের সম্পদ নিজেদের দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠন বিপ্লব ঘটালেও মহাশক্তিধর ব্রিটিশকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য এসব উদ্যোগ যথেষ্ট ছিল না। এ জন্য প্রয়োজন ছিল এমন একজন বিপ্লবী নেতা, যিনি বাংলায় ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন সংগঠনগুলোকে একত্রিত করে সংগঠিতভাবে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা ঠিক করে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাতো পারেন। বাঘা যতীন ছিলেন পরাধীন ভারতের কাঙ্ক্ষিত সেই বিপ্লবী নেতা। যিনি আপাদমস্তক বাঙালি ছিলেন। সেই সময়ের পূর্ব বাংলায় বর্তমান কুষ্টিয়ার কয়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল। প্রখ্যাত গবেষক পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর *সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ* গ্রন্থে বলেছেন: "রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আবির্ভুত হলেন এদেশের 'আভ্যন্তরীণ ইতিবৃত্ত গঠনের সর্বপ্রধান যুগপুরুষ' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর–'উগ্র উৎকট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তেজীয়ান পুরুষ'। এলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋষী বঙ্কিমচন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু, মাইকেল মধুসূদন,

> ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন। এলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। এলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আর স্বামী বিবেকানন্দ। এই যে ক্ষণজন্মা পুরুষেরা একের পর এক এসে আমাদের দিয়ে গেলেন আলোর বার্তা, এঁদেও জন্মস্থানের কোথায় কটাই বা মর্মর-ফলক পাব আমরা, কোথায় পাব গাইড? জাতির চেতনায় নিভৃততম মহলে চির অক্ষয় এঁদের আসন। এই সাবেকী আমলের বাড়ীতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহান

> বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সেদিন ছিল অগ্রহায়ণ মাসের একুশ; বাংলায় বারো-শ' ছিয়াশি সাল। ইংরেজি মতে আঠারো-শ' ঊনআশি সালের ৮ই ডিসেম্বর।[৫]

বিশাল মাপের এই বিপ্লবী মনে-প্রাণে ছিলেন একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিও। খেলাধুলার প্রতিও ছিল সমান আগ্রহ। বেশ অর্থ ব্যয় করে তিনি 'কয়া থিয়েটার ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের ছেলেরা এখানে যেন নিয়মিত ভালো ভালো নাটক করতে পারে।

> যে-সব নাটকে উদ্দীপ্ত হবে দেশপ্রেম, উদ্দীপ্ত হবে তরুণদের মনের অতলে সুপ্ত বহ্নিশিখা, যে-সব নাটক গড়ে তুলবে তাদের চরিত্র।'[৬] তিনি নিজে এসব তরুণদের দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। থিয়েটারের পাশাপাশি তিনি ফুটবল কাবও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিদ্যাভূষণের জাতীয়তাবাদী লেখা, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, স্বামী বিবেকানন্দের লেখা, বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের ইতিহাস– এসব পাঠ করে তিনি তরুণদের শোনাতেন। যাতে, তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। লেখালেখি করতেন খুবই কম, কিন্তু লিখতেন। লেখার হাত ছিল। কবিতা লিখতে পারতেন। গল্পও লিখেছেন। সম্পাদনা করেছেন পত্রিকা। তাঁর পত্রিকার নাম 'গ্রহতারা'। প্রতি সপ্তাহে বুধবার করে বার হতো। বেশ কয়েকটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় ছোটমামা ললিতকুমার কাগজের উদ্দেশ্যে প্রভৃতি ব্যক্ত করেছিলেন; তিনি নিজে ভাল সাহিত্যিক ছিলেন। আর প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনাই ছিল যতীন্দ্রনাথের ছোটগল্পটি।[৭]

তিনি আন্দোলনে পুরোপুরি জড়িত হওয়ার পর স্ত্রী-সন্তানদের নিয়মিত খোঁজ-খবর করতে পারতেন না। কারণ তখন তাঁর খোঁজে ব্রিটিশ-বাহিনী মরিয়া হয়ে উঠেছিল। যতীন তখন তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে গোপন-অবস্থানে থেকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। ব্রিটিশ সৈন্যরা যতীনের খোঁজে তাঁর কয়ার বাড়িতে অসংখ্যবার তল্লাশি করেছিল। তখন তাঁর সংসারের পুরো দায়িত্ব পালন করতেন মাতৃস্থানীয়া সহোদরা বিনোদবালা। ব্রিটিশ সৈন্যদের তিনি কখনো ছেড়ে কথা বলেননি। ভয় কাকে বলে তিনি জানতেন না। যোগ্য ভাইয়ের যোগ্য বোনই ছিলেন বিনোদবালা। যতীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে গর্ব ও গৌরবের সূর্যোজ্জ্বল একটি নাম। যখন ভারতবর্ষে সংঘবদ্ধভাবে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়নি, তখন এ-বাংলার প্রত্যন্ত এক গ্রামের সন্তান স্বাধীনতার উদগ্র কামনায় নিজে বিপ্লবী মদলগুলোকে একত্রে সংগঠিত করে সংঘবদ্ধভাবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেন।

'১৯০৬ সালের এপ্রিল মাস। ২৮ শে চৈত্র।'[৮] তিনি কয়া গ্রামে আসেন। এর আগের দিন তিনি অফিসের কাজ সেরে রাতেই ট্রেনে কুষ্টিয়া আসেন। চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে গড়াই নদী সাঁতরিয়ে কয়ায় আসেন। এ দিন যে তাঁর জন্য জীবন-মৃত্যুর এক সন্ধিক্ষণ অপেক্ষা করছিল তা নিজেও জানতেন না। বাঘা যতীন বাড়িতে এসেছে জেনে পাশের

রাধারপাড়া গ্রামের দুজন চাষি এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে জানায় তাদের গ্রামে বাঘের অত্যাচার আর উৎপাতের কথা। বাঘা যতীন সব শুনে মুহূর্ত দেরি না করে ধুতিটা মালকোচা মেরে বের হয়ে যান ঘর থেকে একটা দার্জিলিংয়ের কুকরি (ছোট্ট ছোরা) নিয়ে। রাধারপাড়া গ্রামের মাঠ তখন আখের খেতে ভরা। বাঘ খুঁজতে খুঁজতে তিনি গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে চলে যান। তারপর লক্ষ করেন আখের খেতে একটা ঝোপের আড়ালে বিরাট এক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। বাঘ দেখেই তিনি চাপাস্বরে বলতেই বাঘের কথা জানান দিতে তাঁর মামাতো ভাই অমূল্য পাখিমারা বন্দুকে ট্রিগার টিপে দেয়। বাঘ ক্রুদ্ধ গর্জনে অমূল্যের ওপর লাফিয়ে পড়তেই বাঘা যতীন ত্বড়িৎবেগে তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে ফেলে নিজেই বাঘের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত বাঘাটিকে তিনি হত্যা করতে সক্ষম হন।

বাঘা যতীন ১৯০৬ সালের ১১ এপ্রিলে (২৮ চৈত্র, ১৩৯২) সামান্য এক ভোজালি দিয়ে নিজের গ্রামের পার্শ্ববর্তী রাধারপাড়া গ্রামে একা লড়াই করে বাঘ মারার ঘটনা গোটা ভারতে রীতিমতো বিস্ময়কর খবরে পরিণত হন। সে-সঙ্গে বাঘ মারার এই ঘটনা স্বদেশি বিপ্লবীদের দারুণভাবে উজ্জীবিত করেছিল। তাঁর এ-কীর্তি ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। বাঘের সঙ্গে লড়াই করে নিজেও প্রচণ্ড আহত হন। এজন্য তাঁকে কলকাতায় তাঁর মেজো মামা ডা. হেমন্তকুমার ও বিশিষ্ট ডাক্তার সুরেশচন্দ্র সর্বাধিকারীর চিকিৎসা নিতে হয়েছিল। তাঁর ডান পা-এর অবস্থা এত খারাপ হয়ে পড়েছিল যে ডা. সুরেশচন্দ্র তাঁর পা-টি কেটে একদম বাদ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মেজো মামা ডা. হেমন্তকুমার পা না-কেটে যথাসাধ্য চিকিৎসা করার কথা বলেন ডা. সুরেশকে। কারণ তিনি জানতেন অসম্ভব মনোবলের অধিকারী তাঁর এই ভাগ্নে। যেকোনো অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা তাঁর আছে। ডা. হেমন্তকুমারের কথামতোই চিকিৎসা করেছিলেন ডা. সুরেশচন্দ্র। ছয় মাস তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন, এরপরও কিছুদিন বাঘা যতীন ক্র্যাচে ভর করে হাঁটতেন। তারপর তিনি পুরোপুরি সুস্থ হন। এ প্রসঙ্গে বাঘা যতীনের ছোট মামা ললিতকুমার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> বিপদে পলায়ন করা যতীন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে ছিল না–তাই তিনি সরিয়া না গিয়া বাঘের গলা তাঁহার বাম বগলের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বাঘের মাথায় ভোজালি দিয়া মারিতে লাগিলেন। বাঘ আহত হইয়া যতীন্দ্রনাথকে কামড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তাঁহার সহিত বাঘের রীতিমত লড়াই আরম্ভ হইল। অবশেষে তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। বাঘা সেই অবসরে তাঁহার দুই হাঁটুতে কামড়াইয়া ও সর্বাঙ্গে নখ বসাইয়া তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল। তিনি নিজের দেহের আঘাত অগ্রাহ্য করিয়া বাঘকে মাটিতে চাপিয়া ধরিয়া ছোরার আঘাতে বাঘকে মারিয়া ফেলিলেন, কিন্তু নিজেও মৃতপ্রায় হইয়া গেলেন। তাঁহাকে তুলিয়া বাড়ী আনা হইল, ও

> কলিকাতায় তাঁহার মেজমামার নিকট পাঠান হইল। সেখানে বিখ্যাত সার্জন ডাক্তার সুরেশ সর্বাধিকারী তাঁহার চিকিৎসা করিয়া বাঘের কামড়ের ক্ষত ও বিষ হইতে তাঁহাকে বাঁচাইয়া দেন। তাঁহার দু'খানা পা-ই কাটিয়া ফেলিবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা করিতে হয় নাই। তিনি ছ-মাস ধরিয়া শয্যাগত ছিলেন এবং ভাল হইয়াও বহুদিন ধরিয়া তাঁহাকে স্ক্রাচের সাহায্যে চলিতে হইয়াছিল। যতীন্দ্রনাথ পরে তাঁহার মারা ঐ বাঘের চামড়াখানি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার জীবনদাতা ডাক্তার সর্বাধিকারীকে উপহার দিয়াছিলেন।[৯]

ডাক্তার সুরেশচন্দ্র যতীন্দ্রনাথের এ-কীর্তিকে সম্মান জানিয়ে তাঁকে 'বাঘা যতীন' উপাধি দেন। তিনি অবিশ্বাস্য এই কীর্তি নিয়ে ইংরেজিতে একটি প্রবন্ধ লেখেন 'The bengali Nemrod'। সেই প্রবন্ধে বাঘা যতীনের অপূর্ব শৌর্য, অসাধারণ সহ্যশক্তি ও দেবতুল্য চরিত্রের বর্ণনা দেন। সাধারণ মানুষের কাছে তখন এই প্রবন্ধ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। সাধারণ মানুষও তাঁর বাঘ মারার পর ভালোবেসে তাঁকে 'বাঘা যতীন' নামে ডাকতে শুরু করেন। তিনি পরবর্তীতে একটি বাঘিনীও হত্যা করেছিলেন।

> কন্ট্রাকটারী করিবার সময় যতীন্দ্রনাথ ঝিনাইদহে থাকিতেন এবং প্রত্যহ কার্য্য করিয়া অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরিতেন। একদিন ঘোড়ায় চড়িয়া গভীর রাত্রে বনের মধ্য দিয়া বাড়ী আসিতেছেন এমন সময় হঠাৎ তাঁহার ঘোড়া পথিমধ্যে থামিয়া গেল। যতীন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন যে, কোন জন্তুর গন্ধ পাইয়াছে তাই যাইতে চাহিতেছে না। তিনি তথায় একটু দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইলেন যে একটি বাঘ কয়েকটি বাচ্চা লইয়া অদূরে খেলা করিতেছে। তাঁহার সহিত বন্দুক ছিল; তিনি নিজের কোটটি খুলিয়া ঘোড়ার চোখে বাঁধিয়া দিলেন এবং ধীরে ধীরে ঘোড়া লইয়া আগাইয়া চলিলেন। বাঘটির নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি গুলি ছুড়িলেন, বাঘ ধরাশায়ী হইল। তারপর যতীন্দ্রনাথ নিকটে যাইয়া বাঘের বাচ্চাগুলিকে দেখিয়া তাহাদিগকে নিজ গৃহে লইয়া আসিলেন এবং বহুদিন যাবৎ তাহাদিগকে পুষিয়াছিলেন।[১০]

বাঘা যতীনের বাঘ-মারার ভেতর দিয়েই সেই সময়ে বিপ্লবীদের মধ্যে নবজাগরণ তৈরি হয়েছিল–আমরা যদি বাঘ মারতে পারি, ব্রিটিশও মারতে পারবো। এই অগ্নিচেতনায় বিপ্লব তখন নতুন প্রাণে জেগে উঠেছিল।

যতীন সেন্ট্রাল কলেজে এফ-এ পড়ার সময়ই নিজে কিছু-একটা করার কথা ভাবেন। অন্যের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজের উপার্জনে নিজে চলার চিন্তা তাঁর মাথায় ঢোকে। যদিও তাঁর মামারা তাঁকে অসম্ভবরকম স্নেহ করতেন তাঁর সমস্ত দায়িত্ব পালন করতেন। কিন্তু মামাদের না-জানিয়ে নিজেই অর্থ উপার্জনের একটা পথ খুঁজতে থাকেন। যেন নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানো যায়। এ চিন্তা থেকেই তিনি সর্টহ্যান্ড ও টাইপরাইটিং-এ ভর্তি হন। এবং অল্প সময়ের মধ্যে তিনি তা দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ব করে নেন। এরপরই শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন– কলকাতার আমহুটি অ্যান্ড কোম্পানি নামক ইউরোপীয় এক অফিসে পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকরি নেন তিনি। এখানে চাকরি করা অবস্থাতেই

মজঃফরপুরে একটি ভালো চাকরি পান তিনি, বেতন ছিল আশি টাকা। কলকাতার চাকরি ছেড়ে মজঃফরপুরে চলে আসেন তিনি। এখানে তিনি ব্যারিস্টার প্রিংলে কেনেডির সচিব হিসেবে যোগদান করেন। কেনেডি সাহেব ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ স্কলার এবং ইংরেজি পত্রিকার ত্রিহুত কুরিয়ার-এর সম্পাদক। কংগ্রেস প্লাটফর্ম থেকে কেনেডি-সাহেব প্রথম প্রস্তাব আনেন– ভারতের নিজস্ব জাতীয় সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার সপক্ষে। বাঘা যতীন কেনেডি সাহেবের কাছেও বেশীদিন চাকরি করেননি। কারণ

> এখানে চাকরি করা অবস্থাতেই তিনি কলকাতায় বঙ্গীয় সরকারের অফিসে চাকরি পান। এই চাকরিটা তাঁর পছন্দ হয়, বেতনও ভালো, একশত কুড়ি টাকা। তিনি মি. কেনেডির চাকরি ছেড়ে কলকাতায় নতুন চাকরিতে যোগ দেন। এখানে তিনি বঙ্গীয় সরকারের অফিসের খুব প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব মি. এ. এইচ. হুইলার নামক একজন আই.সি.এস.-এর অধীনে সর্টহ্যান্ড-টাইপিস্টের কাজ করতেন। একই সঙ্গে তাঁকে তাঁর ব্যক্তিগত সচিবের দায়িত্বও পালন করতে হতো। তখন বঙ্গীয় সরকারের কর্মকাণ্ড মি. হুইলারের নির্দেশে চলতো বলেই প্রচার ছিল। যতীন নিজের ব্যক্তিত্ব আর কাজের দক্ষতাগুণে মি. হুইলার ও তাঁর অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সকলের বিশেষ পছন্দের পাত্রে পরিণত হন।[১১]

তাঁরা যতীনকে খুব বিশ্বাস করতেন। মি. হুইলার রাজস্ব বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। সে-কারণে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজা, মহারাজা, জমিদারবর্গ প্রায়ই মি. হুইলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। সেকারণে যতীনের সঙ্গেও প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর এসব ব্যক্তিদের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। মি. হুইলারের সঙ্গে দেখা করার আগে যতীনের রুমেই তাঁদের ঢুকতে হতো। যতীনের রুম ছিল মি. হুইলারের রুমের সম্মুখের রুম। যতীন তাঁর সুন্দর ব্যবহার ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে তাঁদের সহজেই মুগ্ধ করতে পারতেন। এখানে চাকরি করা অবস্থাতেই তিনি গোপনে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। মি. হুইলার ভুলেও ভাবতে পারেননি যতীন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। এমনকি বঙ্গীয় সরকারের অফিসের উচ্চপদস্থ কোনো কর্মকর্তাও তাঁকে সন্দেহ করেননি। কিন্তু বিপ্লবীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বাঘা যতীনের নাম তখন বারবার উচ্চারিত হচ্ছে। ১৯০৯ সালে ১৭ ফেব্রুয়ারি সরকারি উকিল আশুতোষ বিশ্বাস আলীপুরের আদালত প্রাঙ্গণে খুলনা জেলার শোভনা গ্রামের চারুচন্দ্র বসুর গুলিতে নিহত হলে গোয়েন্দাদের তীক্ষ্ম দৃষ্টি পড়ে বাঘা যতীনের ওপর, একসময় যখন তাঁর যুক্ততাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, হাওড়া মামলায় যখন তাঁকে অভিযুক্ত করা হলো তখন বঙ্গীয় সরকারি অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা অবাক হন, যাঁকে তারা এতো বিশ্বাস করতেন, ভালোবাসতেন, সে-ই নীরবে এসব বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সংঘঠিত করছে! সে-ই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মূল হোতা। চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয় তাঁকে। ১৯০৪ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে যতীন্দ্রনাথ কুষ্টিয়ায় আসেন।

> দলের অনেক কাজ কুষ্টিয়ায়। ময়মনসিংহের বিপ্লবী নেতা হেমেন্দ্রকিশোর তখন কুষ্টিয়ায়। হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য-চৌধুরী যতীন্দ্রনাথের বন্ধু। কুষ্টিয়ায় হেমেনবাবুর কুটুমবাড়ি। সেখানেই তাঁর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়। কুষ্টিয়ার চক্রবর্তী-বাড়িতে। এঁরা মোহিনীমিলের প্রতিষ্ঠাতা,–শোনা যায় যতীন্দ্রনাথের প্রেরণা কম ছিল না এর পশ্চাতে।[১২]

বঙ্গীয় সরকারের অফিসে চাকরিকালে যতীন্দ্রনাথ প্রতি বছর গরমের সময় কয়েক মাসের জন্য দার্জিলিংয়ে সময় কাটাতে যেতেন। একবার দার্জিলিংয়ে সময় কাটাতে যাবার সময় শিলিগুড়ি রেল স্টেশনে তিনি ট্রেনে বসে আছেন। ট্রেনটি ছাড়বে-ছাড়বে এরকম সময়ে তিনি লক্ষ করেন ট্রেনের কামরায় একটি ছোট শিশু পানির তৃষ্ণায় কাঁদছে। যদি ট্রেন ছেড়ে দেয় এ-আশঙ্কায় শিশুটির বাবা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না তিনি কী করবেন! পানি আনতে হলে তাকে নিচে যেতে হবে। বাঘা যতীন তা বুঝতে পেরে নিজেই একটি গ্লাস হাতে পানি আনতে দ্রুত ট্রেন থেকে নেমে যান। কিন্তু পানি নিয়ে আসার আগেই ট্রেন ছেড়ে দেয়। তিনি তাড়াতাড়ি দৌড়ে পানি নিয়ে ট্রেনে উঠতেই গেটে দাঁড়ানো চারজন শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের একজনের গায়ে ধাক্কা লেগে কিছুটা পানি তার গায়ে পড়ে। এতে ক্রোধান্বিত হয়ে চারজন সৈনিকই যতীনকে এমনভাবে ধাক্কা মারে যে তিনি নিচে পড়ে যান এবং তাঁর হাতে ধরা গ্লাসটিও ভেঙে যায়। যতীনের চোখের সামনে তখন তৃষ্ণার্ত শিশুটির অসহায় মুখ, আর বাঙালির প্রতি তাদের বিরূপ আচরণ তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠলো। যতীন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন। তারা আবারও যতীনকে আক্রমণ করলো এবং বাঙালিদের উদ্দেশ্য করে গালাগালি করতে থাকে। বাঘা যতীন প্রতিশোধে জ্বলে ওঠেন। আক্রমণ করেন চারজন সৈনিককেই। চার জনের সঙ্গে যতীন একা লড়েন, কারো নাক ভেঙে দেন, কারো মাথা ফাটিয়ে দেন। এ দেখে এক শ্বেতাঙ্গ সৈনিক যতীনকে পেছন থেকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। এতেও তিনি ক্ষান্ত না হয়ে একা খালি-হাতে চার জন শ্বেতাঙ্গ সৈনিককে স্টেশনের প্লাটফরমে চরমভাবে প্রহার করে তারপর তিনি তাদের ছেড়ে দেন।

> যতীন্দ্রনাথ সাধারণ ভারতবাসীর ন্যায় প্রহৃত হইয়া, গালাগালি শুনিয়া মুখ নীচু করিয়া চলিয়া যাইবেন সে পাত্র তিনি নন। তিনি স্বামীজীর কথা স্মরণ করিলেন– "তোমার গালে এক চড় যদি মারে, তাকে দশ চড় যদি ফিরিয়ে না দাও, তুমি পাপ করবে। ঝাঁটা লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে, ইহকালের নরকভোগ, পরকালেও তাই। অন্যায় সহ্য করা গৃহস্থের পক্ষে পাপ–তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে"।[১৩]

সেদিন সবাই শিলিগুড়ির প্লাটফরমে দেখেছিল এক বাঙালি যুবক কিভাবে শাসন করেছিল চার শ্বেতাঙ্গ সৈনিককে। আঘাতপ্রাপ্ত এসব সৈনিকদের হাসপাতালে গিয়ে

চিকিৎসাগ্রহণ করতে হয়েছিল। এ ঘটনায় যতীনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হয়। আহত চার শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের মধ্যে একজন ছিলেন লেফটেন্যান্ট পদ-মর্যাদার।

> দার্জিলিঙ শহরে এই মোকদ্দমার কথা হুইলার সাহেব শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। একজন নিরস্ত্র বাঙালী চারিজন শ্বেতাঙ্গ সৈনিককে মারিয়া আহত করিয়া পনের দিনের জন্য তাহাদিগকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন, ইহাতে লাঞ্ছিত না হইয়া আবার তাহারা আদালতে নালিশ করিতেছে, ইহা হুইলার সাহের পছন্দ করিলেন না। এই ঘটনা আদালতে যাইলে মামলার বিবরণ সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া জনসাধারণ শ্বেতাঙ্গদের গায়ে হাত দিতে চেষ্টা করিবে বিবেচনা করিয়া তিনি লেফটেন্যান্টকে ডাকিয়া মামলা প্রত্যহার করিয়া লইতে বলেন এবং তাহাদিগকে তিরস্কার করেন। হুইলার সাহেবের কথায় মামলা তাহারা প্রত্যাহার করিয়া লয়। হুইলার যতীন্দ্রনাথকে ডাকিয়া কি ঘটিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসা করেন এবং যতীন্দ্রনাথ সমস্ত সত্য কথা তাহাকে বিব্রত করেন। যতীনের কথা শুনিয়া সাহেব হাসিয়া আকুল হইলেন এবং তাহার সহিত করমর্দন করিয়া বলিলেন, তুমি কয়জনের সহিত লড়িতে পার?
> যতীন্দ্রনাথ নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে জবাব দিলেন যে, তিনি ভালো লোক একজনের সহিতও লড়িতে পারেন না। এই ঘটনার পর যতীন্দ্রনাথের প্রতি তাহার স্নেহ আরও বৃদ্ধি পায়।[১৪]

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে বাঘা যতীন ও এম. এন. রায় ছিলেন দুই দিকপাল। দুজনই অনুভব করেন বৈপ্লবিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন। কেননা দেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়িত করতে বিপ্লবীদের প্রয়োজন অস্ত্রের, বোমা-বন্দুক-পিস্তলের। তাছাড়া কর্মীদের খাওয়া-দাওয়া এসবের জন্যও তো অর্থ প্রয়োজন। কিন্তু এই অর্থ কিভাবে আসবে–কোথায় থেকে আসবে–এসব ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমে ভেবেছিলেন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে এ অর্থ সংগ্রহ করা যাবে। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রতি তখন সাধারণ মানুষের সমর্থনের অভাব ছিল। এই বিপ্লবীদের অধিকাংশই এসেছিলেন শহরের উঁচুতলার পরিবার থেকে।তারা রাজনৈতিক ডাকাতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইতিহাস থেকেও তারা এ ধরনের ডাকাতির পক্ষে সমর্থন খুঁজে পান। নিহিলিস্টরা অথবা অ্যানার্কিস্টরা সরকারি কোষাগার কিংবা ধনীর ধন লুট করে অর্থের প্রয়োজন মেটাতেন। গীতাতেও তো মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সন্ত্রাসের পথ বেছে নেওয়ার সমর্থন রয়েছে। সুতরাং পুলিশ-প্রশাসন বাংলার যুবকদের এই প্রয়াসকে ডাকাতি অভিধা দিলেও বিপ্লবীরা মনে করতেন এ আসলে যুদ্ধকালীন ঋণ গ্রহণ। যুদ্ধশেষে এ-ঋণ মিটিয়ে দেওয়া হবে। এরপর নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা প্রথম চিংড়িপোতা স্টেশনে ১৯০৭ সালের ৬ ডিসেম্বর এ স্টেশনটিতেই এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটান। এর মাধ্যমে বিপ্লব প্রচেষ্টার এক নব অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। শিয়ালদহ দক্ষিণ রেলপথে সোনারপুর পেরিয়েই যে স্টেশনটি, সেটিই ছিল চিংড়িপোতা রেল স্টেশন। বর্তমানে এটির নাম সুভাষগ্রাম। এর আগে এ

ধরণের প্রচেষ্টা যে হয়নি তা নয়। কিন্তু বৈপ্লবিক হত্যার প্রথম উদ্যোগগুলোর মতো ডাকাতির প্রস্তুতিপর্ব ও তার কর্মপদ্ধতি ছিল যেন অনেকটা হালকা চালে নেওয়া। কিন্তু চিংড়িপোতা ঘটনা থেকে সেটা নব অধ্যায়ের সূচনা ঘটে।

> ১৯০৯ সালের ৩১ মে নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ডায়মন্ড হারবারের কাছে নেত্রায় আরেকটি ডাকাতি হয়েছিল। বাড়ির মালিক রামচন্দ্র মিত্র পরে পুলিশকে জানিয়েছিল, 'ডাকাতের দল' তার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে যথাসর্বস্ব লুটে নিয়েছে ঠিকই, তবে যাবার বেলায় বলেছে –ইংরেজকে দেশ ছাড়া করতেই এ ঋণ গ্রহণ করা হল। সুদিন এলে এ ঋণ শোধ করা হবে।[১৫]

নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রাজনৈতিক ডাকাতিগুলা সম্পন্ন করেছিলেন এবং নিজেকে ও দলের সবাইকে নিরাপদে রাখতেও সক্ষম হয়েছিলেন। মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর দুঃসাহসিক অভিযানের দুদিনের মধ্যেই মানিকতলার মুরারীপুকুর গার্ডেন থেকে বারীন ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ বিপ্লবীরা গ্রেপ্তার হন। ৮নং গ্রে স্ট্রিট থেকে পুলিশ অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করে। এঁরা প্রত্যেকেই আলীপুর বোমা হামলায় অভিযুক্ত হন। এ ঘটনায় বাংলার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টটা একটা বড় রকমের আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এ মামলায় চিত্তরঞ্জন দাসের তৎপরতায় অরবিন্দ মুক্তি পান। অন্যান্য বিপ্লবীদের অনেকের যাবজ্জীবন দীপান্তরবাসের সাজা হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনার অভিঘাতে বিপ্লবীরা বুঝতে পারলেন ছোট ছোট দলের বিচ্ছিন্ন চেষ্টায় দেশকে স্বাধীন করা যাবে না। একটি বড় সুসংগঠিত দল তৈরি কাজ শুরু করা আশু কর্তব্য। ক্ষদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী কিংফোর্ডকে হত্যা করার জন্য ক্ষুদিরাম যে একাধিক পিস্তল বহন করেছিলেন, তার একটি নরেন্দ্রনাথের দেয় এবং তাঁদের অভিযাত্রার আগে নরেন্দ্রনাথ তাদের দুজনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ক্ষুদিরামকে তিনি একটি পিস্তল দিয়েছিলেন। নেহরু এসব কর্মকাণ্ডকে অহিংসার মৌলিক দর্শনের পরিপন্থী বলে আপত্তি ছিল। ক্ষুদিরামের স্মৃতির প্রতি তিনি শ্রদ্ধাও জানাননি। এর ফলে বিপ্লবীদের বৃহৎ পরিসরে সুসংগঠিত হওয়া অনিবার্যতায় রূপ নেয়। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যতীন মুখার্জি ও নরেন্দ্রনাথ ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যা অনেকটাই সফল হয়েছিলেন। বাংলার প্রায় সব কয়টি বিপ্লবী দল একত্রিত হলেও ঢাকার অনুশীলন সমিতি এবং কলকাতার বিপিন গঙ্গোপাধ্যায়ের দল শুধু স্বতন্ত্রভাবে থাকলো। এই দুটি দল এবং উত্তর ভারতের বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলো রাসবিহারী বসুর নিয়ন্ত্রণে ছিল।

> দেরাদুন ও লাহোরের দলগুলোকেও সংগঠিত করেছিলেন রাসবিহারী বসু। হুগলী ও চন্দননগরের গোষ্ঠীগুলির সঙ্গেও রাসবিহারীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। রাসবিহারীর সঙ্গে নরেন ও যতীন মুখার্জির যোগাযোগ হয়। ১৯১৩ সালে দক্ষিণেশ্বরে যতীনের সঙ্গে রাসবিহারীর কথাবার্তা হয়। পরের বছরে নরেনের উপস্থিতিতে তাঁদের মধ্যে

> পুনর্বার যে আলোচনা হলো তাতে স্থির হয় যে, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য চরম প্রস্তুতি নিতে হবে। এই অভ্যুত্থানে উত্তর ভারতে ও বাংলায় নেতৃত্ব দেবেন যথাক্রমে রাসবিহারী ও যতীন মুখার্জি।[১৬]

এই প্রক্রিয়া সফলভাবেই এগাচ্ছল। কিন্তু মানসিক দ্বন্দ্ব শুরু হয় রডা কোম্পানির ৪৬ হাজার টোটাসহ ৫০টি মাউসার পিস্তল লুটের পরে এর ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে। এর পরেও দেশব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল তাকে বাস্তবে রূপ দিতে নরেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে কঠোর পরিশ্রম শুরু করেন। এই প্রচেষ্টার ফলেই ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে সারা বাংলার গুপ্ত সমিতিগুলোর নেতৃবৃন্দ এক গোপন সভায় মিলিত হন। দেশি-বিদেশি শক্তি সংহত করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রবল আঘাত হানার যে অবকাঠামো নরেন্দ্রনাথ তৈরি করেছিলেন, তাতে প্রাণ সঞ্চার করে জীবন্ত করে তুলেছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। যতীন ও নরেন্দ্রনাথের মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিল। নরেন্দ্রনাথ যতীনকে 'দাদা' সম্বোধন করতেন এবং নিজের 'নেতা' মানতেন। হাওড়ায় ব্রিটিশ রাজ উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র মামলায় প্রধান অভিযুক্ত ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কারাবাসের শেষ কয়েকটি মাস যতীন মুখার্জী ও নরেন্দ্রনাথ একই সেলে ছিলেন। সে-সময়ে দুজনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়। নরেন্দ্রনাথ এর পর যতীন মুখোপাধ্যায়কে সামনে রেখে ব্রিটিশ সরকারকে একটা বড় রকমের আঘাত করার প্রয়াসী ছিলেন।

বাঘা যতীন এবং তাঁর শিষ্য এম. এন. রায় ক্রমশ উপলব্ধি করলেন, পরিকল্পনা যতই নিখুঁত হোক, যতোই গুপ্ত সমিতিগুলো একত্রিত হোক না কেন, বহিঃশক্তির সাহার্য ছাড়া ও সমর্থন ছাড়া সশস্ত্র অভ্যুত্থান করা বেশ কঠিন কাজ। বিশ্ব রাজনীতির গতি-প্রকৃতি বিচার করে তাঁরা সঠিকভাবেই অনুমান করেছিলেন যে একটা বড় রকমের যুদ্ধ বাঁধতে চলেছে। ১৯১৩ সালের শেষ থেকে ১৯১৪ সালেল মধ্যে যতীন্দ্রনাথ এবং নরেন্দ্রনাথ কলকাতায় নিযুক্ত জার্মান কনসুলের সঙ্গে বহুবার মিলিত হন। তাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। পরিকল্পনা অনুসারে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়কে পাঠানো হয় শ্যাম দেশে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের দায়িত্ব পড়েছিল নরেনের ওপর। গদর দলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য লোক পাঠানো হয় আমেরিকায়। ভারতবর্ষ ও তথা ভারতবর্ষেও বাইরে বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী ভারতবাসীদের সঙ্গে গদর দলের যোগাযোগ ছিল। এই দলটি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ইউরোপে বার্লিন কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে রওনা দিয়েছিলেন বাংলার বিপ্লবী দলের প্রতিনিধিরা।কিন্তু জার্মানি সাহায্য না আসা পর্যন্ত অভ্যুত্থানের প্রাথমিক খরচ চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে যতীন্দ্রনাথ বড় ধরনের রাজনৈতিক ডাকাতি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দায়িত্ব দেন নরেনকে।

১৯১৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি নরেন গর্ডেনরিচে বার্ড কোম্পানির ১৮,০০০ টাকা লুট করলেন। ঘটনাটি ঘটল প্রকাশ্য দিবালোকে। বিপ্লবী নলিনীকান্ত বিবরণ থেকে জানা যায় ডাকাতির পর নরেন ঠিক সময়ে ফিরে না এলে যতীন খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।[১৭]

যতীন ও নরেন চেয়েছিলেন জার্মানির সাহায্যে জাহাজ বোঝাই করে অস্ত্র গোলা-বারুদ এনে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়ে ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করতে। সে পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়া তাঁরা বাস্তবায়নের দিকে প্রায় এগিয়েও নিয়েছিলেন। আর ব্রিটিশরা চেয়েছিল বিপ্লবীদের জাহাজ বোঝাই করে দ্বীপান্তরে পাঠাতে। কিন্তু হুট করেই তাদের ধারণা হয় প্রচলিত আইনেই এসব বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে ফাঁসিতে ঝুলানো সম্ভব। ব্রিটিশরা এ দিকটিই গ্রহণ করে।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে এম. এন. রায় ছিলেন অসম্ভব রকম এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা। সারা পৃথিবীতে তিনি এ আন্দোলন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তিনি ঘুরেছেন, এ আন্দোলনকে সংগঠিত করতে। অসম্ভব রকমের মেধাবী এ নেতা পৃথিবীর বহুভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ইউরোপ-আমেরিকায় তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায় বা এম. এন. রায় নামে পরিচিত ছিলেন। মেক্সিকোয় প্রথম কমিউনিস্ট দলের প্রতিষ্ঠাতা লেনিনের সান্নিধ্য-ধন্য বলে গোটা বিশ্বে তিনি পরিচিত। তিনি লেনিন, ট্রটস্কি, সুন-ইয়াৎ সেন, কারাঞ্জা প্রভৃতি বিপ্লবীদের সাথে চলেছেন, রাজনীতি করেছেন। এম. এন. রায়ের জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান 'নব মানবতাবাদ' দর্শন। এ দর্শনের মাধ্যমে তিনি চেয়েছিলেন মানবতার উৎকর্ষকে বিকশিত করতে; গুরু যতীন্দ্রনাথের যে উৎকর্ষ ও যে-বিকাশ পরিলক্ষিত হয়েছে, সেই দৃষ্টান্ত সামনে রেখেই তিনি অন্বেষণ করেছিলেন নতুন এক সমাজের।

এম. এন. রায়ের স্ত্রী এলিন্‌ও অভিভূত হতেন গুরু-শিষ্যের আদর্শ ও হৃদয়গ্রোথিত এই গভীর সম্পর্কে। বাঘা যতীনের মৃত্যুর পর এম. এন. রায় যখনই বাঘা যতীন সম্পর্কে কোনো স্মৃতিচারণ করতেন, তখন তিনি চোখের পানি সংবরণ করতে পারতেন না। অথচ তাবৎ পৃথিবীর মানুষ এম. এন. রায়কে জানতেন দৃঢ়চেতা শক্ত মনের মানুষ হিসেবে।

বিখ্যাত বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) ও বাঘা যতীন একইসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে ভালো বন্ধুত্ব ছিল। অরবিন্দ যখন বিলাত থেকে ভারতে ফিরে এসে বরোদা রাজ কলেজে সহকারী অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন তখন থেকেই বাঘা যতীনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং দেশ-মাতৃকাকে স্বাধীন করার জন্য বিপ্লবের দ্বারা কিভাবে অগ্রসর হতে হবে, সেসব তাঁদের আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। এর নিমিত্তেই তাঁরা বিপ্লবী কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে

থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় দু'জনে বিভিন্ন বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুবসমাজকে জেগে ওঠার আহ্বান জানান। এ সময়ে তাঁরা ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের সাহায্য লাভ করেন। তিনি বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে বর্ণ কালো হওয়ার কারণে ইংরেজদের কাছে নানাভাবে অবহেলিত ও লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। সেই পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ও বেদনা থেকেই যুবসমাজকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে বিলেত থেকে ফিরে কলকাতায় বেশ কয়েকটি ব্যায়াম সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। যতীন প্রমথবাবুর সঙ্গে দেখা করে ১৯০৩ সালে ১০২ নং আপার সার্কুলার রোডে 'আখড়া' গড়ে তোলেন।

১৯০২ সালে অরবিন্দ কলেজের চাকরি ছেড়ে কলকাতায় এসে শ্যামপুকুর স্ট্রিটে পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের বাড়িতে ওঠেন। যতীনও তখন এ বাড়িতে থাকতেন। এখান থেকেই গোপনে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। বাঘা যতীন ও প্রমথনাথ দুজনে মিলে কলকাতায় বহু ব্যায়ামাগার গড়ে তোলেন। এসময় গোপন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা অরবিন্দের নেতৃত্বে ও নির্দেশ অনুযায়ী বাঘা যতীন মূল উদ্দেশ্য গোপন রেখে যুবকদের ব্যায়ামাগারে শরীর চর্চায় আগ্রহী করে তোলেন।

অরবিন্দ ও বাঘা যতীন দু'জন মিলে বিপ্লবের নতুন পথ বের করে গোপনে যখন দেশ মুক্তির জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করছিলেন, তখনি আসে বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাব। এর কারণ খুব স্পষ্ট ছিল। বাঙালি যুবকশ্রেণী বিপ্লব সংঘঠিত করার জন্য তখন অদম্য হয়ে উঠছিল, তাদের এই অদম্য মনোবল ভেঙে দেওয়ার লক্ষ্যেই এ-প্রস্তাব তৈরি হয়। এ প্রস্তাবের কারণে গোটা বাংলায় তুমুল আন্দোলন গড়ে ওঠে। বিপ্লবী নেতারা তখন এ সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদের কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে পরিচালনা করেন।

মানিকতলায় (৩২ নম্বর মুরারিপুকুর রোড) অরবিন্দ ঘোষের পিতা কৃষ্ণদয়াল ঘোষ-এর একটি বাগানবাড়ি ছিল। এটি গুপ্ত সমিতির নামে দলিল করে দেওয়া হয়। বিপ্লব সংঘটিত করার লক্ষ্যে এখানে নানারকম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। যাতে যুব-সম্প্রদায় এখানে এসে যুক্ত হয়। এদের বিপ্লবী হিসেবে গড়ে তোলাই ছিল মূল লক্ষ্য। যতীন নিজেও এখানে আসতেন। বিপ্লবীদের এখানে দীক্ষা দেওয়া হতো। বিপ্লবীদের কার্যপ্রণালী এবং কার ওপর কী দায়িত্ব অর্পিত হবে, তা এখান থেকেই নির্ধারণ করা হতো। এই বাগানবাড়িটিই ছিল বিপ্লবীদের মূল কর্মকেন্দ্র।

দেশ-মাতৃকার মুক্তির জন্য যখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাস চলছে, ব্যক্তি আত্মদানের মাধ্যমে বিপ্লবী চেতনা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে, তখন এ আন্দোলনকে সংগঠিত করে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে গণ-সংগ্রামে পরিণত করতে দারুণ ভূমিকা পালন করেন বাঘা যতীন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবী দলগুলো সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে

এবং সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য একটি প্লাটফরম তৈরির প্রয়োজন অনুভব করেন। এ থেকেই বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা গড়ে তোলেন বিকেন্দ্রিক ফেডারেশন ধরনের একটি দল। পরে এটি 'যুগান্তর সমিতি' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এটির নেতৃত্বে ছিলেন বাঘা যতীন। এ দলে যোগ দিয়েছিল বিপিন গাঙ্গুলীর আত্মোন্নতি সমিতি, হরিকুমার চক্রবর্তীর চব্বিশ পরগনার চিংড়িপোতা দল, যতীন রায়ের উত্তরবঙ্গ দল, প্রজ্ঞানন্দের বরিশাল দল, হেমেন্দ্রকিশোর আচার্যের মৈমনসিংহ দল ও পূর্ণদাসের অধীনস্থ ফরিদপুরের মাদারীপুর দল।

বিশিষ্ট গবেষক-লেখক ম.ইনামুল হক বাংলার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গ্রন্থে বাঘা যতীনকে যুগান্তর দলের নেতা অভিহিত করে বলেছেন, 'যুগান্তর সমিতির নেতা বাঘা যতীন বালেশ্বরের কাছে বুড়িবালাম নদীর তীরে এক যুদ্ধে চার সঙ্গীসহ নিহত হন।' এরকম উল্লেখ আমরা আরো অনেক গ্রন্থে পাই।

বাঘা যতীন অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলেও কোনো কোনো গ্রন্থে উল্লেখ আছে। অপূর্ব দাশগুপ্তের বিপ্লবী-দার্শনিক মানবেন্দ্রনাথ রায় গ্রন্থে বলা হয়েছে তিনি অনুশীলন সমিতি করতেন। এ গ্রন্থ থেকে জানা যায়, বঙ্গীয় সরকারের সচিবালয়ে মি. হুইলারের স্টেনোগ্রাফারের দায়িত্ব পালনকালেই অনুশীলন সমিতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯০৭ সালে তিনি দার্জিলিং-এ অনুশীলন সমিতির একটি শাখাও খুলেছিলেন। গ্রন্থে বারীন্দ্র ঘোষের সাংগঠনিক তৎপরতা থাকলেও তিনি প্রচ- অহংকারী ছিলেন। অপূর্ব দাশগুপ্ত তাঁর 'বিপ্লবী-দার্শনিক মানবেন্দ্রনাথ রায়' গ্রন্থে আরও উল্লেখ করেছেন,

> সশস্ত্র বিপ্লব যে সমাসন্ন এই ভ্রান্তি ছড়াতে তিনি (বারীন্দ্র ঘোষ) ছল-চাতুরির আশ্রয় নিতেন। নিজ এবং অপর বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির নেতৃত্বের উপর তাঁর অসহিষ্ণুতা ছিল। যতীন্দ্রনাথ কিছুদিনের মধ্যেই বুঝেছিলেন যে বারীনের সঙ্গে কাজ করা যাবে না। এদিকে ১৯০৬ সালে থেকে নরেনের সঙ্গেও বারীনের দূরত্ব বাড়ছিল। যতীন্দ্রনাথকে ঘিরে এ সময়ে কলকাতায় একটি বিপ্লবী গোষ্ঠী দানা বাঁধে। যতীন্দ্রনাথের অনুগামীরা বেশীরভাগই যুগান্তর পত্রিকায় যুক্ত ছিলেন। এ বিপ্লবী মানুষটির চরিত্রে তেজস্বিতা যেমন ছিল তেমনি সহযোদ্ধাদের প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম স্নেহ ও সহানুভূতি। বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলোর প্রধান মানুষটিকে সেকালে 'দাদা' ডাকবার চল ছিল। অনেক 'দাদা'ই মোহিনীশক্তির অধিকারী বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন। সত্যিকারের মোহিনীশক্তি, নরেনের মতে, ছিল একমাত্র তাঁর যতীনদার মধ্যেই। নরেনের মতে, যতীনদা যুদ্ধবাজ মানুষ ছিলেন না। লোক দেখানো নায়কোচিত ভাবও তাঁর চরিত্রে দেখা যায় নি। তিনি ছিলেন দয়ালু ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ। যতীনদার মধ্যে বলিষ্ঠতা ছিল, আপোসহীনতাও ছিল; তা বলে তিনি পরমত-অসহিষ্ণু ছিলেন না–কারো প্রতিই তিনি অযথা বিদ্বেষ পোষণ করতেন না।[১৮]

নরেন্দ্রনাথ (এম.এন.রায়) জেল থেকে মুক্ত হয়ে তীর্থ ভ্রমণ করেন, সন্ন্যাস জীবন বেছে নেয়ার কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু একসময় সিদ্ধান্ত নিলেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করা প্রয়োজন। তিনি এও উপলব্ধি করলেন, দু'একটি গুপ্ত রাজনৈতিক হত্যা কিংবা বিচ্ছিন্ন কিছু হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হবে না। বহুধা-বিভক্ত এবং হতোদ্যম বিপ্লবী দল-উপদলগুলোকে সংগঠিত করে নতুনভাবে জাগিয়ে তুলতে হবে। এজন্য একজন সর্বাধিনায়কের প্রয়োজন অনুভব করলেন তিনি। এ জন্য তিনি অরবিন্দের সঙ্গে দেখাও করেন। অরবিন্দ তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ না-করে তাঁকে ফিরিয়ে দেন। নরেন্দ্রনাথ তখনি ঠিক করেন বাঘা যতীনকে সামনে রেখেই তাঁকে এই নতুন কাজে অগ্রসর হতে হবে। হাওড়ার ব্রিটিশরাজ উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রের মামলায় অভিযুক্ত বাঘা যতীন কারাবাসের সময় শেষ কয়েকটি মাস নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে একই সেলে ছিলেন। এ সময় তাঁদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর ফলে নরেন্দ্রনাথ বাঘা যতীনকে সামনে রেখে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বড় রকমের একটি সশস্ত্র বিপ্লব ঘটানোর উদ্যোগ গ্রহণের চেষ্টা করেন।

কিন্তু ততদিনে যাঁরা বিপ্লববাদের অগ্রজপ্রণেতা, তাঁদের অনেকেই এ পথ ত্যাগ করে অন্য পথে চলতে শুরু করেন। ১৯১০ সালে এপ্রিল মাসে শ্রী অরবিন্দ আধ্যাত্ম সাধনায় ব্রতী হয়ে পণ্ডিচেরী চলে যান। সন্ধ্যা পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ও ১৯০৭ সালে বিচারাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব। ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। বক্তৃতা করছেন বড়লাট লর্ড কার্জন। হুট করেই তিনি ভারতবাসীকে 'মিথ্যাবাদী' বলে ভর্ৎসনা করলেন। বঙ্গভঙ্গের অপচেষ্টা করে ইতোমধ্যেই তিনি গোটা ভারতবাসীর কাছে চোখের বিষে পরিণত হয়েছেন। এ অবস্থায় তিনি ভারতবাসীকে মিথ্যাবাদী বলে ফেললেন। দেশের সব নেতার মধ্যে এ বক্তৃতা দারুণ এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মুহূর্তেই যেন এক অগ্নিরূপ পেয়ে বসে নেতাদের মধ্যে। এর জবাব দেওয়ার জন্যে উপায় খুঁজতে থাকেন তাঁরা। রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিরাও কলম-হাতে কার্জনের কথার জবাব দিতে থাকেন। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ওঠে অন্যরকম। তিনি চরমভাবে এর প্রতিশোধ নিতে চান। ভারতমাতাকে একজন ইংরেজ মিথ্যাবাদী বলবে আর তা শুধু প্রতিবাদের ভেতরেই সীমাবদ্ধ রাখার ব্যক্তি তিনি নন। তিনি তাঁর দু'শিষ্য শ্রীশ দাস ও যতীশ মজুমদারকে রিভলভার দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন কার্জনকে হত্যা করার জন্য। কার্জন তখন দেশের মহাশত্রুতে পরিণত হয়েছেন। গোটা দেশের লোক তাঁর ওপর অসন্তোষ।

শ্রীশ দাস ও যতীশ প্রথমে সিমলায় তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করা হয় চট্টগ্রামে। দ্বিতীয়বারও ব্যর্থ হয়। কার্জন বেঁচে যায়। কিন্তু

কার্জনকে হত্যার এ চেষ্টা অন্যান্য বিপ্লবীদের মনে দুর্বার দুর্জয় এক সাহসের জন্ম দেয়। বিপ্লবীদের এগিয়ে যাওয়ার পথে এটি এক নতুন প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়।

১৯০৫ সালে অক্টোবর মাসে গোটা ভারতবর্ষে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন জাগরণের প্রবল ঢেউ তোলে। এ আন্দোলনের সময়ে অরবিন্দের অনুমতি নিয়ে যতীন, ইন্দ্রনাথ নন্দী, নিখিলেশ্বর রায় মৌল্লিক, কার্তিক দত্ত, প্রভাস দে, অন্নদা কবিরাজ, পবিত্র দত্ত বিপ্লবীরা 'ছাত্রভাণ্ডার' নামে একটা দোকান চালু করেন। এ দোকানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তী একাই কয়েক লাখ টাকা দেন। কয়েক কিস্তিতে এই দোকানে স্বদেশি কাপড়-বাসন, দেশাত্মবোধক বইপত্র ইত্যাদি বিক্রির ব্যবস্থা করা হয় এবং যারা বিদেশি পণ্য, বিদেশি শাসন ও বিদেশি শিক্ষা ব্যবস্থা বর্জন করে আন্দোলনে যুক্ত হন, তাঁদের ছাত্রভাণ্ডারের টাকা দিয়ে সহযোগিতা করা হতো। ছাত্রভাণ্ডারের টাকাতে 'ছাত্রভাণ্ডার মেস্' নামে কয়েকটি মেস্ চালু করা হয়। এসব মেস্ ছিল বিপ্লবীদের মাথা গোঁজার ঠাঁই। কোনো কোনো মেস্ ছিল বিপ্লবীদের আলাপ-আলোচনার গোপল জায়গা। বিশেষ করে অরবিন্দের মেসোমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্রের কলেজ স্কোয়ারের বাড়ির নিচের তলায় মেস্ ছিল বিপ্লবীদের আলোচনার প্রধান জায়গা।

ছাত্রভাণ্ডারের টাকাতেই এক পর্যায়ে ছাপা হতো যুগান্তর পত্রিকা। নিখিলেশ্বর তাঁর সুমতি প্রেস থেকে পত্রিকাটি ছাপতেন। বারীণ ঘোষ পত্রিকাটির দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিলেন বাঘা যতীনের অনুগত সহকারী কিরণচন্দ্র মুখার্জী ও অন্যান্য শিষ্যর ওপর।

বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্বয়ং যুগান্তর পত্রিকা বিলি করার দায়িত্ব চেয়ে পত্রিকার সম্পাদককে একটা চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন, যতীন্দ্রনাথ তাঁকে ভালোভাবে চেনেন। দরকার মনে হলে যতীনের কাছ থেকে যেন জেনে নেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চিঠিটি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

যতীনের কর্মধারা এত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে দেশের কবি-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী এ কর্মধারার সাথে নিজেদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুক্ত করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। কারণ তাঁরা অনুধাবন করেছিলেন বাঘা যতীন গৃহীত কর্মধারার মাধ্যমেই ভারতের মুক্তি সম্ভব। 'ছাত্রভাণ্ডার'-এর প্রেরণায় তখন বেশ কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বেঙ্গল স্টোর্স, ভারতভাণ্ডার, শিয়ালদার আর্যনিবাস হোটেল উল্লেখযোগ্য। কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল্সও একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যেটি বাঘা যতীনের পরামর্শে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল।

মজঃফরপুর ঘটনার পর মুরারীপুকুর বাগানবাড়িসহ বিপ্লবীরা যেসব জায়গায় থাকতেন বিশেষ করে ১৩৪ নং হ্যারিসন রোড, ২৩ নং স্কটিস লেন, ১৫ গোপীমোহন দত্তের লেন, ৪৮ গ্রে স্ট্রিট, ৩৮/৪ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট প্রভৃতি স্থানে পুলিশ তল্লাশি চালায়। সেসব

জায়গা থেকে প্রচুর পরিমাণ বোমা, কার্তুজ, রিভলবার, বোমা প্রস্তুত করার সরঞ্জাম ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র পুলিশ হস্তগত করে। গ্রেফতার হন বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রভূষণ রায়, উল্লাসকর রায়, শিশিরকুমার ঘোষ, নলিনীকান্ত গুপ্ত, হেমচন্দ্র দাস, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, বিভূতি বসু প্রমুখ। বারীন্দ্র গ্রেফতার হওয়ার পর পুলিশের কাছে সমস্ত তথ্য ও বিপ্লবী কর্ম-পরিকল্পনা সম্পর্কে বলে দেন। বারীন্দ্রের তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ অরবিন্দ ঘোষকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই বিপ্লব সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বাঘা যতীন ভাগ্যক্রমে পুলিশি গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম হন। কারণ সেদিন তিনি মুরারীপুকুর বাগানবাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না, মামাতো ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে সে রাতে তিনি অন্যত্র অবস্থান করেছিলেন।

পরে আরো অনেক বিপ্লবী গ্রেফতার হন। বিশেষ করে শ্রীরামপুরের নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী রাজসাক্ষী হয়ে সব ঘটনা বলে দেয়ার কারণে এসব গ্রেফতার সম্ভব হয়। কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিশ্বাসঘাতক নরেন্দ্রনাথকে দেশদ্রোহী উপাধি দিয়ে জেল হাসপাতালে গুলি করে হত্যা করেন। কানাইলাল দত্তের বাড়ি চন্দননগরে আর সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ি মেদিনীপুরে। নরেন্দ্রনাথকে গুলি করে হত্যার অভিযোগে এ দু'জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

সামসুল আলমের তৎপরতায় বিপ্লবীরা পদে পদে বিড়ম্বনার মুখে পড়ে। যতীন্দ্রনাথ তাকে পৃথিবী থেকে চিরতরের জন্য সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যে দায়িত্ব পড়ে বীরেন্দ্রনাথের ওপর। ১৯১০ সালে ৯ জানুয়ারি (২৪ জানুয়ারি) সামসুল আলম কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হ্যারিংটনের আদালত থেকে বিকেল পাঁচটায় সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন, এসময় বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত তাকে রিভলবার দিয়ে গুলি করে হত্যা করেন। এ ঘটনায় বীরেন্দ্র গ্রেপ্তার হয়ে প্রথমে পুলিশকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কোনো তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানান। পরের দিন পুলিশ বীরেন্দ্রনাথের ভাই ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ৬১ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রিটের বাড়িতে খানাতল্লাস করে এবং প্রয়োজনীয় কিছু কাগজপত্র পায়।পুলিশের অসহনীয় অত্যাচারে একপর্যায়ে তিনি পুলিশকে জানান, বাঘা যতীন তাঁকে সামসুল আলমকে হত্যা করার জন্য পাঠিয়েছেন। বাঘা যতীনের নির্দেশেই তিনি সামসুল আলমকে হত্যা করেছেন।

> এই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই '২৭ শে জানুয়ারি ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথকে গ্রেফতার করিয়া পুলিশের গুপ্তচর বিভাগ তাঁহার নিকট হইতে একটি স্বীকারোক্তি আদায় করিবার বিশেষ চেষ্টা করে এবং তজ্জন্য শারীরিক যন্ত্রণা ও আদর-আপ্যায়ন কোনো কিছুরই ত্রুটি হয় নাই। যতীন্দ্রনাথকে লালবাজাওে চারিদিন না খাইতে দিয়া

> লক-আপে আটকাইয়া রাখা হয় এবং গুপ্তচরবিভাগের দারোগা কুমুদবন্ধু সেন স্বীকারোক্তি না করিলে তাহাকে চির নির্ব্বাসন করা হইবে বলিয়া ভয় দেখায়।'[১৯]

বাঘা যতীনকে গ্রেফতার করার সময় তাঁর মামাদের বাড়িও তল্লাশি করা হয়। একই মামলায় বাঘা যতীনের মামা অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ও ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং মুহুরী নিবারণ মজুমদারকে গ্রেফতার করা হয়। এই মামলায় সুরেশচন্দ্র মজুমদারকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিয়োগ আনা হয়, তাঁর রিভলবার দিয়েই সামসুল আলমকে হত্যা করা হয়েছে। বীরেন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী এ অভিযোগ দাখিল করা হয়। সামসুল আলমকে হত্যার অপরাধে বীরেন্দ্রনাথের ফাঁসি হয় ১৯১০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি।

বাঘা যতীনকে গ্রেফতারের পর তাঁর কাছ থেকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য উৎঘাটনের চেষ্টা করে পুলিশবাহিনী। এজন্য তারা সব ধরনের কৌশলের আশ্রয় নেয়। কখনো অসহনীয় শারীরিক অত্যাচার আবার কখনো আদর-আপ্যায়ন সবকিছুই করে তারা। কিন্তু বাঘা যতীনের মুখ থেকে একটি তথ্যও বের করতে পারে না। শেষে রয়েড স্ট্রীটে (পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কার্যালয় ছিল) একজন সার্জেন্ট এসে বাঘা যতীনকে লোভনীয় বিভিন্ন প্রস্তাব দেন। দু'জন একটি শ্বেতপাথরের টেবিলের দু'পাশে বসে কথা বলছিলেন। হঠাৎ সার্জেন্ট বাঘা যতীনকে বললো, 'যদি তুমি সমস্ত কথা বলিয়া দাও তাহা হইলে ভালো ভালো স্ত্রীলোক পাইবে। এই কথা শুনিয়া যতীন্দ্রনাথ 'চুপ করো রাস্কেল' (Shut up you Rascal) বলিয়া ভীষণ চিৎকার পূর্ব্বক সজোরে টেবিলটির উপর এরূপ একটা ঘুঁসি মারেন যে শ্বেত পাথরের মোটা টেবিলটি ভাঙিয়া চৌচির হইয়া যায়। যতীন্দ্রনাথের চীৎকার ও রাগতঃ চক্ষু দেখিয়া সার্জ্জেন্টটি ভয়ে পলাইয়া যায় এবং বাহির হইতে বহু ব্যক্তি তাঁহার চীৎকার শুনিয়া ব্যাপার কি দেখিতে আসে। তাঁহার অগ্নি-দীপ্ত চক্ষু দেখিয়া তখন কেহ তাহার সহিত কথা বলিতে সাহস করে নাই।'[২০]

লালবাজার লক-আপে চারদিন থাকার পর বাঘা যতীন, তাঁর মামা ললিতকুমার ও মুহুরি নিবারণকে পুলিশের গাড়িতে হাওড়া জেলে পাঠানো হয়।

১৯১০ সালে 'হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা' নামক একটি রাজনৈতিক মামলা শুরু হয়। এ মামলায় প্রায় পঞ্চাশজন বিপ্লবী অভিযুক্ত ছিলেন। এ মামলায় ললিত চক্রবর্তী ও যতীন্দ্রনাথ হাজরা রাজসাক্ষী হয়েছিলেন। তারা বাঘা যতীনের বিরুদ্ধে অসংখ্য ষড়যন্ত্রের কথা বিচারপতিকে জানান। কিন্তু আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই প্রমাণিত হয়নি। হাইকোর্টের সেশনে বিচার না হওয়া পর্যন্ত বাঘা যতীন ও অন্যান্য বিপ্লবী প্রায় এক বছর জেলহাজতে ছিলেন। ১৯১১ সালে এপ্রিল মাসে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা শেষ হয় এবং সব বিপ্লবী মুক্তিলাভ করেন।

১৯১১ সালে বাঘা যতীন মুক্তি পেয়ে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কৌশল পরিবর্তনের জন্য তিনি কন্ট্রাক্টরি করেন। কন্ট্রাক্টরির কাজ সামনে রেখে তিনি ভেতরে বিপ্লবী বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। কন্ট্রাক্টরি কাজ পাওয়াটা তাঁর জন্য সহজসাধ্য ছিল না।

> জেলাবোর্ডের কর্তৃপক্ষগণ যতীন্দ্রনাথ সরকার বিদ্বেষী বলিয়া তাঁহাকে কোনকার্য্যের কন্ট্রাক্ট দিতে তাহারা প্রথমে আপত্তি করেন, কিন্তু তিনি দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন বলিয়া বহু কষ্টে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশংসা পত্র লইয়া মাত্র নদীয়, মুর্শিদাবাদ ও যশোহর এই তিনটি জেলাবোর্ডের কার্য্য করিবার অনুমতি পান।[২১]

সংসারে ব্যয় নির্বাহের জন্য কন্ট্রাকটারি করলেও এ সময় তিনি বিভিন্ন এলাকার বিপ্লবীদের সঙ্গে আরো গভীর যোগাযোগ গড়ে তোলেন এবং এসব এলাকায় যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে তাদের ব্যাপকভাবে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সে-সময় পুলিশের গুপ্তচর বাহিনীর কড়া নজর ছিল তাঁর ওপর। তাঁর গতিবিধি সবসময় লক্ষ রাখতো গুপ্তচর বাহিনী। যতীন সেই গুপ্তচর বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্নভাবে নাস্তানাবুদ করে ছাড়তেন। পরে বাধ্য হয়ে গুপ্তচর বাহিনীর সদস্যরা যতীনের সাহায্য নিয়ে নিজেরা বিপদমুক্ত থাকতো। অখণ্ড ভারতে বাঘা যতীনের নাম উচ্চারণ করলেই যেখানে নিশ্চিত বিপদ, সেখানে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলা কী ভীষণ রকম কঠিন ছিল তা সহজেই অনুমেয়। কারণ বাঘা যতীন তখন তাদের কাছে ভয়াবহ আতঙ্কের নাম। বাঘা যতীন-আতঙ্কে তখন তারা প্রতিমুহূর্ত সন্ত্রস্ত, তটস্থ। ব্রিটিশদের সতর্ক-চোখ তখন চতুর্দিকে সজাগ। সে-কারণে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী যদি বুঝতে পারতো কেউ বাঘা যতীনের নাম উচ্চারণ করছে, কিংবা কারো সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে তাহলে এর জন্য তাকে কঠিন মূল্য দিতে হতো।

বাঘা যতীনের মুক্তি সরকারের জন্যে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সরকার 'কিছুদিনের মধ্যে কয়েকজন জাঠ সৈন্যকে সামরিক রীতিতে ফাঁসি' দেয়। পুরো ১০ নম্বর জাঠ রেজিমেন্টের সব সৈন্যকে খিদিরপুর ডক থেকে করাচী নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। এই রেজিমেন্টের সব সৈন্য বাঘা যতীনের আদর্শকে গ্রহণ করেছে–এরকম খবর ছিল সরকারের কাছে। ফলে তারা আর ঝুঁকি নিতে চায়নি।

বাঘা যতীন জেল থেকে বের হয়ে আন্দোলনের কৌশল পরিবর্তন করেন। তিনি সহকর্মী কুষ্টিয়ার যদুবয়রার সন্তান অতুলকৃষ্ণ ঘোষ (১৮৯০-১৯৬৬)-এর নিকট দায়িত্ব অর্পণ করে সোজা যশোরে চলে আসেন। শুরু করেন ঠিকাদারি ব্যবসা। এ-ব্যবসার আড়ালেই তিনি বিপ্লবের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। তখন ব্রিটিশের শত্রু জার্মানি। জার্মানদের সাহায্যে সারা দেশের বিপ্লবীরা তখন আন্দোলনে অগ্নিরূপ দিতে চেষ্টা করছিলেন। বাঘা যতীন

এঁদের সঙ্গে যুক্ত হন এবং ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে বার্লিন কমিটির পক্ষ থেকে জিতেন লাহিড়ী কলকাতায় এসে পৌঁছেন। তাঁর কাছ থেকে খবর পাওয়া গেলো যে জার্মানিরা ভারতীয় বিপ্লবীদের অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য দিতে আগ্রহী। এই সাহায্য পেতে গেলে যোগাযোগ করতে হবে বাটাভিয়ায় (বর্তমানে জাকার্তা) জার্মানির কনসুলের সঙ্গে। সিদ্ধান্ত হলো যতীন কাপ্তিপোদায় গুপ্তস্থান থেকে দল পরিচালনা করবেন আর নরেন্দ্রনাথ বাটাভিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করবেন। বিদেশ থেকে নরেন কলকাতায় অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রমজীবী সমবায় সমিতি এবং হরিকুমার চক্রবর্তীর হ্যারি অ্যান্ড সন্সের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। বালেশ্বরেও হ্যারি অ্যান্ড সন্সের একটি শাখা খোলা হয়েছিল।

> হ্যারি অ্যান্ড সন্সের প্রতিনিধি সেজে ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে নরেন্দ্রনাথ চার্লস এ. মার্টিন নাম নিয়ে বাটাভিয়ায় রওনা হয়ে গেলেন। বাটাভিয়ায় পৌঁছে জার্মান কনসালের সঙ্গে দেখা করে তিনি জানতে পারলেন যে ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্যার্থে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে একটি জাহাজ করাচির পথে রওনা হয়ে গেছে। নরেন সাংহাইতে গিয়ে সেখানকার জার্মান কনসালকে বোঝালেন যে করাচি নয়, অস্ত্র পৌঁছে দিতে হবে বাংলায়। নরেনের প্রস্তাব গৃহীত হলো। কিন্তু সাংহাই থেকে ফেরার পথে নরেন ব্রিটিশ পুলিশের নজরে পড়ে যান। গ্রেপ্তার এড়াতে মাঝ সমুদ্রে লাইফ বোটে চড়ে তাঁকে জাহাজ পাল্টাতে হলো। জার্মান কনসাল ও নরেনের আলোচনা থেকে এস. এস. মেভারিক নামে একটি জাহাজ সুন্দরবন অঞ্চলের রায়মঙ্গলে ৩০ হাজার রাইফেল, প্রতিটি রাইফেলের সঙ্গে চার শ' রাউন্ড গোলা-বারুদ এবং দু' লাখ টাকা পৌঁছে দেবে। সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে নরেন্দ্রনাথ কলকাতার হ্যারি অ্যান্ড সন্সকে টেলিগ্রাম করে জানালেন `Business was helpful.' বাটাভিয়া থেকে নরেন্দ্রনাথ দুবারে মোট ১৫০০০ হাজার টাকা কলকাতাতে পাঠান। তিনি নিজে ১৪ই জুন কিছু টাকা এবং এক ব্যাগ স্বর্ণমোহর নিয়ে নিরাপদে দেশে ফেরেন।
>
> কথা ছিল মেভারিক জাহাজ রায়মঙ্গলে রাত্রিতে এসে পৌঁছবে। জাহাজের একটি মাস্থলে জ্বলবে সারি সারি আলো। এদিকে রায়মঙ্গলে উপস্থিত ড. যতীন্দ্র ঘোষাল, অশ্বিনীকুমার রায়, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ সবুজ আলো দোলাবেন। এই আলোর সংকেত দেখে জাহাজ এসে তীরে ভিড়বে। অস্ত্র নিরাপদে পৌঁছলে পূর্ববঙ্গে অভ্যুত্থানের জন্য একভাগ যাবে নোয়াখালীতে। সেখানে দায়িত্বে থাকবেন মনোরঞ্জন গুপ্ত। কলকাতা ও প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের জন্য আরেকভাগ অস্ত্র বরাদ্দ হবে। নরেন্দ্রনাথ ও বিপিন গাঙ্গুলি সেগুলির দায়িত্ব নেবেন। কলকাতায় দেশীয় সৈন্যদের নিয়ে প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ামের অস্ত্রাগার লুট করা হবে এবং কলকাতার দখল কায়েম করা হবে। অস্ত্রের তৃতীয় ভাগটি যাবে বালেশ্বরে, তার দায়িত্ব নেবেন স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ। মেভারিক জাহাজে যে সমস্ত জার্মান অফিসারেরা আসবেন তাঁরা পূর্ববঙ্গে থেকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেবেন। অন্যদিকে বার্লিন কমিটি ও গদর দলের সহায়তায় হেনরি এস. নামে অন্য একটি জাহাজে আরো অস্ত্র-শস্ত্র আনবার ব্যবস্থা হলো। অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের জন্য খাকি পোশাক পর্যন্ত তৈরি হয়ে গেলো। কিন্তু এত পরিকল্পনা, পরিশ্রম, অত্মত্যাগ–সবই ব্যর্থ হলো। মেভারিক জাহাজে অস্ত্র পৌঁছে

> দেওয়ার কথা ছিল এনি লার্সেন নামে যে জাহাজটির, সেটি আমেরিকা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়। ফলে মেভারিকের সঙ্গে এনি লার্সেনের যোগাযোগ হলো না। এদিকে মেভারিক জাহাজটিতে ডাচ পুলিশ খানাতল্লঅশি চালায়। সেখানে অস্ত্র পাওয়া গেলো না ঠিকই, কিন্তু ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হয়ে গেলো।[২২]

এরকম সময়ে একটি ঘটনা ঘটে। ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় বিপ্লবীরা সব মুক্তি পাওয়ায় পুলিশ প্রশাসন খুশি হতে পারেনি। পুলিশ প্রশাসন ক্ষুব্ধ হয়ে বিভিন্নভাবে বিপ্লবী ও তাঁর অভিভাবকদের অতিষ্ঠ করে তোলে। এ রকম অস্থির এক সময়ে বাঘা যতীন পূর্ণচন্দ্র দাসের কাছে অতি বিশ্বস্ত চারজন কর্মী চান, যাঁরা হবে তাঁর ভয়াবহ দুঃসময়ের সঙ্গী। পূর্ণচন্দ্র দাস পাঠালেন জ্যোতিষ, চিত্তপ্রিয়, নীরেন্দ্র এবং মনোরঞ্জন অকুতোভয় এই চার বিপ্লবীকে। এঁরা এসেই বাঘা যতীনের নিরাপত্তা ও নির্দেশ পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইংরেজ শাসনের শক্ত ঘাঁটি কলকাতা শহরে। বিপ্লব ঘটানোর আগে এটিকে দুর্বল করে দেয়া এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য কলকাতায় বাঘা যতীন কয়েকটি ঘটনা ঘটান। ঘটনাগুলো হলো: ১৯১৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি গার্ডেনরিচ ডাকাতি, ২২ ফেব্রুয়ারি বেলেঘাটা ডাকাতি, ২৪ ফেব্রুয়ারি পাথুরীঘাটায় যতীন্দ্রনাথের গুপ্তাবাসে গুপ্তচর নীরদ হালদারকে গুলি করে হত্যা, ২৮ ফেব্রুয়ারি হেদোর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সুরেশ মুখার্জির হত্যাকাণ্ড সংঘটিত। কলকাতার মানুষ এসব ঘটনায় জয়োল্লাস করেছে। ইংরেজ ও তার অনুচর ভয়ে তটস্থ হয়ে ওঠে। এ রকম একটি পরিবেশই বাঘা যতীনেরা তৈরি করতে চেয়েছিলেন।

কলকাতায় ইংরেজদের ভয়াবহ আতঙ্কে ফেলে বাঘা যতীন চার সঙ্গী নিয়ে অধ্যাপক প্রতুল সেনের বাগনারের বাড়ি থেকে বালেশ্বরের দিকে রওয়ানা দেন। সময়টা তখন মার্চের শেষ দিকে। বাঘা যতীন চার সঙ্গী নিয়ে গোপাল ডিহার আস্তানায় ওঠেন। গোপালের আসল নাম শ্রী নলিনী কর। বাঘা যতীনের একান্ত ভক্ত মণি চক্রবর্তী গোপালের নামে নিজের কিছু জমি দান করেন। এ জমিতেই গড়ে তোলা হয় আস্তানা। এই আস্তানাতেই বাঘা যতীনের গোপন বাস ছিল। চিত্ত, নীরেন, মনোরঞ্জন ও জ্যোতিষ তালডিহায় আরো একটি গোপন আস্তানা গড়ে তোলেন। সেখানে থাকতেন নীরেন ও জ্যোতিষ। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর গভীর উৎকণ্ঠার ভেতর দিয়ে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন অদম্য এই স্বাধীনতাকামী মানুষটি। তখন দুঃসহ কঠিন এক পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে অতিক্রম করছে তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত। কিন্তু তখনো তিনি জানেন না তাঁর সব পরিকল্পনার জাল ছিঁড়ে গেছে, ফাঁস হয়ে গেছে ম্যাভেরিকের খবর। ইংরেজবাহিনী তাঁর সব পরিকল্পনা জানার পর দ্রুত আক্রমণের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ৭ সেপ্টেম্বর মি. টেগার্ট, মি. রাদারফোর্ড ও মি. কিলভি বিশাল বাহিনী নিয়ে গোপালডিহায় আক্রমণ চালায়। কিন্তু ইংরেজ বাহিনীর দুর্ভাগ্য, গোপনে বিশাল বাহিনী নিয়ে অভিযান চালিয়েও

বাঘা যতীন ও তাঁর সঙ্গীদের তারা গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়। গোয়েন্দারা ছায়ার মতো বাঘা যতীনের পিছু লেগে থাকে। কিন্তু তাঁকে কিছুতেই ধরতে পারে না। এক পর্যায়ে ডেনহ্যাম বড় লাটহার্ডিংস-এর কাছে বাঘা যতীন সম্পর্কে লেখেন, 'Jatin Mukherjee, Perhaps the boldest and the most actively dangerous of all Bengal revolutionaries.' আর তাই বুঝি বালেশ্বর যুদ্ধের খবর পেয়ে বড়লাট হার্ডিঞ্জ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মন্তব্য করেন, 'Nothing can be more Praiseworthy than the action of Kilby and Sergeant Rutheford.'[২৩]

বাঘা যতীন নিজেও জানতেন গোয়েন্দারা তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। খোঁজ পেলেই ব্রিটিশ বাহিনী ঈগল পাখির মতো তাঁকে ছোঁ মেরে ধরবে। সে কারণে তিনিও ইংরেজ সাহেবদের গতিবিধি ৪ সেপ্টেম্বর থেকে লক্ষ করছিলেন। তাদের আচরণে অন্য গন্ধ পেয়ে তিনি ৬ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে গোপালডিহা ত্যাগ করে তালডিহি চলে যান। আবার ৭ সেপ্টেম্বরে ফিরে আসেন মহুলডিহায় জঙ্গলের মধ্যে মণি চক্রবর্তীর বাড়িতে। তখন তাঁর কাছে কোনো টাকা ছিল না। মণি চক্রবর্তীর কাছে তখন মোট টাকাই ছিল পঞ্চাশটি। তিনি পঞ্চাশ টাকাই বাঘা যতীনের হাতে তুলে দেন। এরপর মণি চক্রবর্তী তাঁকে আবার গভীর অরণ্যের ভেতর দিয়ে পালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। বাঘা যতীন তখন তাঁকে নিজের সঙ্কল্পের কথা জানিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, জনারণ্যের মধ্য দিয়েই আমার পথ, এবার সে পথ দিয়েই যাব।' ৮ সেপ্টেম্বর তিনি কাটান নীলগিরির গোপন অঞ্চলে নিরালায়। ৯ সেপ্টেম্বর ভোর হওয়ার অনেক আগেই চার সঙ্গীকে নিয়ে রওয়ানা দেন বালেশ্বরের দিকে। ম্যাভিরিক জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাস করার জন্য। কিন্তু পথে অবরোধের শিকার হলে রাজ মোহান্তিকে হত্যা করে অবরোধ মুক্ত করেন। সঙ্গীদেরসহ তিনি ময়ুর-ভঞ্জের বন এলাকার কাপ্তিপোদায় পৌঁছান। এ-খবর সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের কর্তাদের কাছে পৌঁছে যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের ডিআইজি জি. ডি. ডেনহাম, কলকাতার ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ চার্লস টেগার্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ড অব পুলিশ এল. এন. বার্ড বালেশ্বরে যায়, ১৯১৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বরে। কিন্তু এরপর কোনদিকে বা কোথায় পুলিশবাহিনী যাত্রা করবে, কোথায় বিপ্লবীদের অবস্থান, অনিশ্চিত হয়ে পড়ে তারা। বালেশ্বরে 'ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম' নামে একটা দোকান ছিল। এই দোকানের সাথে বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পুলিশ তা জানতে পেরে দোকানটি তল্লাশি চালায়। তল্লাশি করে পুলিশ একটুকরো কাগজ পায়, যাতে লেখা ছিল 'কাপ্তিপোদা'। এটি একটি জায়গার নাম। পুলিশের কাছে 'কাপ্তিপোদা' নামটি এক বিরাট আবিষ্কার ছিল। এরপর কাপ্তিপোদার দিকে যাত্রা করে গোয়েন্দা কর্তারা। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় বালেশ্বর শহরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর.জি.কিলভি, চন্দ্রীপুরের

পুলিশ বিভাগের সার্জেন্ট রাদাসবোর্ড এবং বিহার ও উড়িষ্যার ডিআইজি ইসি রাইল্যান্ড। মি. টেগার্টের অনুরোধে ব্যাপক সংখ্যক পুলিশ তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়। তারা জানতো, বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়েও বাঘা যতীনের মতো বিপ্লবীকে ধরা সহজ নয়। সে কারণে তারা বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে। চতুর্দিকে তাদের লোকজন ছড়িয়ে দেয়। গ্রামে-গঞ্জে বাঘা যতীনদের নামে অপপ্রচার চালায় 'একদল ডাকাত এই পথ দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামবাসীরা যেন তাদের পাকড়াও করার জন্য প্রস্তুত থাকে।' সহজ-সরল সাধারণ গ্রামবাসীরা প্রকৃত সত্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় এবং তাদের তৈরী বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে বাঘা যতীন ও তাঁর সহকর্মীদের কাপ্তিপোদায় পৌঁছানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। জনতা তাঁদের ডাকাত মনে করে পেছনে পেছনে চেঁচাতে লাগলো। গ্রামের পর গ্রাম থেকে লোকজন ছুটে এসে জনতার সারিকে ভারী করে তুললো।

'কামতানা গ্রামের কাছে এসে চিত্তপ্রিয় চেঁচিয়ে উঠলেন, বললেন, 'আর যদি একটুও এগোও তোমরা, এই দেখ পিস্তল; আমরা গুলি করতে বাধ্য হবো। নিজেদের ভালো চাও তো ফিরে যাও এখুনি।' কিন্তু বাবুরা যে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি ছুড়বেন, জনতা মোটেই তা আশা করেনি। তার ওপর 'ডাকাত' ধরার নেশা, বহু হাজার টাকার স্বপ্ন!–তাই উত্তরোত্তর ভিড় ঠেলে সাহসী গ্রামবাসীরা অগ্রসর হতে লাগলো। চিত্তপ্রিয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো। রঙ্গরাউতকে লক্ষ করে তিনি দুটো ফাঁকা আওয়াজ করলেন। তখন বহু টাকার স্বপ্নে হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সানাই সাহু আর রঙ্গ রাউত। প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে তারা যেই যতীন্দ্রনাথের পথ আগলে দাঁড়িয়েছে, আবার গর্জে উঠলো পিস্তল। তখনো বিপ্লবীরা তাদের গুলি না করে ফাঁকা গুলি ছুড়ছে। কারণ তাঁরা গ্রামের নিরীহ সাধারণ মানুষ। ব্রিটিশরা তাদের প্রলোভন দেখিয়ে ব্যবহার করছে। সাধারণ মানুষ প্রকৃত সত্যটা বুঝতে পারছে না। কতটা গভীর দেশপ্রেম থাকলে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও দেশের মানুষকে–যারা এখন তাঁদের মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠেছে, তাদের এমন করে ভাবতে পারা যায়।..যে দেশবাসীর কল্যাণের সাধনায় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বছরের পর বছর অতিবাহিত করেছেন সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ, নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তাঁকেই আজ স্বদেশের এক অখ্যাত পল্লী-অঞ্চলের শিষ্যদের নিয়ে ছুটে বেড়াতে হচ্ছে, সেই দেশবাসীরাই তাঁকে তাড়া করে নিয়ে চলেছে 'ডাকাত' আখ্যায় অভিহিত করে? অস্ত্র সঙ্গে আছে, অথচ অশিক্ষিত জনতার ওপর সে অস্ত্রের প্রয়োগেও আপত্তি যতীন্দ্রনাথের। আত্মরক্ষার জন্য একটা-দুটো ফাঁকা আওয়াজ করা হচ্ছে বড় জোর– আর প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে এদের অত্যাচারে। নীরেনের চোখ ফেটে জল পড়বার উপক্রম। ঈশ্বর, ওরা জানে না কী ওরা করছে! ওদের ক্ষমা কর।'[২৪]

এই উক্তির ভেতর দিয়ে বিপ্লবীদের দেশের মানুষের প্রতি অবিশ্বাস্য যে দরদ, তা ফুটে

বিপ্লবী সাধনার অপ্রত্যাশিত এই অগ্নি-পরীক্ষার দুর্বিষহ সময়েও। অথচ এই সাধারণ মানুষেরাই ব্রিটিশ শাসকের অপকৌশলে ও ছলে তখন যতীন্দ্রনাথের মতো মহানায়কের এবং তাঁর চার শিষ্যর মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠেছিল।

বিপ্লবীরা বুঝতে পেরেছিলেন মৃত্যু তাঁদের খুব নিকটে। সহকর্মীরা উদ্বেগে ব্যাকুল হয়ে বারবার বাঘা যতীনকে অনুরোধ করছিলেন তাঁকে নিরাপদ কোনো জায়গায় চলে যেতে। সহকর্মীরা জানতেন, বাঘা যতীনকে হারানো দেশের পক্ষে এক অপুরণীয় ক্ষতি। কিন্তু তিনি সহকর্মীদের অনুরোধ শোনেননি। বরং তখন তিনি বলেছেন, 'এ কি আমি কখনো করতে পারি? তোমরা কি আমাকে চেনো না।' গ্রামবাসীর মারমুখি ধাওয়া খেয়ে, দীর্ঘ বুড়িবালাম নদী সাঁতরে পার হয়ে তারপর বিরাট ধানক্ষেত পেরিয়ে ক'দিনের প্রায় অনাহারী বাঘা যতীন তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে চাষাখণ্ডের একটা বনের মধ্যে যখন পৌঁছান, তখন নীরেন অসুস্থ। বাঘা যতীন বনের ভেতর ঘুরে-ফিরে একটা টিলা বেছে নেন ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য।

ব্রিটিশের বিরাট বাহিনী গুলি ছুড়তে ছুড়তে কাপ্তিপোদার চাষাখণ্ডের টিলার কাছাকাছি পৌঁছতেই বাঘা যতীন চার সঙ্গী নিয়ে গুলি ছুড়ে জবাব দিতে থাকেন। ব্রিটিশবাহিনী হতভম্ব হয়ে পড়ে। মৃত্যু আর আর্তনাদে দিশেহারা হয়ে পড়ে এই বিশালবাহিনী। কিন্তু যুদ্ধ তারা চালিয়েই যেতে থাকে।

বাঘা যতীন মাত্র চারজন সহকর্মী নিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তিন ঘণ্টা যুদ্ধ করেন। গুলি শেষ হয়ে যায়। মৃত্যুকে প্রায় ছুঁই ছুঁই অবস্থাতেও মহান সেনানায়কের মতো সহযোদ্ধাদের বললেন,

> গুলি থামাস নে, থামালে চলবে না। নিভে যাবার আগে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা চাই। তোরাও চালা। মুহূর্তে বাহুমূলে ও পেটে গুলিবিদ্ধ বাঘা যতীন ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, তোরা রইলি। ওরে, তোরা মরবার আগে দেশবাসীকে মুক্তকণ্ঠে বলে যাস–আমরা ডাকাত নই। দেশবাসীকে জানিয়ে যাস আমাদের মহান ব্রতের কথা। নতুন যুগের কর্মীরা এই দৃষ্টান্ত থেকেই খুঁজে পাবে তাদের পাথেয়; দেশ জাগবে এগিয়ে যাবে আমাদেরই পথে।[২৫]

বাঘা যতীন যখন ধরা পড়লেন, তখন ব্রিটিশ অফিসাররা তাঁর রণকৌশলে বিস্মিত হন। বিস্ময় প্রকাশ করে ব্রিটিশবাহিনী প্রধান টেগার্ট বলেই ফেললেন, 'আমরা এতক্ষণ মাত্র পাঁচ জনের সঙ্গে যুদ্ধ করলাম!' চিত্তপ্রিয় যুদ্ধস্থলেই মারা যান। গুলিবিদ্ধ বাঘা যতীনকে বালেশ্বর গভর্নমেন্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অসংখ্য পুলিশ, অশ্বারোহী আর মিলিটারিতে ঘিরে রাখা হয় হাসপাতাল। হাসপাতালে পুলিশের বড় কর্মকতার অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। জনসাধারণ্যের প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। পুলিশবেষ্টিত হয়ে হাসপাতালে ঢোকেন প্রবীণ বিজ্ঞ সার্জন ডা. খান বাহাদুর রহমান এবং

তাঁর সহকারী সার্জন গাঙ্গুলী। সঙ্গে একজন লেডি মহিলা ডাক্তার, দু'জন কম্পাউন্ডার, চারজন অভিজ্ঞ নার্স, তিনজন কুলি ও দু'জন মেথর।ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখলেন, বাম হাতের বুড়ো আঙুল ও দু'টি মেটাকার্পাল অস্থি গুঁড়ো হয়ে গেছে তলপেটে ও নাভিতে বুলেটের ক্ষত। তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। রক্ত বমি হচ্ছে ঘন ঘন। সহকারী সার্জন এ অবস্থা দেখে লিখেছেন, 'যেন যবনিকা পতনে আর দেরী নেই।'

এ অবস্থায় যতীনকে অপারেশন রুমে নেওয়া হয়। তখনো প্রচুর রক্ত তাঁর শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে বেরুচ্ছে। রক্তবমি হচ্ছেই। ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি অস্থির হয়ে উঠলেন। এই মর্মান্তিক চেহারা তিনি নিজেও সহ্য করতে পার ছিলেন না। কিলবি জানতে চাইলেন, কেন এত রক্তবমি হচ্ছে? খানিক সফট ড্রিংক দিলে কেমন হয়, ডাক্তার?'

কিলবি লেমনেড আনালেন। নিজে হাতে করে যতীনের গলায় অল্প অল্প করে ঢেলে দিলেন। কিন্তু তাতেও রক্তবমি বন্ধ হলো না। তখন কয়েকটা ইঞ্জেকশন দিয়ে ডাক্তার তাঁকে ড্রিপ স্যালাইনের ব্যবস্থা করেন।

অপারেশনের আগে কিলবি ডাক্তারকে বললেন, যতীনবাবুকে জিজ্ঞেস করে দেখুন আমার কাছে তিনি আর-কিছু বলবেন?'

হ্যাঁ, বলবো, মি, কিলবি!' বাঘা যতীন নিজেই জবাব দিলেন, 'আবার বলবো: See that no injustice is done to those boys under the British Raj. Whatever has happened. I am responsible for all that-'[২৬]

বাঘা যতীনের কথাগুলো লিপিবদ্ধ করে নিলেন ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি।

গুলির আঘাতে যতীনের ডান হাত তখন প্রায় সম্পূর্ণরূপে অবশ। বাঘা যতীন মৃদু হাসলেন। তারপরই তিনি অপারেশনের অনুপতিপত্রে টিপসই করে দিলেন।

পরদিন ভোরে তাঁকে দেখতে এলেন চার্লস টেগার্ট। সঙ্গে এলেন ডেনহাম, ব্যর্ড, রাদার্সফোর্ড, মেজর ফিথ। মি. আর.জি. কিলভি আরো আগেই এসে বাঘা যতীনের পাশে অবস্থান করছিলেন। সার্জনের অনুমতি নিয়ে টেগার্ট ও অন্যান্য সাহেবরা বাঘা যতীনের রুমে ঢোকেন। বাঘা যতীন তাঁদের দেখে রসিকতা করে বললেন, 'Good morning Mr. Tegart...তোমাদের সঙ্গে দেখা হল, ভালই হলো। আমি তো চললাম।'...

এরপরই বাঘা যতীন গম্ভীর হয়ে যান। এর একটু পরই আবার তিনি টেগার্টকে বললেন, 'আমি চললাম, যারা রইল তারা নিরপরাধ। আমার দোষেই তারা এভাবে ধরা পড়ল। দেখো, এদের ওপর যেন অন্যায় অত্যাচার না হয়।'

টেগার্ট বিচলিত বোধ করলেন। বিনীত স্বরে বললেন, Tell me Mukherjee, What can I do for you?

বাঘা যতীন শান্তস্বরে উত্তর দিলেন, No thanks! All's over, Good bye.[২৭]

চার্লস টেগার্ট এবং তার সঙ্গী সাহেবরা বের হয়ে যাবার পর পরই বাঘা যতীন নিজেই তাঁর ব্যান্ডেজ, অপারেশনের সেলাই ছিঁড়ে ফেললেন। ফিনকি দিয়ে তীব্রবেগে ছুটে বেরিয়ে এলো রক্তস্রোত। খবর পেয়ে দৌড়ে আসেন ডাক্তার ও নার্স। দ্রুত নতুন করে তাঁর ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ দেয়ার চেষ্টা হলো। কিন্তু কোন কাজ হলো না। কিছুক্ষণ পরই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন, ১৯১৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। আর তখনি রচিত হলো ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মহাকাব্য।

খবর পেয়ে আবার ছুটে আসেন চার্লস টেগার্ট। বাঘা যতীনের নিথর শরীরের দিকে তাকিয়ে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে নিজের মাথার ক্যাপ খুলে মহান এ বিপ্লবীকে গভীর শ্রদ্ধা জানান তিনি।

বাঘা যতীনের মৃত্যুর পর টেগার্ট কলকাতায় ফিরে গেলে তার কাছে ব্যারিস্টার জে. এন. রায় জিজ্ঞেস করেন, "ব্যাপারটা কি সত্যিই, নাকি সরকারের এ-ও একটা কৌশল?'

টেগার্ট তখন দু'চোখ নিচের দিকে করে অভিভূতকণ্ঠে বলেন, "Unfortunately he is dead."

ব্যারিস্টার জে. এন. রায় টেগার্টের কথাটি যেন চেপে ধরলেন। বললেন, "Why do you say- Unfortunately?

টেগার্ট শ্রদ্ধাবনত কণ্ঠে বললেন, "I have high regard for him. I have met the bravest Indian, But- I had to perform my duty."[২৮]

বাঘা যতীনের মৃত্যু সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে গোটাবিশ্বে। বিপ্লবীরা শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়েন। স্তব্ধ হয়ে পড়ে গোটা ভারতবর্ষ।

মহান এই বিপ্লবীর মাত্র ৩৬ বছরের জীবন যখন থেমে গেল মৃত্যুতে, যখন দেশের মানুষ জানলো তিনি দেশের জন্য ব্রিটিশবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ করে জীবন আহুতি দিয়েছেন– তখন দেশের স্বাধীনতাকামী প্রতিটি মানুষ ব্যথিত হয়েছে, শোকাভিভূত হয়েছে এবং নীরবে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছে। আর একই সঙ্গে দৃঢ়প্রত্যয়ে গ্রহণ করেছে ক্ষণজন্মা এই মহাপুষের মহান কর্মধারাকে– ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার অপ্রতিরোধ্য অঙ্গীকার।

ব্রিটিশরা ভেবেছিল বাঘা যতীনের মৃত্যুর ভেতর দিয়ে বিপ্লবী আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের সেই ধারণা ছিল সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর বিপ্লব-ধারার তেজস্বিতা আরো বেশি তেজস্বী বারুদের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। ইতিহাস কোথাও এসে স্থির হয়ে থাকে না, ইতিহাস চলমান। সে সামনে এগুতেই থাকে–অগ্রসরতাই ইতিহাসের ধর্ম। একদিন যে পথকে একান্ত ও সুনিশ্চিত বলে মনে হয়, পরের দিন সে পথ পেছনে পড়ে থাকে–নতুন পথের সৃষ্টি হয়। পেছনে পড়ে থাকা পদচিহ্ন– নতুন

পথের আলো হয়ে থাকে–এগিয়ে যেতে অদম্য শক্তি জোগায়–ইতিহাসের পাতায় তা মহামূল্যবান। আগামীর জন্য তা ধারণ করতে হয়। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যিনি বাঘা যতীন নামে বিখ্যাত–তিনি তেমনি ইতিহাসে শক্তিসঞ্চারি একটি পদচিহ্ন। তাঁর আগে ও পরে আরো অনেক পদচিহ্ন ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত আছে। সকলের পদক্ষেপে পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার জন্য একটি পথ রচনা করেছিল। সেই পথ বহু আগেই পশ্চাতে পড়ে গেছে, কিন্তু তার আলোটা আমাদের অগ্রসরতার বড় শক্তি, দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য অনিবার্যভাবে ধারণ করতে হবে বাঘা যতীন-চেতনা।

তথ্য-নির্দেশ:

১. ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ (শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকাংশ), বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা, ভাদ্র, ১৩৫৪।
২. পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, মে ১৯৯০, পৃ. ৭।
৩. আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৪ ভাদ্র, ১৩৪৪, পৃ. ১০৫। বাঘা যতীনের স্মৃতি রক্ষার্থে ১৯৪৭ সালে ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠানে ডা. যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত।
৪. Independent India,২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯: 'যতীন মুখার্জী' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ।
৫. পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ, পৃ. ২।
৬. তদেব, পৃ ৫৫।
৭. তদেব, পৃ. ৭১।
৮. তদেব, পৃ. ১০৭।
৯. ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ, ৩২।
১০. সুধীরকুমার মিত্র, বাংলার পাঁচ স্মরণীয় বিপ্লবী (দেবপ্রসাদ জানা সম্পাদিত), পৃ.২৭।
১১. তদেব, পৃ. ১৪।
১২. পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ, পৃ ৭৪।
১৩. সুধীরকুমার মিত্র, বাংলার পাঁচ স্মরণীয় বিপ্লবী (দেবপ্রসাদ জানা সম্পাদিত), পৃ. ১৪।
১৪. তদেব, পৃ. ১৫।
১৫. তদেব, পৃ. ২৭।
১৬. অপূর্ব দাশগুপ্ত, বিপ্লবী-দার্শনিক মানবেন্দ্রনাথ রায়, রেনেসাঁস, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ২৬।
১৭. তদেব, পৃ.২৭।
১৮. তদেব, পৃ.২৫।
১৯. সুধীরকুমার মিত্র, বাংলার পাঁচ স্মরণীয় বিপ্লবী (দেবপ্রসাদ জানা সম্পাদিত), পৃ. ২৫।
২০. তদেব, পৃ.২৫।
২১. তদেব, পৃ. ২৭।
২২. অপূর্ব দাশগুপ্ত, বিপ্লবী-দার্শনিক মানবেন্দ্রনাথ রায়, পৃ. ২৮।
২৩. পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ, পৃ ৩৩৮।
২৪. তদেব, পৃ. ৪০৫।
২৫. তদেব, পৃ.৪১৯।
২৬. তদেব, পৃ.৪২২।
২৭. তদেব, পৃ. ৪২৫।
২৮. তদেব, পৃ. ৪২৮।

এনইউবি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা
(Peer-Reviewed Journal)
ISSN : 2710-4451
বাংলা বিভাগ
নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বাংলা উপন্যাসের চার লেখক: সমাজ ও সমকালের রূপকার

শাফিক আফতাব

সার-সংক্ষেপ: বাংলা উপন্যাসের অভিযাত্রা প্যারীচাঁদ মিত্রের *আলালের ঘরের দুলাল* থেকে শুরু হলেও সফল অভিযাত্রা ঘটে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশ নন্দিনী'র মাধ্যমে। এর পর রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র হয়ে উপন্যাসের বহুমাত্রিক বাঁক পরিবর্তন ঘটেছে। উপন্যাসে যুক্ত হয়েছে বহু বিচিত্র বিষয়। সাহিত্যমাত্রই সমাজ ও সমকালজারিত লেখকের মানসলোকের রূপায়ণ। এই সমাজ ও সমকাল চেতনে অবচেতনে প্রত্যেক লেখকেরই লেখায় অনিবার্য চিত্রিত। চিত্রায়ণের রকমফেরে কারও লেখা হয় জনপ্রিয়, কারও লেখা হয় কিংবদন্তি, আবার কারও লেখা হয় শাশ্বত সুন্দরের অনুগামী। আবার কারও লেখা হয়ে যায় অপাঙ্‌ক্তেয় ও অবহেলার বিষয়। লেখকের সৎচিন্তা, মনীষা, প্রজ্ঞা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসাই তাঁকে কালের প্রতিনিধি হিসেবে অভিধা দেয়। এই নিবন্ধে ১৯৬০ থেকে ২০০০–এই চার দশকের চার লেখকের উপন্যাস আলোচ্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এই চার জন হলেন– ষাটের দশকের শওকত আলী, সত্তরের আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আশির দশকের মঞ্জু সরকার ও নব্বই দশকের রকিবুল হাসান। তাঁদের প্রত্যেকের উপন্যাসে সমকাল ও সমাজভাবনা চিত্রিত হয়েছে বিশ্বস্ততায় ও স্বাতন্ত্র্যিক প্রাকরণিক নিরীক্ষায়।

ত্রিশ-উত্তর কথাসাহিত্যের পরবর্তী পর্যায়ে দশক গণনা শুরু হয়। দশকওয়ারি প্রতিনিধিত্বশীল সম্ভাবনাময় শিল্পপুরুষ নির্বাচন শুরু হয়। এর আগে শতাব্দী গণনায় শিল্পীসাহিত্যিকের পরিচিতি নির্ধারিত হতো। চল্লিশ থেকে দশক গণনা শুরু হয় বলে আমরা প্রত্যক্ষ করি। পরবর্তী পর্যায়ে পঞ্চাশ দশক, ষাটের দশক, সত্তর দশক, আশির দশক, নব্বই দশক ও শূন্যদশক ইত্যাদি আমাদের চোখে দৃশ্যমান। বোধ করি, শিল্পসাহিত্যিকের সংখ্যার আধিক্যে দশকওয়ারি গণনারীতিটি অনিবার্যভাবে শুরু হয়েছে। একই দশকের মধ্যে জন্মেও অনেকেই তাদের দশকের সেরা লেখক হতে পারেন না, আবার কেউ দশক ছাড়িয়ে শতাব্দীকে স্পর্শ করে। প্রসঙ্গত আমাদের আলোচ্য বিষয় চার দশকের প্রতিনিধিত্বশীল চার জন ঔপন্যাসিকের শিল্পকর্মে সমাজ ও সমকালভাবনা বিশ্লেষণ করা।

সাহিত্যমাত্রই সমাজ ও সমকাল জারিত লেখকের মানসলোকের রূপায়ণ। এই সমাজ ও সমকাল চেতনে-অবচেতনে প্রত্যেক লেখকেরই লেখায় অনিবার্য চিত্রিত। চিত্রায়ণের রকমফেরে কারও লেখা হয় জনপ্রিয়, কারও লেখা হয় কিংবদন্তি, আবার কেউ শাশ্বত সুন্দরের অনুগামী আবার কারও লেখা হয়ে ওঠে অপাঙ্‌ক্তেয়,অবহেলার বিষয়। লেখকের সৎচিন্তা, মনীষা, প্রজ্ঞা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসাই তাঁকে কালের প্রতিনিধি হিসেবে অভিধা দেয়। এই অভিজ্ঞানের আলোকে আমরা বিচার করে দেখবো ষাটের দশকের শওকত আলী, সত্তরের আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আশির দশকের মঞ্জু সরকার ও নব্বই দশকের রকিবুল হাসানের উপন্যাসের সময় ও সমাজচেতনা।

ষাটের দশকের লেখক শওকত আলী অবিভক্ত ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ১৯৩৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯৫৩ সালে ইন্টারম্যাডিয়েট পাস করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি বিএ পাস করেন। একই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এমএ ভর্তি হন। কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে তাঁকে ঢাকা থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। তিনি দিনাজপুরে একটি স্কুলে কয়েকমাস শিক্ষিকতা করেন। ১৯৫৬ সালে পুনরায় ঢাকা আসেন এবং পুনারায় ভর্তি হয়ে ১৯৫৮ এমএ পাস করেন।

সত্তর দশকের লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ গাইবান্ধা জেলার গোটিয়া গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস বগুড়া। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ৪ জানুয়ারি ১৯৯৭ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বগুড়া জেলা স্কুল থেকে ১৯৫৮ সালে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৬০ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। এরপর ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে বাংলায় অনার্স ও মাস্টার্স পাস করেন।

কথাসাহিত্যিক মঞ্জু সরকারের জন্ম ১৯৫৩ সালে উত্তরবঙ্গে রংপুর জেলার পীরগাছা থানায়। তিনি কৈলাশ রঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয় এবং কারমাইকেল কলেজে পড়াশোনা করেছেন।

নব্বই দশকের লেখক রকিবুল হাসান কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার কয়া গ্রামে, ৩১ মে ১৯৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিএ (অনার্স), এমএ এবং পিএইচডি অর্জন করেছেন।

* সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান বাংলা
মাতুয়াইল হাজী আব্দুল লতিফ ভূঁইয়া ইউনিভার্সিটি কলেজ, ঢাকা।

শওকত আলীর (১৯৩৬) সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ ও নাগরিক মধ্যবিত্তজীবন রূপায়ণ। দ্বৈত জীবনের ইতিহাস, ঐতিহ্য, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিকধারাটির ক্রমিক উপস্থাপন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩) সাহিত্যের বড় বৈশিষ্ট্য হলো সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে মানুষের সংগ্রামী চেতনা রূপে রূপায়ণ করা। মঞ্জু সরকারের (১৯৫৩) উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সমাজ-সংস্কৃতি ও শ্রেণিশোষণের রূপায়ন। আর রকিবুল হাসানের (১৯৬৮) উপন্যাসের বড় বৈশিষ্ট্য হলো গ্রামীণ ও নগর জীবন রূপায়ণসূত্রে সমকাল-সমাজকে চিত্রায়িত করতে গিয়ে মানুষের অন্তর্বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলা। এই চার লেখকের উপন্যাসে সময় ও স্বসমাজ অনুপুঙ্খ চিত্রিত হয়েছে।

শওকত আলীর উপন্যাসে সময় ও সমাজ চিত্রিত হয়েছে পরিপূর্ণভাবে। সমকালীন রাজনীতি, সমাজবাস্তবতা ও আর্থসামাজিক রূপটি তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবেই রূপায়িত করতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি রক্ত মাংসের মানুষই চিত্রি করেছেন। এই মানুষ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন:

> পরিপার্শ্বের অধিক সংখ্যক মানুষের সঙ্গে লেখককে একাত্ম হতেই হয়, পরিপার্শ্বের মানুষের সঙ্গে নিজকে একেবারে রাসায়নিকভাবে সংযুক্ত না করে লেখকের উপায় নেই। নিজকে বিচ্ছিন্ন করলে, আলাদা করলে, আর যা-ই হওয়া যাক, লেখক হওয়া যায় না। প্রত্যক্ষভাবে হোক, পরোক্ষভাবে হোক, লেখক মানুষের সাথে যুক্ত থাকবেনই। মহৎ লেখকদের তাই থাকতে হয়েছে। বিচ্ছিন্ন যখনই হয়েছেন, তখনই তাঁদের শিল্পকর্মে বন্ধ্যাত্ব দেখা গিয়েছে। (শওকত আলী ২০০৩ : ১৩)[১]

পক্ষান্তরে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাসে ঐতিহ্যচেতনার মোড়কে রাজনীতি চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। ঐতিহ্য কোনো জীবনধারার জীবন চলার শক্তি ও প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত সেটি আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নতুনভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। আবার ব্যক্তির বিকাশ ও মুক্তি না হলে সেটি সাহিত্য পদবাচ্য নয়। প্রসঙ্গত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের স্বগোক্তিতে তা উল্লেখ করা যায়:

> কথাসাহিত্য ব্যক্তির মুক্তিপ্রয়াসের আর একটি উদ্যোগ– আরও ব্যাপক, আরও সংগঠিত এবং দায়িত্বশীল। দায়িত্বশীলতা বলতে এখানে কর্তব্যপরায়ণতার কথা বলা হচ্ছে না, দায়িত্বশীল মানে এর ঘাড়ে কাজ আর বেশি, কবিতার চেয়ে এ–পরিধি আরও বিস্তৃত। এক প্রকরণ ছাড়া কবিতার প্রায় যাবতীয় লক্ষণ ও আত্মসাৎ করেও প্রাথমিক কথাসাহিত্যিকে আরও অতিরিক্ত ভার বহন করতে হয়।[২]

মঞ্জু সরকার (১৯৫৩) তারুণ্যের আবেগে একরকম দিবাস্বপ্ন দেখলেও ঔপনিবেশিক শাসন শোষণে নিঃস্ব ও যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অবস্থার চিত্র এঁকেছেন। এই কারণে আমরা তাঁর সাহিত্যে শ্রেণিশোষণ ও জাতিগত সংঘাতের বিষয়টি বেশি পরিমাণে ফুটে উঠতে

দেখি। যুদ্ধ-উত্তর দেশের মতো তার নিজের সহায়-সম্বলহীন অবস্থা থাকলেও তিনি ব্যক্তি মুক্তিকেই সাহিত্যের প্রধান বিষয় করেছেন। প্রসঙ্গত:

> সত্যি বলতে কী, ঢাকা আসার আগে তারুণ্যের আবেগে এরকম দিবাস্বপ্নও বেশ অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। কিন্তু স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান, সেটা ঢাকায় আসার পরই হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে লাগলাম। এমনিতে দীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণে নিঃস্ব হয়েছে, তারওপর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অবস্থা তখন সর্বত্রেই এমন নাজুক যে, দৈনন্দিন বাঁচার সংগ্রামেই নাভিশ্বাস ওঠে অধিকাংশ মানুষের। সহায়-সম্বলহীন দশা আমারও।[৩]

রকিবুল হাসান (১৯৬৮)-এর উপন্যাসে সমকালীন জীবনভাবনা সমাজবাস্তবতার নিরিখে চিত্রায়িত হয়েছে অনুপুঙ্খতায়। তিনি সমাজ ও সমকালকে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক দোলাচলের মধ্যে রূপায়িত করেছেন। গবেষকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> রকিবুল হাসান উপন্যাস শিল্পে বিশেষ পারমাঙ্গতা প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছেন। তার উপন্যাস জীবনের গভীরদর্শনকে মূর্ত করে তুলেছেন। একদিকে জীবনের আবেগময় জীবনের আলেখ্য, অন্যদিকে রূঢ় বাস্তবতা নির্মোহ রূপায়ণ তার উপন্যাসকে করেছে বিশেষায়িত সাহিত্যের পদবাচ্য।[৪]

শওকত আলীর উপন্যাসের রাজনীতি চেতনা এসেছে মানুষের স্বাভাবিক অধিকারচেতনার মধ্য দিয়ে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাসে রাজনীতি এসেছে আবহমান সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যচেতনার মধ্য দিয়ে। মঞ্জু সরকারের উপন্যাসে রাজনীতি এসেছে আবহমান বাংলার সংস্কৃতির ধারাটি প্রবহমান রাখতে। আর রকিবুল হাসানের উপন্যাসের রাজনীতি এসেছে অধিকার চেতনা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যচেতনার মিথস্ক্রিয়ায়। শওকত আলীর *দক্ষিণায়নের দিন* (১৯৭৬), *ওয়ারিশ* (১৯৮৯) ও *বসত* উপন্যাসে রাজনৈতিক চেতনা প্রতিভাত হয়েছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৬) ও *খোয়াবনামা* (১৯৯৬) উপন্যাসে। মঞ্জু সরকারের রাজনীতি চেতনা প্রতিভাত হয়েছে *তমস* (১৯৮৪), *প্রতিমা উপাখ্যান* (১৯৯২) ও *আবাসভূমি* (১৯৯৪) প্রভৃতি উপন্যাসে। রকিবুল হাসানের *ভাঙন* (২০০৬), *অহনাবউ* (২০১৪) ও অগ্নিকা আঁধার (২০২২) উপন্যাসে রাজনৈতিক চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে।

শওকত আলীর *দক্ষিণায়নের দিন* (১৯৭৬) উপন্যাসের চরিত্রগুলো মধ্যবিত্তের বলয়োদ্ভূত এবং মধ্যবিত্তের জীবন ও অস্তিত্ব-সংকট এবং রাজনৈতিক চেতনায় বিধৃত। সে হিসেবে এ উপন্যাসটি মধ্যবিত্ত চেতনাভিত্তিক উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে। নাগরিক মধ্যবিত্তের পূর্ণাঙ্গ রূপাঙ্কন এতে থাকলেও উপন্যাসের পরিণতিতে রাজনৈতিক চেতনার আধিক্য বেশি। উপন্যাসের প্রারম্ভে মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব-সংকট ও নায়িকা রোকেয়া

আহমেদ রাখীর ট্র্যাজিক কাহিনি বর্ণিত হলেও শেষাবধি রাখীকে লেখক রাজনৈতিক চেতনায়ও বোধে রাজনীতিসচেতন করে তোলেন। ভাবিকালের উত্তরাধিকারকে রাজনৈতিক চেতনায় উজ্জীবনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি টানেন। রাজনৈতিক কর্মী নায়ক সেজান উপন্যাসের প্লটের বাইরে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করলেও সে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেই ছিল সক্রিয়। উপন্যাসের অন্তে সে রাজপথে স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে আত্মহুতি দেয়। ফলত দেখা যায় রাজনীতিই এ উপন্যাসের কাহিনিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাই দক্ষিণায়নের দিন-এ মধ্যবিত্তের সদর্প উপস্থিতি থাকলেও এটি 'রাজনৈতিক চেতনার উপন্যাস' হিসেবে অভিধা পেয়েছে। রাখীর ব্যক্তি জীবনের ঘটনা দণিায়নের দিন-এর ঘটনার প্রধান প্রবাহ। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে পিতা রাশেদ আহমেদের সুস্থ ও প্রাণময় জীবনের আকাঙ্ক্ষা। সে আকাঙ্ক্ষা স্বৈরসময় বলয়ে ব্যর্থতায় পর্যুদস্ত। বড়ভাই বাম রাজনীতিকর্মী মনির মৃত্যু ও বোন বিলকিস আহমেদ নূপুরের মর্মন্তুদ বিনষ্টিও কাহিনিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। অনুপুঙ্খ আলোচনায় এর আখ্যানের নিবিড় পরিচর্যা, চরিত্র চিত্রণে মননশীলতা পরিবেশ বর্ণনায় নিবিড় নৈপুণ্য ও ভাষা ব্যবহারে চাতুর্যপূর্ণতা এবং নামকরণে প্রতীকময়তায় *দক্ষিণায়নের দিন* ষাটের দশকের উন্মাতাল রাজনৈতিক আবহে রচিত একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস। প্রসঙ্গত :

> ঋতুবৈচিত্র্যের দিক থেকে দেখলে এই সময়টা ঝঞ্ঝামুখর, বর্ষাভাসা জোয়ারের পানিতে থইথই অবস্থা। প্রকৃতির বৈরী পরিস্থিতির মধ্যে মানুষকে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়। দক্ষিণায়নের দিন নামকরণের মধ্যে প্রকৃতির সেই ক্রান্তিকালের প্রতীকী তাৎপর্য অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। এছাড়া উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রোকেয়া আহমেদ রাখীর ব্যক্তিগত জীবনের রিক্ততা, রাজনীতির ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ষাটের দশক, স্বৈরশাসন, আন্দোলন-সংগ্রামে উত্তাল বাংলার সে-সময়কার মধ্যবিত্ত মানসের সামগ্রিক জীবনের রূপান্বিত রূপক ফুটে উঠেছে দণিায়নের দিন নামকরণের মধ্যে।[৫]

পক্ষান্তরে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে নব্য ঔপনিবেশিক পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী তাদের ক্ষমতার বহ্নিশিখায় পূর্বপাকিস্তানের আপামর জনসাধারণকে কিভাবে চিলোকোঠা-রূপ ছোট্ট খুপরিতে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল, তারই শিল্পিত প্রকাশ এই উপন্যাস। উপন্যাসটিতে রাজধানীর ঢাকার রাজপথের প্রেক্ষাপটের সমান্তরালে উত্তরবঙ্গের জনজীবনের আলেখ্য প্রতিভাত হয়েছে। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে গ্রাম ও শহরের যুগপৎ সংগ্রামের যে ফল, সেটি দেখাতে ঔপন্যাসিক গ্রামীণ জনজীবনকে রাজনৈতিক চেতনায় উজ্জীবিত করেছেন। পাকিস্তান সরকারের তোষামোদকারী রহমতউল্লার দোতলা বাড়ির বাসিন্দা ওয়াপদার কর্মচারী আবু তালেব মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত হলে চিলেকোঠার বাসিন্দা ওসমান, হাড্ডি খিজির অর্থাৎ পূর্বপাকিস্তানের জনগণ তা প্রত্যক্ষ করে। সংগ্রাম-প্রতিরোধ মিছিলে অবশেষ হাড্ডি

খিজিরকেই প্রাণ দিতে হয়। রাজনীতির এই উন্মাদনা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ওদিকে গ্রাম্য রাজনীতির দলাদলিতে চেংটুদের প্রাণ দিতে হয়। খয়বার গাজীর মতো তোষামুদে চোরাচালান কারবারকারি অনায়াসে গা বাঁচাতে সক্ষম হয়। ষাটের দশকে স্বৈরাচার সরকারের অত্যাচারে দেশে যে শোষণ-বঞ্চনা, নিপীড়ন, জুলুম, নৈরাজ্য ও অরাজকতা চলছিল, তা থেকে গ্রাম ও শহরের আপামর জনগণ কিভাবে স্বৈরাচার হটাবার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয় ও মানুষের মনে কিভাবে স্বাধীনতার চেতনা সঞ্চারিত হয়, তারই ভাষাচিত্র *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৬)। প্রসঙ্গত :

> আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মহাকবির মতো ছোট ছোট কাহিনিপর্বকে সুন্দর সম্মিলনের মাধ্যমে এ উপন্যাসে একটি মহাকাব্যিক রূপ দিয়েছেন। শহরের বস্তি থেকে শুরু করে যমুনার দুর্গম চর এলাকা পর্যন্ত উপন্যাসটি বিস্তৃত হয়েছে। লেখকের অতি সূক্ষ্ম এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ শক্তিতে উপন্যাসের শব্দে শব্দে একটি আলাদা দ্যোতনা সৃষ্টি হয়েছে। লেখকের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লেখায় একেকটি চরিত্রের বাস্তবতা, পরাবাস্তবতা, ঘটনার সাথে চরিত্রের বাস্তবতা, কল্পনা, চেতনা অস্তচেতনার মিশ্রণে প্রতিটি পৃষ্ঠায় পাঠক নতুন দৃষ্টিতে জীবনকে আবিষ্কার করতে সম হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনিবিন্যাসই পাঠককে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। ইতিবাচক রাজনীতির উপস্থাপনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অব্যবহিত পূর্বরূপটি উপস্থাপনে 'চিলেকোঠার সেপাই' একটি অনন্য উপন্যাস।[৬]

মঞ্জু সরকারের অন্যতম উপন্যাস *অন্তর্দাহ*। ১৯৭১-এ অবরুদ্ধ স্বদেশে মৃত্যুর বিভীষিকা ও অপরাজেয় দেশপ্রেম মুক্তিকামী বাঙালির জীবন যেভাবে আলোড়িত করেছে, তারই বিশ্বস্ত রূপায়ণ আছে এই উপন্যাসে। ইতিহাসকে অবলম্বন করে এই উপন্যাসটি রচিত হলেও উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধ, জনজীবনের বহুবঙ্কিম চিত্র ও স্বাধীনতার রূঢ় বাস্তবতা। আবহমান বাঙালি সংস্কৃতি ও সমাজ-সম্পর্কের টানাপড়েনে সৃষ্টি হয়েছে মর্মস্পর্শী কিছু ব্যক্তিচরিত্র।

> *অন্তর্দাহ* এমন একটি উপন্যাস, যেখানে লেখক রাজনীতির গতিপ্রকৃতির পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক চিত্রও তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। বিশেষ করে তিনি বাংলাদেশের গ্রামীণ জনজীবনের প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার পাশাপাশি ব্যক্তিগত ঈর্ষা, দ্বেষ, শ্রেণিগত অসমতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন নানা ঘটনা ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে। মঞ্জু সরকার উপন্যাসের নাম দিয়েছেন *অন্তর্দাহ*। এই *অন্তর্দাহ* যেমন ব্যক্তিমানুষের, তেমনি গোটা বাংলাদেশেরও। একদিকে দখলদার বাহিনীর সঙ্গে বাঙালি জনগোষ্ঠীর যুদ্ধ, অন্যদিকে সমাজের ভেতরে বিভিন্ন শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের মধ্যকার লড়াই। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ অন্যান্য স্বার্থ-দ্বন্দ্ব হয়তো সাময়িক চাপা দিয়ে রেখেছিল; জাতীয়তাবাদী আবেগ সমগ্র জনগোষ্ঠীকে আলোড়িত করেছিল; কিন্তু সময়ের ব্যবধানে তার অনেকটাই টুটে গেছে। আকারে-প্রকারে এটি একটি বড় উপন্যাস। এর রয়েছে অনেক চরিত্র, বহু ঘটনা ও দৃশ্যপট। লেখক সমাজস্থিত মানুষগুলোর সাহস ও বীরত্বের পাশাপাশি ব্যর্থতা-দুর্বলতার দিকটিও সমানভাবে তুলে ধরেছেন।

তিনি কারো প্রতি অযাচিত বীরত্ব আরোপ করেননি, কাউকে হেয় করতে চাননি। একই সঙ্গে ধর্ম ও জাতি-নির্বিশেষে আক্রান্ত-অসহায় মানুষগুলোর প্রতি তাঁর সহজাত সহমর্মিতাও ল করা যায়।[৭]

রকিবুল হাসানের *ভাঙন* উপন্যাসটিতে সামগ্রিক জীবনভাবনা প্রকাশিত হলেও রাজনৈতিক জনসভার গ্রেনেড হামলায় শোভনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে লেখক জাতিসত্তার গভীরে প্রোথিত চেতনার কথা বলতে চান। ভালোবাসার মানবীর ভেতর নিজের ঔরশজাত সন্তানকে উপহার দিয়ে শোভন যখন বিবাহপূর্ববর্তী সময়ে গ্রেনেড হামলায় মৃত্যুবরণ করে, তখন রুচিরার আসন্ন উত্তরাধিকার নিয়ে আমরা ভাবনায় পড়ে যাই। এই সন্তানের উত্তরাধিকার নিয়ে আমাদের ভাবনার সমাধান টানা হয় না। একটা অমীমাংসিত সূত্র মেনে উপন্যাসের রসনিষ্পত্তি করতে হয়। এখানে সন্তানসম্ভবা নারীর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে রূপকের অন্তরালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাহীন বাঙালির বাঙালিসত্তার বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। রুচিরা শোভনের সন্তান পেটে ধারণ করে তার ভালোবাসার মানুষটির স্বপ্ন দেখে। কখন আসবে শোভন সামাজিক স্বীকৃতি দিয়ে তাকে ঘরে তুলবে। সমকালীন জীবনভাবনা এ উপন্যাসে সুনিপুণভাবে প্রতিভাত হয়েছে। লেখকের সমাজভাবনা প্রসঙ্গত উল্লেখ্য :

এ সমাজ তো তোমাদের মতোন পুরুষরা তৈরি করেছে বলেই সালেহা খাতুন বিছানা থেকে উঠে শরীরের কাপড় ঠিক করতে করতে আবার বললেন, তোমরা তোমাদের সুবিধার্থে সমাজ তৈরি করো, সমাজের নিয়ম তৈরি করো। দ্যাখো, একদিন তোমাদের উদ্ভট নিয়মে গড়া সমাজ ভেঙেচুরে খান খান হয়ে যাবে।[৮]

শওকত আলীর *পিঙ্গল আকাশ* অভাজনের জীবনমথিত কান্নার শিল্পরূপ। পিতৃহারা মঞ্জুর সত্য ও সুন্দর হয়ে বেঁচে থাকার প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং তা সময় ও সমাজের জাঁতাকলে পিষ্ট হওয়ার অনুরণন। এই উপন্যাসের কোনো পরিচ্ছেদ বিভাজন নেই। লেখক উত্তম পুরুষে দীর্ঘ টানা ঘটনার ভেতর দিয়ে কাহিনিকে গতিশীল করেছেন। এ উপন্যাসে বিচ্ছিন্ন বা উপ-কাহিনি দেখা যায় না। নায়িকা মঞ্জুর নিত্যকার ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি ও পারিপার্শ্বিকতার রূপায়ণ লেখক ঠাঁস বুননে প্লটের ফ্রেমে এঁটেছেন। নির্দিষ্ট কেন্দ্রমুখী কাহিনি চলমানতায় কোনো পর্যায়ে শিথিলতায় আক্রান্ত হয়নি। উপন্যাসের আখ্যানভাগ বিবিধ ঘটনা সংস্থানের ভেতর চমৎকারভাবে বিন্যাস্ত হয়েছে। উপন্যাসে দেখা যায়, পিতৃহারা মঞ্জু মায়ের দ্বিতীয় স্বামীর ঘরে আশ্রয় নেয়। সেখানে বিভিন্ন বিরুদ্ধ পরিবেশের শিকার হয়। সৎ বাবার প্রথম পরে সন্তান আনিসের সঙ্গে তার হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু বেনুর পাশবিক দৃষ্টি ও আকরামের জৈব অভিলাষ, মায়ের পরকীয়া ও ঋণগ্রস্ত বাবার দেউলিয়ায় নিমজ্জন, তাকে করে তোলে রক্তাক্ত ও ত-বিত। অনিবার্য

নিয়তি এক সময় মঞ্জুকে বেনু ও কাশেমের লালসার জালে আটকে দেয়। ভীরু আনিস হৃদয়ের গভীরে মঞ্জুর উপস্থিতি সর্বদা কল্পনা করলেও সে তাকে আপন করে পেতে ব্যর্থ হয়। নিয়তির জাঁতাকলে পিষ্ট মঞ্জু এক সময় নষ্টের অতলতলে নিপ্তি হয়। নিজের প্রতি তীব্র বীতশ্রদ্ধ মঞ্জু অবশেষে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। ফলে দেখা যায় এখানে শওকত আলী ট্র্যাজিক কাহিনি বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গত,

শওকত আলীর প্রতিটি কাহিনী নির্বাচনের মৌলিকতা আর স্বাতন্ত্র্যবোধ, যার মাধ্যমে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন একেকটি বিচিত্র ঘটনা। গবেষক এখানে লেখকের ভাবের প্রগাঢ়তা আর কাহিনির বিচিত্রতা তুলে ধরতে প্রতিটি উপন্যাসের শবব্যবচ্ছেদের মতো বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা করেছেন। এর মাধ্যমে দেখতে পাই কথাসাহিত্যিক শওকত আলী তার প্রথম উপন্যাস 'পিঙ্গল আকাশ'-এর নায়িকা মঞ্জুর শুভ্র আর সুন্দরের প্রতি সীমাহীন আকুলতা। বিষয়বস্তুর প্রগাঢ়তায় এখানে তিনি তুলে ধরেছেন নাগরিক মধ্যবিত্তের নগ্নতা, নীতিহীনতা, রুচিবিকৃতি ও পাশবিক কামনার করাল গ্রাসে বিনষ্ট নায়িকা মঞ্জুর মতো এক বালিকার দীর্ঘশ্বাস, রক্তরণ ও আত্মহননের শিল্পরূপ।[৯]

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা* (১৯৯৬) উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাসের মধ্যে বহুল পঠিত ও আলোচিত উপন্যাস। শুধু এই বাংলাদেশে নয়, পশ্চিমবঙ্গেও এটি সমভাবে সমাদৃত। বিভাগপূর্ব ও বিভাগ-উত্তরকালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিন্দু-মুসমানদের জাতিভেদ, ইতিহাস, লোকবিশ্বাস, মিথ, তে-ভাগা আন্দোলন, শ্রেণিসংগ্রাম, গ্রামীণজীবনের নিস্তরঙ্গরূপ, কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও মানবিক বিপর্যয়ের আলেখ্য ধরা পড়েছে এই উপন্যাসে। লৌকিকজীবনের ধারাটি কাল পরম্পরায় প্রজন্মের চেতনায় গ্রথিত হয়, সেটি এক সময় সংগ্রাম ও প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়– ইলিয়াস এই বিষয়টি অত্যন্ত দক্ষতায় শিল্পিতভাবে অঙ্কন করেছেন। একদিকে গ্রামীণ নিম্নবর্গের জনপদের বেঁচে থাকার নিরন্তর লড়াই, তাদের বোধবিশ্বাস, অন্যদিকে সামন্তপ্রভুদের শোষণ ও শাসনের নানা অপকৌশল, রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের মহড়া; সবমিলিয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকাল থেকে পাকিস্তান জন্মের অব্যবহিত পরের ঘটনা চিত্রিত হয়েছে এই উপন্যাসে। উপন্যাসে বগুড়া জেলার গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙা দুটি গ্রামের অধিবাসীদের জীবন ও প্রেক্ষাপটকে অনুষঙ্গ করলেও ঘটনাক্রম পল্লবিত হয়ে বগুড়ার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো হয়ে রাজধানী ঢাকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। গবষকের মূল্যায়ন :

খোয়াবনামা উপন্যাসে পাকিস্তান আন্দোলন একটি বড় অংশ দখল করে আছে। 'জাল যার জলা তার' এই শর্ত-রাজনীতির বাণী কাৎলাহার বিলপাড়ের সাধারণ মাঝি শ্রেণির মধ্যে প্রচার করলেও ফল হয় এর উল্টোটা: এই পাকিস্তানের আন্দোলনের মোটা দিকগুলো আমরা জানি। কিন্তু এর ভেতরের গড়ে ওঠার নানা সূক্ষ্ম ও জটিল দিকগুলো তৈরি হয়েছে ব্যক্তি, পরিবার, গ্রাম পর্যায়ে অনেক উপাদান ধারণ করে,

অনেক দ্বন্দ্ব ধারণ করে, অনেক দ্বন্দ্ব তৈরি করে, আবার অনেক দ্বন্দ্বের নিরসন করে। ইলিয়াস তাঁর উপন্যাসে কলকাতার কেন্দ্র থেকে মফস্বল শহর এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে গ্রাম এমনকি বিল পর্যন্ত বারবার যাতায়াত করেছেন। এখানে ইসমাইলের মতো ব্যক্তি, নায়েব, আনন্দবাজার পত্রিকা, আবার তমিজের বাপ এরা সবাই যার যার অবস্থান জানায়। ইসমাইল বা আজিজ-কাদের-শরাফতরা তাদের অবস্থান সম্পর্কে যত পরিষ্কার, তমিজের বাপদের তা নয়; উপন্যাসের বুননেও এই বাস্তবতার প্রতিফলন আছে।

মঞ্জু সরকারের নগ্ন আগন্তুক প্রেক্ষাপট উত্তরবঙ্গের রহমতের চর। যে চরে আচমকা নগ্ন আগন্তুকের আগমন ঘটে। নগ্ন আগন্তুককে সবাই দরবেশ বলে গ্রহণ করলেও প্রতিবাদী যুবক হানিফ তা মেনে নেয় না। আগন্তুক প্রথম মসজিদের ঈমাম করিম মোল্লার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তাকে দেখে করিম মোল্লার ভাতারখাকি মেয়ে সালমা অজ্ঞান হলেও বিশা মণ্ডল তাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আশ্রয় দেয় এবং আল্লাহ অলি বলে প্রচার করে সুবিধা হাসিল করে। হানিফ যেখানে আধুনিক মনমানসিকার পরিচয় দেয়, প্রতিবাদ করে, অন্ধবিশ্বাসে কোনো কিছু গ্রহণ করে না, সেখানে বিশা মণ্ডল হানিফকে ঘায়েল করতে আগন্তুককে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে। এই গ্রহণ মূলত নিজের অস্তিত্ব ও ভিত করে শক্ত করা ও সুবিধা ভোগ করা। নগ্ন আগন্তুককে পুঁজি করে বিশা মণ্ডলের মতো বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে অনেকেই স্বার্থ হাসিল করে ও নিরীহ মানুষের শোষণ করে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়। বিশা মণ্ডল যেমন জাল দলিল করে হানিফের জমি কেড়ে নিয়েছে, হানিফ প্রতিবাদ করেও তার উদ্ধার করতে পারেনি, তেমনি এমনই রূপ বাংলাদেশের সর্বত্র।
এই উপন্যাসে আমরা আরও দেখতে পাই হানিফের স্ত্রী যখন জলপড়া নিয়ে বাড়িতে আসে, হানিফ তা জানতে পেরে হাত থেকে ফেলে দেয়। পরের দিন হানিফের গরু চুরি হয়। অনেকের ধারণা ন্যাংটা ফকিরের অভিশাপে হানিফের গরু চুরি হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে হানিফের ছেলে মারা যায়। এটাও ন্যাংটা ফকিরের অভিশাপ বলে সবাই ধারণা করে। জমির ফসল যখন পোড়া যায়, তখন তাও ফকির বাবার কারসাজি বলে অনেকে বিশ্বাস করে। এভাবে একটার পর একটা ঘটনা সংঘটিত হয়। হানিফ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। একদিন ন্যাংটা ফকিরকে পানিতে ডুবিয়ে মারে হানিফ। ন্যাংটা ফকিরের মৃত্যুটা অনেকের কাছে অলৌকিক মনে হয়। করিম মোল্লার মেয়ে হানিফকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিলেও পরের দিন আততায়ীর হাতে খুন হয় হানিফ। এভাবে ঘটনার শেষ হয় নগ্ন আগন্তুকের।
এই আগন্তুকের ওপর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে রহমতের চরের জীবনধারা রূপায়ণের সমান্তরালে একটি জনপদের যাপিত জীবনকে আমরা লক্ষ করি। উপন্যাসে ধর্মের নামে শ্রেণিশোষণের রূপায়ণ চমৎকারভাবে রূপায়ণ করেছেন ঔপন্যাসিক। সত্য

সুন্দরের প্রতি অনুগামী চরিত্র যেমন উপন্যাসে আছে, তেমনি আছে দালাল ও শোষক-নিপীড়ক চরিত্র। আবার আছে মাটির মতো সহজ ও স্বাভাবিক কিছু মানুষ। যারা মানুষের চতুরতাকে টের পায় না। সবকিছুই সহজেই বিশ্বাস করে। যেমন রহমতের চরের জনগোষ্ঠী ন্যাংটা ফকিরকে আল্লাহ দরবেশ হিসেবে গ্রহণ করেছে। বিশা মণ্ডলের চালাকি কেউ বোঝেনি। যদিও হানিফ তা বুঝতে পেরেছে এবং প্রতিবাদ করেছে, তখন তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে আততায়ীর গুলিতে। উপন্যাসটির ভাষা রূপায়ণে উত্তর জনপদের ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। উপন্যাসটির পরিবেশ ও প্রতিবেশও উত্তরবঙ্গের তিস্তাতীরবর্তী রহমতের চর। ভাষা ও পবিবেশ রূপায়ণে উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটকে যেমন ব্যবহার করা হয়েছে, তেমনি চরিত্র রূপায়ণে নির্বাচন করা হয়েছে উত্তর জনগোষ্ঠী।

ছায়াবন্দি (২০১১) রকিবুল হাসানের জনপ্রিয় উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় বিরুদ্ধ পরিবেশ একজন নারী কত অসহায় হতে পারে, তারই করুণালেখ্য এই উপন্যাস। লেখক এতে সমাজবিশ্লেষণে মানুষের অন্তর্গত জীবনের অনেক গহিনে অবগাহন করেছেন। প্রথম স্বামী তুর্যের মৃত্যুর পর শ্বশুর পরিবারের স্নেহবন্ধনের বেড়াজাল ও সামাজিক নিয়মের ফ্রেমে আবদ্ধ হয়ে দেবর সূর্যকে বিয়ে করতে হয় সেবন্তিকে। বিয়ের পর বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে সেবন্তি। শ্বশুরের দেওয়া টাকা দিয়ে সুপারস্টোর দোকান করে সেবন্তি। সূর্য দোকান চালাতে থাকে। এরই মধ্যে সৎমায়ের ভাই সমীরের লালসার শিকার হয় সেবন্তিকে। পুলিশ ও রাজনৈতিক দলের ক্যাডারদের চাঁদা দিয়ে শেষ পর্যন্ত লোকসানের খাতায় ওঠে ব্যবসা। নিরুপায় সেবন্তি ব্যবসা চালিয়ে নেওয়ার জন্য কিছু টাকার জন্য শরণাপন্ন হয় আবু তাহেরের। তাহের সুযোগ বুঝে তার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। এরই মধ্যে আমজাদ কমিশনার সেবন্তির দোকান গুঁড়িয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত টাকা ও লোন করে তো দেয়ই না, উপরন্ত আবু তাহের সেবন্তির পেটের সন্তানকেও অস্বীকার করে। অনাগত সন্তানকে নিয়ে আবু তাহেরের কাছে নিয়ে বাঁচতে চাইলেও সে তাকে বেশ্যা বলে গালি দেয়। মনোলোকে ক্ষতবিক্ষত সেবন্তি নিজকে জীবনঝড়ে নিজকে শক্ত রাখে; একসময় প্রতিবাদের পন্থা হিসেবে সে থানায় অভিযোগ করে।
রকিবুল হাসানের *ছায়াবন্দি* (২০১১) উপন্যাসের প্লটবিন্যাসে লেখক সমকালীন জীবনবাস্তবতাকে রূপায়ণে বদ্ধপরিকর। একদিকে নিয়তি-নির্ধারিত ভাগ্যবিড়ম্বনার টানাপড়েন অন্যদিকে পুরুষশাসিত সমাজের দাপট ও দৌরাত্ম্য– এই দুয়ের দেলাচলে ক্ষত বিক্ষত হয় সেবন্তি নামক নারীর হৃদয়। উপন্যাস থেকে উদ্ধৃত করা যায় :

সত্যি করে কচ্চি, তোমাকে আমি বড় মানি। তুমি যা কবা আমি সব মাহ্নি চলবো।

এটা কথা বই তোমাক, আব্বা যখন তোমার সাত আমার বিয়ের কথা কোই্ত,আমি মনে মনে কতাম,আব্বা একটা পাগল! ঋাবী কাম পাইল না আমাক বিয়ে করবি। পাগলে কামড়াইচে। আরেটা কথা কই তোমাক, তুমি যেদিন এই বাড়ি থেকে চইলি গেইলে সেদিন মাঠের ভেতর য্যায়া একা একা অনেক কাঁদিছিলাম।[১০]

জীবন দিয়ে ভালোবাসি (১৯৯৯) রকিবুল হাসানের প্রথম উপন্যাস। সে হিসেবে উপন্যাসটিতে বিষয় ও প্রকরণ দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকরণগত দুর্বলতা তো পরিলক্ষিত হয় না বরং প্রথম উপন্যাসেই রূঢ় বাস্তবতার এমন নিপুণ বর্ণনা করেছেন যা বিস্ময় বললেও অত্যুক্তি হয় না। রোমান্স, অন্যদিকে ট্রাজেডির রূপায়ণ সমাজবাস্তবতার চিত্রায়ণ ঘটেছে উপন্যাসটিতে। উপন্যাসটিতে নাগরিক মধ্যবিত্তের রূপায়ণ যেমন তেমনি গ্রামীণ নিস্তরঙ্গ জীবনের বর্ণনা আছে। যেমন :

আমি যদি তোমাকে প্রশ্ন করি, একজন মেয়ে কতটা অসহায় হলে পিতার চেয়েও বেশি বয়সী একজন পুরুষকে স্বামীত্বে বরণ করে নিতে পারে? একজন স্বামী কতটা ব্যথার আগুনে পুড়লে জীবনের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত এবং স্বপ্ন মধুর বাসর রাত কাটাতে পারে অন্যের সন্তানকে নিজের সন্তান বলে বুকে তুলে নিয়ে। একজন নারী কতটা আঘাতে জর্জরিত হলে, হৃদয় কতটা ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হলে নিজের গর্ভের সন্তান ধারণে অস্বীকৃতি জানায়? কতটা কষ্টের চিতায় পুড়লে নিজের চেয়ে বেশি বয়সী সন্তানের সামনে তুলে ধরতে পারে মাতৃত্বের আঁচলে? বেদনার কালো মেঘ একজন নারীকে কতটা গ্রাস করলে নিজেকে পুরোপুরি বঞ্চিত করে অন্যদের প্রাপ্তি বুঝে দিতে প্রস্তুত থাকে কড়ায় গণ্ডায়? (রকিবুল হাসান ২০১১ : ৫৯) [১১]

নবীরন (২০০৩) গ্রামীণ জীবনচেতনাভিত্তিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক গ্রামীণ জীবনবাস্তবতা রূায়ণের সমান্তরালে নারীচরিত্রের রহস্যলোকের সন্ধান দিয়েছেন। কাহিনি নির্বাচনে লেখক গ্রামীণ পটভূমিতে নিম্নবিত্তের জীবন রূপায়িত করেছেন। উপন্যাসে কাহিনিতে আমরা দেখি ধানভানার কাজ করা বারাণী আকুমিয়ার সঙ্গে নবীরণের বিয়ে হয়। বিয়ের ঘটকালী করে লাল্টুমিস্ত্রি। যার চালের আড়তে কাজ করে আকুমিয়া। লাল্টুমিস্ত্রি ভালোবাসতো নবীরণের মাকে। তাকে পাওয়ার সুপ্ত ইচ্ছা ফল্গুধারার মতোন বইছিল ভেতরে ভেতরে। সেই অদম্য ইচ্ছার প্রতিফলন দেখা যায় বিয়ের পর নবীরনের প্রতি তার কামনাপ্রবণতা দেখে।

নবীরন হঠাৎ নিজের ভেতর কোত্থেকে যেন শক্তি খুঁজে পায়। আজিজ মেম্বারকে উদ্দেশ করে বলে, অন্যায় করার আমি করেছি, যা বিচার হয় আমার হবে। কিন্তু আপনি নিজের অন্যায় করে আকুকে মারছেন কেন? আকুকে মেরে আমাকে না পাবার জ্বালা মেটাচ্ছেন? আপনি আমাকে পাবার জন্যে কম চেষ্টা করেছিলেন? আমার বিচার করতে এত লোক এসেছে অথচ আপনার মতো বদমাইশ নারীখোরের বিচার তো কেউ করে না। এই তো সমাজ! এই তো সমাজের বিচার!

নবীরন (২০০৩) উপন্যাসে যেমন নবীরণকে নিয়ে উপন্যাসের ঘটনা আবর্তিত। *ভাঙন* উপন্যাসেও তিনি সমাজের দেহের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন এবং খুঁটে খুঁটে সমাজদেহের ক্ষতগুলো আবিষ্কার করেছেন। তিনি সেখানে একদিকে শিল্পী, আর একদিকে গভীর অনুসন্ধিৎসু। সমাজের গভীরে বিরাজিত বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

নতুন কালে কি সত্যি নতুন মানুষ দেখা যায়? এত নতুন যে তাকে আর চিনতেই পারা যায় না? মানুষ কি বদলে যাচ্ছে? বদলে কি যায়? যে যুবক যুবতীদেও পরিবর্তনের রকমারি পোশাকে দেখতে পাই সেই পোশাক সরালে। তো দেখা যায় চিরকালের সেই যুবক সেই যুবতী। রকিবের উপন্যাস পড়তে গিয়ে এই কথাগুলিই আবার মনে এল। দু'জোড়া যুবক যুবতীর গল্প এখানে। প্রথা তারা এতদূও ভাঙতে পাওে যে হঠাৎ মনে হয় একালের যুবক যুবতী খুব বদওেল গেছে। স্ত্রী সঙ্গে বনিবনা না হলে প্রেমসহ বা প্রেমবিনাই ভিন্ন নারীর সঙ্গে সম্পর্ক যেমন স্থাপিত হয় তেমনিই আবার বিয়ে সামাজিক পর্যায়ে পৌছানোর আগেই প্রেমিকার গর্ভে সন্তান চলে আসে। মনে হয় সময় বদলেছে, মূল্যবোধ বদলেছে। প্রথা ভাঙা চলছে কিন্তু একটু ভেতওে ঢুকেই বুঝতে পারি একই চিরন্তনতা এ কালের তরুণ-তরুণীদেও মধ্যেও নির্বাধি বয়ে যাচ্ছে। (ভাঙন, ভূমিকাংশ, হাসান আজিজুল হক, ২০১৪)

মধ্যবিত্তের জীবনাচারে দুই ধরনের রূপ লক্ষ করা যায়। একশ্রেণির মধ্যবিত্ত স্থূল কামরুচি সম্পন্ন, দেহাশ্রিত কামনা বাসানাই যাদের একমাত্র আরাধ্য। তোষামুদে ও বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত। এদের দিয়ে সমাজ ও দেশ কলুষিত হয়। অন্য ধরনের মধ্যবিত্ত শালিন ও সুন্দর মানসিকতার। এরা দেশের কথা চিন্তা করে, মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলে এবং সুন্দর মনমানসিকতায় এরা জীবন যাপন করে। প্রয়োজনের সংগ্রামে রাজপথে নামে।

এই চার লেখকের উপন্যাসের এই দ্বিধারিক মধ্যবিত্তের সন্ধান পাওয়া যায়। শওকত আলীর *দক্ষিণায়নের দিন* (১৯৭৬), *ওয়ারিশ* (১৯৮৯) ও *বসত* (২০০৫) এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৬) উপন্যাসে এইসব মধ্যবিত্তের সন্ধান মেলে। অন্যদিকে রকিবুল হাসানের *একী তৃষ্ণা একী দাহ* (২০০০) ও *অগ্নিকা আঁধার* (২০২২) উপন্যাসের এই মধ্যবিত্তের সন্ধান মেলে।

শওকত আলীর *ওয়ারিশ* (১৯৮৯) মধ্যবিত্তের জীবনচেতনা ভিত্তিক মহাকাব্যিক সামাজিক উপন্যাস– যাতে চারপুরুষের জীবনাখ্যান বিধৃত। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক টানাপড়েন ব্যক্তিকে আন্দোলিত করে–এই আন্দোলনে বাইরের পৃথিবী যেমন বদলে যায়, তেমনি ব্যক্তির অন্তর্লোকে তার ছায়াপাত ঘটে। এই ছায়াপাতে চার পুরুষের এক শতাব্দীকালের যাপিতজীবন, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-

ভালোবাসা, চেতনা, ঐতিহ্য, কৃষ্টি এবং সময়ের অভিঘাতে ব্যক্তির বদল যাওয়া চেতনাগত পালাবদল শিল্প-সুষমায় বিশালায়ন পটচিত্রে বিধৃত ওয়ারিশ-এ। এতে 'ওয়ারিশ' ও 'শরিক' নামাঙ্কিত দু'টি আখ্যানের মিলিত রূপ *ওয়ারিশ*।

শওকত আলীর *ওয়ারিশ* (১৯৮৯) ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা* (১৯৯৬) ও মঞ্জু সরকারের *আবাসভূমি* (১৯৯৪) বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত উপন্যাস। মহাকাব্যিক প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে রকিবুল হাসানের *অগ্নিকা আঁধার* (২০২২) উপন্যাস। এই উপন্যাসটি সম্প্রতি রচিত একটি ভিন্নধারার উপন্যাস। এই উপন্যাসে গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ ও নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, আছে সামাজিক অবক্ষয়ের দগদগে চিত্র। মহামারী করোনার ছোবলে বিপন্ন পৃথিবীর পরিচিতি আছে এই উপন্যাসে।

বাঙালির জীবনের ঘটনার এই দীর্ঘ পরিক্রমায়, লোকসাহিত্য, সংস্কৃতি, সমকালীন সাহিত্য চর্চাসহ রাজনীতি অর্থনীতি, ঐতিহ্যপ্রীতি, লোকসাহিত্য, শোষক-শোষিতের মধ্যকার সংকট, উচ্চবিত্তের সঙ্গে মধ্য ও নিম্নবিত্তের দ্বন্দ্ব, দেহাশ্রিত কামনা-বাসনাজাত লিবিডো ভাবনা, উচ্চশিক্ষিত উচ্চবিত্তের অন্দরমহলে কদর্য কদাকার রূপসহ সমাজবাস্তবতার রূঢ়সত্যের রূপায়ণ আছে *অগ্নিকা আঁধার* উপন্যাসে। উপন্যাসের ভাষারীতির দিক থেকে রকিবুল হাসান স্বতন্ত্র প্রেক্ষণবিন্দু থেকে অবগাহন করেছেন।

এই চার লেখকের উপন্যাসে সমাজ ও সমকাল নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। সাহিত্যে মানুষের যাপিত জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়। এই যাপিত জীবন মূলত লেখকেরই জীবন। সাহিত্যিক যাপিত জীবনে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে যা গ্রহণ করেন, তাই তাঁর সাহিত্যে রূপায়ণের চেষ্টা করেন। সমকালই বিভিন্ন আঙ্গিকে সাহিত্যে স্থান পায়। চার দশকের চার লেখক অতীতে গহ্বরে যেমন প্রবেশ করেছেন, তেমনি সমকালের কথাগুলো রূপকে প্রতীকে চিত্রকল্পে প্রকাশ করেছেন। এই চার লেখক চার দশকের সমাজ ও সমকালভাবনার স্বতন্ত্র সাহিত্যরীতিতে বিচরণ করেছেন। তারা স্ব স্ব অবস্থানে থেকেও সমকাল ও সমাজভাবনায় একই প্রেক্ষণবিন্দু থেকে অগ্রসর হয়েছেন। তারা সমকালীন জীবন রূপায়ণের সমান্তরালে বাঙালি জীবনের অতীত রূপায়ণটি চিত্রায়ণ করেছেন। সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে ঐতিহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজ ও স্বকাল ও প্রবহমান সাংস্কৃতিক আবহ।

তথ্যসূত্র

১. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৯৬), খোয়াবনামা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
২. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৮৬),চিলেকোঠার সেপাই, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
৩. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৯৮), সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
৪. আহমদ মাওলা(২০১৮), 'শওকত আলীর দক্ষিণায়নের দিন', কালি কলম, মার্চ ২২, ২০১৮, ঢাকা।

৫. নির্ণয় হোসেন (২০১৬) 'বাংলা উপন্যাসের শওকত আলী', দৈনিক সমকাল (কালের খেয়া), ঢাকা।
৬. মোস্তফা মোহাম্মদ (২০০৩), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ভিন্নমাত্রা অন্যসুর, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।
৭. মঞ্জু সরকার (১৯৮৪) তমস, ঐতিহ্য, ঢাকা।
৮. মঞ্জু সরকার (১৯৯২) প্রতিমা উপাখ্যান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
৯. মঞ্জু সরকার (১৯৮৬) নগ্ন আগন্তুক, বাংলা প্রকাশ, ঢাকা।
১০. মঞ্জু সরকার (১৯৯৪), আবাসভূমি, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
১১. রকিবুল হাসান (১৯৯৯), জীবন দিয়ে ভালোবাসি, কেকা প্রকাশনী, ঢাকা
১২. রকিবুল হাসান (২০০০), এ কী তৃষ্ণা এ কী দাহ, কেকা প্রকাশনী, ঢাকা।
১৩. রকিবুল হাসান (২০০৩), নবীরন, পরী প্রকাশন, ঢাকা,
১৪. রকিবুল হাসান (২০০৬). ভাঙন, পরী প্রকাশন, ঢাকা,
১৫. রকিবুল হাসান (২০১১), ছায়াবন্দি,রিদম প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।
১৬. রকিবুল হাসান (২০১৪) অহনাবউ, সমাচার প্রকাশনী, ঢাকা।
১৭. রকিবুল হাসান (২০২২), অগ্নিকা আঁধার, বটেশ্বর বর্ণন, ঢাকা।
১৮. শওকত আলী (১৯৭৬) দক্ষিণায়নের দিন, বিদ্যা প্রকাশ, নান্দনিক, ঢাকা।
১৯. শওকত আলী (১৯৬৩) পিঙ্গল আকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা।
২০. শওকত আলী (২০১১) মাদারডাঙার কথা, নান্দনিক, ঢাকা।
২১, শওকত আলী (২০০৩), শওকত আলীর প্রবন্ধ, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা।
২২. রকিবুল হাসান (২০১৪) ভাঙন, ভূমিকাংশ, হাসান আজিজুল হক, প্রচলন প্রকাশন, ঢাকা।

সহায়ক লিঙ্ক

১. https://www.risingbd.com
২. https://www.chintasutra.com
৩. https://roar.media
৪. http://www.bengalpublications.com
৫. https://boiferry.com